কৃষি সাংবাদিকতা

কৃষি সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কৃষি সাংবাদিকতা

পরিমার্জিত সংস্করণ

সম্পাদনা
আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া

চন্দ্রাবতী একাডেমি

www.pathagar.com

কৃষি সাংবাদিকতা

© চন্দ্রাবতী একাডেমি

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
নভেম্বর ২০১৬

পরিমার্জিত সংস্করণ
সেপ্টেম্বর ২০১৬

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রকাশক
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান খন্দকার
চন্দ্রাবতী একাডেমি
২১/এ পুরানা পল্টন (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৫১৫৬৮৮, ৯৫৭০৭০৭, ০১৭১৫২৮৫৬৪৪

সার্বিক সমন্বয়
সমষ্টি

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

ছবি
ক্যাটালিস্ট ও মো. রেজাউল হক

গ্রাফিক ডিজাইন
রবিউল হোসেন রবি

মুদ্রণ
আদিগন্ত প্রিন্টার্স ৮৬/১ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

মূল্য : ৩৫০ টাকা

KRISHI SANGBADIKOTA (Agriculture Journalism)
Edited by Abu J M Shafiul Alam Bhuiyan (Revised Edition)
Revised Second Edition : November 2016
Revised Edition : September 2016
First Published : September 2012
Coordinated by SoMaSHTe, Supported by Katalyst
Published by Mohammed Kamrouzzaman Khondaker, Chandrabati Academy
21/A Purana Paltan (1st floor), Dhaka 1000, Phone : 9515688, 9570707, 01715285644
email : chandrabatiacademy@yahoo.com, web : www.chandrabatiacademy.com
Price : Tk. 350 US $ 20
ISBN : 978 984 885516 4

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশের
বিশেষজ্ঞ পরামর্শ

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অধ্যাপক (সুপার নিউম্যারারি)
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাইখ সিরাজ
কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যাক্তিত্ব
পরিচালক ও বার্তাপ্রধান, চ্যানেল আই

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. গোলাম রহমান
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বর্তমানে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন

অজয় দাশগুপ্ত
সহযোগী সম্পাদক ও সম্পাদকীয়
বিভাগের প্রধান, দৈনিক সমকাল

এম খায়রুল কবীর
প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

কৃতজ্ঞতা • নয়

পরিভাষা ও শব্দসংক্ষেপ • এগারো

মুখবন্ধ • তেরো
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা • পনেরো
সাখাওয়াত আলী খান

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ • একুশ
শাইখ সিরাজ

ভূমিকা : কৃষি সাংবাদিকতা ০১
আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া

প্রথম অংশ : কৃষি

কৃষি ও কৃষিখাতসমূহ ১১
মো. জাহাঙ্গীর আলম, মীর মাসরুর জামান ও মীর সাহিদুল আলম

কৃষিপ্রযুক্তি ৩৭
মো. জাহাঙ্গীর আলম ও প্রয়াস রায়

জিএম প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্য ৪৫
প্রয়াস রায়

এনজিও ও কৃষি ৫৭
মো. রেজাউল হক

কৃষি ও নারী ৬৫
ফাহমিদুল হক

কৃষি বাণিজ্য ৭৩
মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

www.pathagar.com

কৃষিতে মেধাস্বত্ব ৮১
মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন ৯১
রিয়াজ আহমদ

কৃষিনীতি ও কৃষিসম্পর্কিত আইন ১০১
সাজিয়া আফরিন

দ্বিতীয় অংশ : সাংবাদিকতা

কৃষি সংবাদ : প্রবণতা, উৎস ও ধরন ১৩১
অজয় দাশগুপ্ত, মীর মাসরুর জামান, মীর সাহিদুল আলম ও রিয়াজ আহমদ

বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রতিবেদন ১৪১
মীর মাসরুর জামান ও রিয়াজ আহমদ

কৃষি বিষয়ে সম্প্রচার প্রতিবেদন ১৪৭
আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া, মীর মাসরুর জামান, মীর সাহিদুল আলম, রিয়াজ আহমদ ও মো. রেজাউল হক

সাক্ষাৎকার ১৭১
শাহনাজ মুন্নী ও মীর মাসরুর জামান

পরিশিষ্ট

ফসলের রোগবালাই ১৭৯

গণমাধ্যমে কৃষিবিষয়ক সংবাদ ও অনুষ্ঠান ২০৪

নির্ঘণ্ট ২১৩

সম্পাদক পরিচিতি ২১৭

লেখক পরিচিতি ২১৮

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা

কৃষি সাংবাদিকতা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে এসে আমাকে সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়ায় আমি সমষ্টি ও ক্যাটালিস্ট-এর কাছে কৃতজ্ঞ। সমষ্টির মীর মাসরুর জামান, মীর সাহিদুল আলম, মো. রেজাউল হক এবং ক্যাটালিস্ট-এর আশফাক এনায়েতুল্লাহ, আবু সাইফ আনসারী ও নায়েবুর রহমানকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বইয়ের এই সংস্করণ বের হচ্ছে কৃষি সাংবাদিকতা কোর্সের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়ে। তাই চ্যালেঞ্জ ছিল বইটিকে গবেষণানির্ভর অ্যাকাডেমিক বইয়ে রূপান্তরিত করা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লেখকরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আমার মতামতের ভিত্তিতে একাধিকবার তাদের লেখা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছেন। তবে সমষ্টির সাজিয়া আফরিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এত দ্রুত এই সংস্করণটি বের করা সম্ভব হতো না। সাজিয়া প্রত্যেক লেখকের পিছনে লেগে থেকে তাদের কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। আমাকে প্রতিনিয়ত তাড়া দিয়েছেন, তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন। আমি সাজিয়া ও লেখকদের অভিনন্দন জানাই তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান এবং শাইখ সিরাজকে ধন্যবাদ জানাই এই বইয়ের মুখবন্ধ লেখার জন্য। তাদের মুখবন্ধ বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমি আরও ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. গোলাম রহমানকে। তিনি বইটির প্রথম সংস্করণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। ধন্যবাদ জানাই বার্ড-এর প্রাক্তন মহাপরিচালক এম খায়রুল কবীরকে। বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশে তিনিও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

সবশেষে, আমি চন্দ্রাবতী একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাই বইটি প্রকাশের জন্য।

ড. আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া
অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিভাষা ও শব্দসংক্ষেপ

শস্য কর্তন

মোট কী পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়েছে তা পরিমাপের একটি কৌশল বা পদ্ধতি। ফসল যথাযথভাবে পাকার পর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট প্রকার ফসল প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে কাটা হয় এবং মাড়াই-ঝাড়াইয়ের পর তা মাপা হয়। এই প্রক্রিয়ায় হিসাব করা হয় পুরো এলাকায় কিংবা দেশে ওই ফসলের কতটা ফলন বা উৎপাদন হয়েছে। তবে পরিসংখ্যান বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের প্রতিনিধিদের দিয়েও শস্য কর্তন করা হয়।

শস্য পর্যায়

পর্যায়ক্রমিকভাবে নির্দিষ্ট জমিতে পরিকল্পিত ফসল আবাদ। কোনো নির্দিষ্ট জমিতে মাটির স্বাস্থ্যচাহিদা, পুষ্টি ব্যবস্থাপনার কথা মাথায় রেখে যখন পুরো বছরে পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ফসলের আবাদ করা হয় তাকে শস্য পর্যায় বলে।

শস্যের নিবিড়তা

সাধারণত একটি জমিতে বছরে সর্বোচ্চ ৩টি ফসলের আবাদ করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে সামান্য কিছু জমি ৩ ফসলি, মাঝারি পরিমাণ জমি ২ ফসলি আর বেশি পরিমাণ জমি ১ ফসলি। জমিতে ফসলের আবাদের নিবিড়তা বা বারের হিসাবটা নিবিড়ত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়। সর্বোচ্চ ৩০০% যখন হবে তখন বুঝতে হবে পুরো জমিতে বছরে ৩ বার ফসল ফলানো যায়। দেশের বর্তমান ফসলের নিবিড়ত্ব ১৮১%। এর মানে মোটামুটি দেশের জমি বছরে গড়ে ২ বারের কাছাকাছি ফসল ফলানো যায়। একসময় নিবিড়তা আরও কম ছিল। এটি আস্তে আস্তে বাড়ছে। প্রাসঙ্গিকভাবেই বলা যায় কিছু কিছু জমি আছে, যাতে বছরে ৪টি ফসলও করা যায়।

এডবলিউডি (Alternative Drying and Wetting-AWD)

একটি পানিসাশ্রয়ী সেচপদ্ধতি। এতে সেচের পানির অপচয় রোধ হয়, পরিবেশবান্ধব অবস্থার সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে চাষিগণ ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে ৩ থেকে ৫ হাজার লিটার পানি ব্যবহার করেন। আর এডবলিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করলে ১ থেকে দেড় হাজার লিটার পানি ব্যবহার করে একই পরিমাণ ধান উৎপাদন করা যায়।

এলসিসি

এলসিসি হলো লিফ কালার চার্ট। এর অর্থ হলো পাতার রঙের তালিকা। এর একদিকে রয়েছে গাঢ় সবুজ রং, তারপর রয়েছে কিছুটা হাল্‌কা সবুজ এবং সবশেষে রয়েছে একেবারে ফিকে সবুজ রং। প্রতিটি অংশেই রঙের মান দেওয়া আছে। এই রঙের চার্ট ব্যবহার করে জমিতে ইউরিয়া সার ব্যবহার করা হয়।

ব্লক পদ্ধতি

সেচের পানির অপচয় এবং উৎপাদনখরচ কমানোর জন্য সেচ এলাকাকে ৭/৮ ভাগে ভাগ করে দূরের জমিতে আগেভাগে সেচ দিলে কাছের জমিতে সেচ দিতে হয় না। এমনিতেই চুইয়ে পানি এসে সে জমিতে পড়ায় পানির প্রয়োজন মিটে যায়।

ফিতাপাইপ

সেচের পানির অপচয় কমানোর জন্য লাগসই প্রযুক্তি যা প্লাস্টিক বা রাবারের পাইপ দিয়ে সেচের পানি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া হয়। এতে খরচ কম হয়।

পাকা নালা

সেচের পানির অপচয় কমানোর জন্য মাটির নালাকে ইট গাঁথুনি দিয়ে নালা তৈরি করা হয়।

ড্রাম সিডার

www.pathagar.com

অঙ্কুরিত বীজ মেশিনের সাহায্যে বপন করা হয়। এতে সময় কম লাগে, উৎপাদনখরচ কমে যায়, লাভ বেশি হয়।

ফুট স্প্রেয়ার/হ্যান্ড স্প্রেয়ার

উঁচু গাছে বালাইনাশক স্প্রে করার যন্ত্র, যা পা দিয়ে চালনা করা হয়। আর হাত দিয়ে চালানো যন্ত্রকে হ্যান্ড স্প্রেয়ার বলে।

পাওয়ার টিলার

যন্ত্রচালিত লাঙল। কম সময়ে অনেক বেশি জমি চাষ করা যায়।

উইডার

আগাছা/ঘাসনিড়ানি যন্ত্র।

থ্রেসার মেশিন

যে মেশিনের মাধ্যমে ধান বা গম মাড়াই করা হয়।

ব্রি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (BRRI–Bangladesh Rice Research Institute)

বারি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI-Bangladesh Agriculture Research Institute)

ইরি

আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (IRRI–International Rice Research Institute)

বিনা

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BINA–Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture)

বাউ বা বাকৃবি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU–Bangladesh Agricultural University)

শেকৃবি বা সাউ

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (SAU–Sher-E-Bangla Agricultural University)

সার্ডি

কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (CERDI–Central Extension Resourse Institute)

ডিএই

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (DAE–Department of Agriculture Extension)

এসআরডিআই

মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (SRDI–Soil Resaerch Development Institute)

এসসিএ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA–Seed Certification Agency)

বিএলআরআই

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BLRI–Bangladesh Livestock Research Institute)

বিএফআরআই

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI–Bangladesh Forest Resaerch Institute)

এফআরআই

মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (FRI–Fisheries Resaerch Institute)

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

স্বাধীনতার চার দশকে বাংলাদেশে শিল্পের বিকাশ হয়েছে ব্যাপকভাবে। তবু এখনও দেশটি রয়ে গেছে কৃষিপ্রধান। কৃষিকে কেন্দ্র করেই জীবিকা নির্বাহ করেন দেশের সিংহভাগ মানুষ। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের পাঠ্যক্রমে 'কৃষি সাংবাদিকতা' কোর্স চালু হওয়ায় আমি ভীষণ আনন্দিত। এবার সেই কোর্সের আলোকে 'কৃষি সাংবাদিকতা' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে আমি খুব খুশি।

আমাদের দেশের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজ এবং কৃষিকেন্দ্রিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। তাদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য গণমাধ্যমে তুলে ধরা দরকার। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, আমাদের গণমাধ্যম কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ নিয়ে খুব বেশি কাজ করা হয়নি অনেক দিন। পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে সাম্প্রতিক সময়ে। সেই দিনবদলের ধারাবাহিকতার ফসল 'কৃষি সাংবাদিকতা' গ্রন্থটি।

আমরা দেখেছি, বিদেশে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ বা বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। সেভাবে কৃষিকাজ ও কৃষকসমাজের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করা উচিত। সেই বিবেচনায় এই কোর্স ও বইটি ভালো উদ্যোগ। শহরে যারা বসবাস করে, সেসব শিক্ষার্থীও এই কোর্সের মাধ্যমে কৃষির সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারবে। সংযুক্ত হবে আসলে নিজেদের শেকড়ের সঙ্গেই।

গত দেড় দশকে বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বিকাশ ঘটেছে প্রবলভাবে। সময়ের প্রবহমানতায় নতুন নতুন সংবাদপত্র এসেছে। এর চেয়েও বেশি এসেছে টিভি চ্যানেল। আগের মতো কেবল আর সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'বিটিভি'তে আটকে নেই তা। এরই মধ্যে প্রায় ৩০টি বেসরকারি টিভি এখন সম্প্রচারিত হচ্ছে। নিয়মিত বিরতিতে সংখ্যাটি ক্রমশ বাড়ছে। রেডিওর ক্ষেত্রেও বলা যায় একই কথা। এই যে গণমাধ্যম ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে, তাতে চাহিদা বাড়ছে বিশেষায়িত সাংবাদিকতারও। কৃষি সাংবাদিকতার গুরুত্বটা সেখানেই।

এমনিতে কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও আগে কৃষি সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো না খুব একটা। অন্তত মূলধারার সংবাদ হিসেবে কৃষি সংবাদের ঠাঁই হতো না বললেই চলে। কিন্তু

www.pathagar.com

গণমাধ্যমের বিকাশের ফলে ওই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। এখন কৃষি সাংবাদিকতা চলে আসছে সাংবাদিকতার মূলধারায়। কৃষক ও কৃষিজীবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং তাদের সঙ্গে দেশের বাকি মানুষদের সম্পর্ক সাধনের কাজ করছে কৃষিবিষয়ক সংবাদকর্মীরা। হয়তো সাংবাদিকতার শিক্ষা রয়েছে তাদের, কিন্তু কৃষির শিক্ষা হয়তো-বা নেই সেভাবে। এই 'কৃষি সাংবাদিকতা' কোর্স ওই শিক্ষায়ও শিক্ষিত করবে শিক্ষার্থীদের। ফলে কৃষি সাংবাদিকতায় আলো ছড়ানোয় বইটি আলোকবর্তিকার ভূমিকা রাখবে বলে আমার আশা।

বাংলাদেশের কৃষকদের সামনে বাধা অনেক। বড় বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে শুরু করে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে প্রায়শ হুমকির মুখে পড়ে তাদের জীবন-জীবিকা। কিন্তু এই শত প্রতিকূলতার মধ্যেও তারা লড়াই করে যান প্রতিনিয়ত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলান। সেই সোনালি ফসলের হাসিতে হাসি ফোটে দেশের জনগণের। মেটে খাদ্যচাহিদা।

কৃষি সাংবাদিকতার সামনেও তেমনি অনেক বাধা। অগুনতি চ্যালেঞ্জ। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বোধকরি এ বিষয়ে যথার্থ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব। 'কৃষি সাংবাদিকতা' বইটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের ওই চ্যালেঞ্জে জিততে পারবে বলে আমার দৃঢ় আশাবাদ। তাতে উপকৃত হবেন বিকাশমান গণামাধ্যমের কৃষি সাংবাদিকরা। আর তাদের সমৃদ্ধ হওয়ার অর্থ তো কৃষকদেরই উপকৃত হওয়া। সেই সূত্র ধরে সারা দেশের ১৬ কোটি মানুষের মুখে হাসি ফোটা। বইটির এই নতুন সংস্করণ পুরো প্রক্রিয়াকে বেগবান করবে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে সবাই যে এই কাজের সঙ্গে জড়িত থাকবেন, এমন নয়। তবু সব শিক্ষার্থীর অন্তত কৃষি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অনেকের কাছেই সেই ভুবনটি অচেনা। সেটি হাত ধরে ধরে চিনিয়ে দেওয়ায় এই 'কৃষি সাংবাদিকতা' বইটি আকরগ্রন্থ হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক
উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১.

গত ষাট দশকের শুরুর দিকের একটি ছোট্ট ঘটনা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছিলাম। তখন ঢাকা শহরে এত যানজট ছিল না। রাস্তাঘাট মোটামুটি ফাঁকা। রাস্তার ট্রাফিক বাতি প্রায় পেরিয়ে গেছি, এমন সময় হঠাৎ হাত তুলল পুলিশ। ড্রাইভার ব্রেক কষলে আমরা মাঝারি ধরনের একটা ঝাঁকুনি খেলাম। ট্রাফিক পুলিশটির উপর আমরা বেশ অসন্তুষ্ট। কেন সময়মতো হাত তুলল না। আমার আত্মীয়ার মন্তব্য, 'দেখেছ, পুলিশটা কী চাষা।' গাড়িতে অন্যরা আত্মীয়ার কথায় সায় দিয়ে পুলিশের দক্ষতা ও দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে আরও কিছু মন্তব্য করল।

আমার মনে অবশ্য খচখচ করতে থাকল একটা ব্যাপার। পুলিশটি সম্পর্কে তিরস্কারের ভাষা প্রয়োগে আমার আত্মীয়াটি 'চাষা' শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? চাষিরা তো অদক্ষ নয়, তারা দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে তো শুনিনি। তবে কি কেবল তুচ্ছার্থে তাদের হেয়জ্ঞান করতেই এই ভাষা প্রয়োগ? অর্থাৎ চাষা তার কাছে একটি গালিমাত্র। আমি জানি আমার সেই সরলমনা উচ্চমধ্যবিত্ত আত্মীয়াটিকে তার এই ভাষাপ্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন করে লাভ নেই। তিনি জবাব দিতে পারবেন না। এই শব্দ বা এই মনোভাব তিনি রপ্ত করেছিলেন তার পারিপার্শ্বিক থেকে। চাষাকে হেয়জ্ঞান করতে শিখিয়েছে তার সমাজ।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনার পর পানি অনেক প্রবাহিত হয়েছে। অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে হয়তো যায়নি, তবে আশার কথা এই যে, পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। চাষি, তা সে শস্যের চাষি, মৎস্যচাষি কিংবা হাঁসমুরগি গবাদিপশু পালনকারী যারাই হোক না কেন, এ দেশকে বাঁচাতে, সমৃদ্ধ করতে, বিশ্বের কাছে মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসাতে তাদের কাছেই যে আমাদের যেতে হবে, সে কথাটা হৃদয়ঙ্গমকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। দেশ-বিদেশ ঘুরে এসে অনেকেই বুঝতে পারছেন নিজেকে চাষি হিসেবে পরিচয় দেওয়া রীতিমতো গর্বের বিষয়। তাই চাষা বলে অন্নদাতাদের হেয় করার মতো বিবেচনাহীন মানুষের সংখ্যাও ক্রমশই কমছে। পৃথিবীর অনেক বড় বিপ্লবের নেতা চাষির গর্বিত সন্তান, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার গর্ব করে বলেন, 'আমি বাদামচাষি'। চাষবাস,

www.pathagar.com

মৎস্যচাষ, হাঁসমুরগি ও পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট শিল্প স্থাপন করে উন্নতি ও খ্যাতির শিখরে উঠেছে পৃথিবীর বেশকিছু দেশ।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, গঠন ও ভূপ্রকৃতি থেকে অনায়াসে বোঝা যায় যে, কৃষিই আমাদের মূল ভরসা। প্রতি বছর পলিমাটির আস্তরণ পড়া এই দেশটি একটি উর্বর বদ্বীপ, শত শত নদী প্রবাহিত বৃষ্টিস্নাত এই ছোট দেশটিতে চাষিরা পরিশ্রমী, তারা নতুন উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণে উন্মুখ। এ দেশের নদীনালা, খালবিল, হাওরবাঁওড়, জলাশয়ে মাছচাষের রয়েছে অপূর্ব সুযোগ, অধিবাসীরা হাঁস-মুরগি, পশুপালনে অভ্যস্ত ও আগ্রহী, তদুপরি এ দেশের মাটির নিচে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, যা দিয়ে অনায়াসে সার উৎপাদন করা যায়। এমন দেশের কৃষি সেক্টর কেন বিশ্বমানের হবে না?

আসলে ক্ষেত্র প্রস্তুত। দেশবাসীও মানসিকভাবে অনেকটাই তৈরি। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ধীরে হলেও আকৃষ্ট হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদে। এখন এই সেক্টরে দরকার পুঁজি ও তথ্যের জোগান। এই মুহূর্তে বেশি দরকার ইতিবাচক কৃষিতথ্যের বিপুল প্রচার। পুঁজিও আশা করা যায় আসতে থাকবে তথ্য প্রচারিত হলেই। পুঁজির মালিকেরা বুঝতে পারবেন এটা সত্যিই লাভজনক সেক্টর। প্রবাসী পুঁজিমালিকরাও আকৃষ্ট হতে পারেন। কেননা তারা অনেকেই হয়তো কৃষিখাতে লাভজনক বিনিয়োগের প্রত্যক্ষদর্শী। যারা দেশে ইতোমধ্যেই আছেন কৃষি বা সংশ্লিষ্ট কাজে, তাদের কাছে প্রয়োজনীয় ও অনুপ্রেরণামূলক কৃষিতথ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের এবং বিশেষভাবে গণমাধ্যমের।

গণমাধ্যমের দায়িত্ব এ ক্ষেত্রে বলতে গেলে অপরিসীম। অবশ্য কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, কেন গণমাধ্যম একাজ করবে? কী তাদের স্বার্থ? অস্বীকার করব না, তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিবেশে এ ধরনের প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়, বরং এটা এই ব্যবস্থার একটা দুর্বল দিক। নগদ আর্থিক প্রাপ্তির আশা জাগানোই এই সংস্কৃতির অমোঘ পরিণতি, কাজেই এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তবে এ প্রশ্নেরও উত্তর আছে। কৃষিবিষয়ক সংবাদ, ফিচার, অনুপ্রেরণামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ তথ্য এখন খুবই জনপ্রিয়। গণমাধ্যমের সঙ্গে কর্মী এবং শিক্ষক হিসেবে প্রায় অর্ধ শতকের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এদেশে গণমাধ্যমের বিপুলসংখ্যক পাঠক-শ্রোতা-দর্শক সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে কৃষিক্ষেত্রে প্রতিটি সাফল্য, প্রতিটি নতুন উদ্যোগ, প্রতিটি নতুন উদ্ভাবিত সফল পন্থা সম্পর্কে জানতে পেরে দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়। এদেশের অধিকাংশ মানুষই, শুধু গ্রামবাসী নয়, শহরের জনগোষ্ঠীরও বিপুল অংশের মনপ্রাণ এখনও গ্রামেই পড়ে আছে। কাজেই তথ্য, সংবাদ, ছবি, ফিচার, চলচ্চিত্র এক কথায় যেকোনো আকর্ষণীয় বিষয় প্রচার করে গণমাধ্যম অধিকাংশ পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের আরও কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে। আশার কথা দেশের কিছুসংখ্যক দক্ষ গণমাধ্যমকর্মীর মধ্যে এই প্রবণতা এখনই দেখা যাচ্ছে এবং কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে রীতিমতো মনে রাখার মতো কাজ করেছেন।

কৃষির উন্নয়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশসংক্রান্ত রিপোর্টিংয়েও গণমাধ্যমকেই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। গণমাধ্যমজগতের অপেক্ষাকৃত নতুন সদস্য মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটকে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগানো দরকার। সংবাদপত্রে,

www.pathagar.com

বিশেষ করে টেলিভিশনে প্রচারিত বিপুল ফলনশীল শস্যের মাঠ, তাজা মাছ বা স্বাস্থ্যবান গবাদিপশুর ছবি দর্শকরা বহুদিন মনে রাখে। রেডিও এখন ঘরে ঘরে, তাই এতে প্রচারিত কৃষিতথ্য সহজেই পৌঁছে যায় জনগণের কাছে। ষাটের দশক থেকে উন্নয়ন সাংবাদিকতা নামে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে নতুন সাংবাদিকতার ধারা সৃষ্টি হয়েছে, সম্ভবত তার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র এখন কৃষি।

অনেক উন্নত দেশেই কৃষিবিষয়ক সাংবাদিকরা ঈর্ষণীয় মাত্রায় আয় করে থাকেন। তবে শুধু সে জন্যই নয়, আমার তো মনে হয়, চাষির স্বার্থে কৃষিবিষয়ক ইতিবাচক প্রচার ও লেখালেখি করে গণমাধ্যমকর্মীরা সকল কৃতজ্ঞ মানুষের পক্ষে তাদের অন্নদাতাদের ঋণই কেবল কিছুটা পরিশোধ করতে পারেন। বর্তমান অবস্থায় বাংলাদেশে সর্বাধিক সম্ভাবনাময় কৃষিখাতের উন্নয়নে নিবেদিত হতে হবে সাংবাদিক তথা গণমাধ্যমকর্মীদের। চাষির কাজ, তার মনোভাব, তার সুখদুঃখ বুঝতে হবে। যতটা সম্ভব কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হবে তাদের। একাত্ম হতে হবে কৃষকের সঙ্গে। এক অর্থে কৃষিবিষয়ক সাংবাদিকরা নিজেরাই হয়ে যাবেন কৃষিকাজের অংশীদার। মাঠে না নামলেও তাদের হতে হবে অর্ধেক চাষি, অর্ধেক সাংবাদিক। ভবিষ্যতে তরুণ প্রজন্মের আরও অনেক শিক্ষিত প্রতিভার পদচারণায় মুখর হবে সংশ্লিষ্ট অঙ্গন, এমন আশা করা বোধকরি অন্যায় হবে না।

২.

কৃষি নিয়ে লেখার বিষয়ের সংখ্যা সীমাহীন। এদেশে বিশেষ করে কৃষি উৎপাদন, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপণ্য বিপণন, রপ্তানি, কৃষিসংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে মুদ্রণমাধ্যমে লেখালেখি ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সম্প্রচার করা একান্তভাবে দরকার। অন্যান্য বিষয়কে খাটো না করেও বলা যায় যে, কৃষিতেই নিহিত রয়েছে আমাদের জাতির প্রাণভোমরা। বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে শুনেছিলাম, যে সরকার চালের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হবে, তার পতন অনিবার্য। তাদের অনেকের মতে এটাই নাকি এ দেশের রাজনীতির সবচেয়ে দামি কথা।

কথাটা প্রতীকী অর্থে হলেও সত্য। 'ভাত ও ভোটের অধিকার' বলেও আমাদের রাজনীতিতে একটা কথা আছে। যদি কোনো দরিদ্র নারী বলে যে, 'স্বামী ভাত দেয় না', তবে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, স্বামী ভরণপোষণ করে না। এখানেও 'ভাত' প্রতীকী অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ একটি কৃষিপণ্য ভাত এ দেশের মানুষের জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই শব্দটি দিয়েই সে জীবনের চাওয়াপাওয়ার প্রায় পুরোটাকেই বোঝাতে চায়।

বাঙালির প্রধান খাদ্য মাছভাত। এর মধ্যে ভাতের উৎস বা ধান পুরোটাই জমিতে চাষ করতে হয়। মাছেরও বিপুল অংশ এখন চাষ করা হয়। প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে যারা মাছ ধরে তাদের আমরা বলি জেলে। কিন্তু সেই জলাশয়গুলোরও যত্ন নিতে হয়, অন্যথায় তাতে মাছ থাকে না। তাই জেলেরাও চাষিগোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। গ্রামাঞ্চলে কামাররা প্রধানত চাষিদের জন্যই সরঞ্জাম তৈরি করে। এক অর্থে তারাও গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সম্প্রসারিত অংশ।

এভাবে বিচার করলে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এমন অনেক বিষয়ই এখন কৃষিবিষয়ক সাংবাদিকতার ক্ষেত্র।

www.pathagar.com

কৃষিবিষয়ক সাংবাদিক, যাদের সরাসরি কৃষি সাংবাদিকই বলা যায়, তাদের একটা বড় কাজ হবে পৃথিবীতে নানা দেশে কী কী মাত্রায় কৃষির উন্নতি ঘটেছে তা তুলে ধরা। কৃষিক্ষেত্রে যেখানেই চাষিরা সাফল্য পাক না কেন, সেই সাফল্য সারা বিশ্বের চাষিদেরই সম্পদ। কৃষিবিজ্ঞানীরা দেশে এবং বিদেশে চাষবাসের ক্ষেত্রে যে গবেষণা করছেন এবং সাফল্য পাচ্ছেন, তা-ও চাষিরই জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে বা আনবে। এখন পৃথিবীর যোগাযোগব্যবস্থা আগের যে কোনো সময়ের চাইতে উন্নত। সেই ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে দ্রুত যেকোনো সাফল্যের খবর বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার মূল দায়িত্ব সাংবাদিকদের।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এখন জ্বালানি সমস্যায় জর্জরিত। মানুষের আহার যেমন জোগায় কৃষি, তেমনি কৃষির কিছু কিছু পণ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত হয়। পাট বা তুলা তার বড় উদাহরণ। এগুলো খাদ্যবস্তু নয় বটে, কিন্তু এ দেশের চাষি এগুলো বিক্রি করে একদিকে যেমন আহার্য কিনতে পারে, তেমনি জীবনধারণের অন্যান্য উপকরণও সংগ্রহ করতে পারে। বিশ্বের অনেক দেশ ইতোমধ্যেই খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে উদ্বৃত্ত খাদ্য রপ্তানি করছে। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে মানুষ খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়, বিশ্বে এখনও বিভিন্ন অঞ্চলে কোটি কোটি শিশু রাতে খাদ্যের অভাবে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। এই ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর মুখে অন্ন তুলে দিতে পারলে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য থেকে মানুষ জ্বালানি তৈরি করতে পারবে। ইতোমধ্যেই কোনো কোনো দেশে খাদ্যশস্য থেকে যন্ত্র চালানো বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের এই বিস্ময়কর সাফল্য পৃথিবীর অর্থনীতি পাল্টে দিতে পারে। একদিন হয়তো দেখা যাবে, মাটির নিচের জীবাশ্মজাত জ্বালানির বদলে কৃষিপণ্যের ব্যবহারের মাধ্যমে আজকের জ্বালানি সমস্যার সমাধান হবে। পৃথিবীর এক সময়ের বেশ কিছুসংখ্যক গরিব ও মরুময় দেশ মাটির নিচে জ্বালানির সন্ধান পেয়ে হঠাৎ ধনী হয়ে গেছে, তারা এখন দরিদ্র দেশের মানুষদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য, এমনকি সরাসরি অপমান করতেও দ্বিধাবোধ করে না। যদি সারা বিশ্বের ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর মুখে অন্ন জুগিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য থেকে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি উৎপাদন করা যায়, তবে তখন হয়তো কৃষিপ্রধান দেশগুলোই বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতৃত্বের আসনে বসবে। তখন মরুর দেশের মানুষরাই হয়তো সাহায্যের জন্য কৃষিপ্রধান দেশগুলোর দ্বারে ধরনা দেবে। তখন কৃষকরাই হয়তো সবচাইতে দামি বাড়িতে থাকবে, তারাই ক্রেতা হবে সবচাইতে দামি গাড়ির কিংবা আসবাবপত্রের। এ সমস্ত নির্ভর করবে জীবাশ্ম থেকে পাওয়া মাটির নিচের তেলের তুলনায় কত কম খরচে কৃষিজাত পণ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন করা সম্ভব হবে তার উপর। তেমন দিন এলে কে জানে হয়তো কৃষিপ্রধান দেশেই স্থাপিত হবে প্রধান শিল্পকারখানাগুলো। তারাই তখন ঋণ দেবে অপেক্ষাকৃত গরিব দেশগুলোকে। এসব দেশেই হবে বেশি কর্মসংস্থান। ফলে এই দেশগুলোর দূতাবাসের সামনে ভিসা পাওয়ার জন্য মানুষের দীর্ঘ লাইন পড়ে যাবে।

এই চিন্তাকে সম্পূর্ণ কষ্টকল্পনা বলে বাতিল করা মনে হয় ঠিক হবে না। কৃষককে এখন যেমন আমরা অন্নদাতার মর্যাদায় আসীন করে তার গুরুত্ব অনুধাবনে চেষ্টা করছি, তখন হয়তো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মানুষেরা কৃষিসেক্টরে কাজ করতেই বেশি আগ্রহী হবেন। আমার ধারণা, সেদিন সম্ভবত খুব দূরে নয়। সাংবাদিকদের তাই এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

www.pathagar.com

আজকের ডিজিটাল দুনিয়ায় আমরা যতই যন্ত্রনির্ভর হই না কেন, একটা কথা সত্যি যে, খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচবে না। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন যা কিছু হচ্ছে বা হবে তা হলো খাদ্যের ধরনের। মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন হলেও মাটি থেকে উৎপাদিত খাদ্য তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া কেনো দিনই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। বরং যতই দিন যাচ্ছে খাদ্যের ক্ষেত্রে মানুষ ততই আরও প্রকৃতির কাছাকাছি যেতে চাইছে। কৃত্রিম উপাদানের মাধ্যমে বাড়তি উৎপাদন সম্ভব করেছে বিজ্ঞান—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, বৈজ্ঞানিক কারণেই এখন সচেতন মানুষেরা প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ খাবারের দিকে ঝুঁকছে। আধুনিক মানুষ জীবনের প্রায় সর্বাংশে ডিজিটাল হওয়ার কথা ভাবলেও খাদ্যের ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তা হচ্ছে, কত বেশি অর্গানিক হওয়া যায়। বিজ্ঞানই এখন মানুষকে অর্গানিক খাবার খেতে উদ্বুদ্ধ করছে। এখন কৃত্রিম সারের বদলে জৈব সারের পক্ষে জোরালো কণ্ঠে কথা বলছেন বিজ্ঞানীরাই। সেই কণ্ঠে কণ্ঠ মেলানো এখন অবশ্যকর্তব্য সাংবাদিকদের।

আধুনিক সভ্যতার বিকাশ এখন এমন এক স্তরে যে, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর' বলে বিশ্বকবির আহ্বানে সাড়া দেওয়া হয়তো আর সম্ভব নয়, কিন্তু কৃষিজাত উৎপাদনের ধারাকে যতটা সম্ভব প্রকৃতিরই কাছাকাছি রাখতে হবে। অন্যথায় মানুষেরই ক্ষতি। তবে এ ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে স্থবির করে ফেললে চলবে না। বিশেষ করে আমাদের মতো স্ফীত জনসংখ্যার দেশে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়াতেই হবে। আবার সেই উৎপাদন হতে হবে অর্গানিক। এই আপাত কঠিন কাজে বিশাল দায়িত্ব পালন করতে হবে সাংবাদিকদের। জৈব সারের উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসলের পোকামাকড় দমন ও বালাইনাশে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার না করা, খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের কিংবা ফল পাকানোর ক্ষতিকর কৃত্রিম পন্থা বর্জন এবং একইসঙ্গে নিরাপদ উপায়ে খাদ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য চাষিদের জানানোর প্রধান দায়িত্ব এখন সংবাদকর্মীদের উপর বর্তেছে। এই দায়িত্ব আর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের মধ্যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানার আগ্রহও অনেক বেড়েছে। রাজনীতি, দুর্ঘটনা, দুর্নীতিসংক্রান্ত সংবাদের একঘেয়েমির অস্বস্তি থেকে তারা এখন স্বস্তি পেতে চায় সাফল্য-আনন্দ-বিনোদনের ঘটনাগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের খবর তাদের উজ্জীবিত করবে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া যদি সঠিক উপস্থাপনার মাধ্যমে এই তথ্যটি তুলে ধরা যায় যে, কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আমাদের পক্ষে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব, তাহলে হয়তো ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল স্তরের পুঁজির মালিকরাও এ ক্ষেত্রে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবে।

তদুপরি এখন এদেশে অনেক শিক্ষিত মানুষও কৃষিকে পেশা হিসেবে নিচ্ছেন। অনেকের আয়ও উল্লেখযোগ্য। তারা তাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করতেও আগ্রহী। সেই মানুষগুলোর কাছে সহজেই কৃষিকার্যের পরিধি বাড়ানোর উপায়ও পৌঁছে দিতে পারেন কৃষি সাংবাদিকরা। কৃষি সাংবাদিকতার বিপুল ক্ষেত্র সাংবাদিকদের সামনে এখন ক্রমশই আরও উন্মোচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আগ্রহী সাংবাদিকদের এখনই কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়। চাষির সামনে যেমন প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, তারপর বীজ বোনা হয় এবং পরিশেষে এক সময় তারা আনন্দিত চিত্তে ফসল ঘরে তোলেন, তেমনি এখন কৃষি সাংবাদিকদের সামনেও ক্ষেত্র প্রস্তুত, এখন বীজ বুনে অচিরেই তাদের ক্ষেত্র শস্যে ভরে তুলতে হবে।

www.pathagar.com

পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে তাদের উপস্থাপিত বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতাই হবে সেই ফসল। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের দেশেও কৃষি সাংবাদিকরা ফসল ঘরে তুলে শীঘ্রই নবান্নের উৎসবে মেতে উঠবেন।

বাংলা ভাষায় কৃষি সাংবাদিকতার এই হ্যান্ডবুকটি প্রকাশ করে এই পর্যায়ে এর উদ্যোক্তারা একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই পুস্তকের বিষয় নির্বাচন ও অধ্যায় বিন্যাসে সুচিন্তার ছাপ রয়েছে। সম্পাদক ও লেখকেরা যথেষ্ট দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে এটি যেহেতু প্রথম সংস্করণ, কাজেই হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। পরবর্তী সংস্করণগুলোকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি। বইটি কৃষি সাংবদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনেকটাই সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এই প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সাখাওয়াত আলী খান
অধ্যাপক (সুপারনিউম্যারারি)
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

কৃষি একমাত্র একক খাত যেটির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনোভাবে জড়িত—কখনও কৃষক, কখনও ভোক্তা; আবার কখনও বাজার ও সরবরাহব্যবস্থার পক্ষ হিসেবে। বাংলাদেশের মতো জনবহুল কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি যতটুকু গুরুত্ব পাওয়া দরকার অনেক সময়ই তা লক্ষ করা যায় না। অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তার বলয়টি সুসংহত রাখতে বিশাল ভূমিকা রাখছে আমাদের কৃষি।

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রেডিও, টেলিভিশনের কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান, সংবাদপত্রের কৃষিপাতা ইত্যাদির উপস্থিতি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কৃষি গণমাধ্যমের কাছে কতটা প্রয়োজনীয়।

গণমাধ্যমে কৃষির বিষয়বস্তুর আঙ্গিকের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায়, বিশেষ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কৃষিসংবাদও এখন মূলধারার সংবাদ হিসেবে স্থান পাচ্ছে। এটি আশার কথা। তবে বিশাল সম্ভাবনা থাকলেও বিশেষায়িত বিষয় হিসেবে কৃষি নিয়ে সংবাদপ্রাধান্য এখনও অনেক কম। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোতে কৃষিবিষয়ক সংবাদ এখনও অর্থনৈতিক বিটের সঙ্গে একীভূত। অথচ যেকোনো বিচারে কৃষি আলাদা বিট হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার দাবি রাখে।

কৃষির মতো একটি বহুমুখী বিষয়ে সংবাদপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন কিছু প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন। সবার আগে প্রয়োজন কৃষি বিষয়ে সাংবাদিক এবং সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়ানো। সাংবাদিকতার পঠনপাঠনে কৃষি সাংবাদিকতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রক্রিয়াটি শুরু করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সাংবাদিকতা শিক্ষায় কৃষির মতো একটি ব্যাপক বিষয় এখনও উপেক্ষিত রয়ে গেছে। কৃষিনির্ভর একটি দেশের জন্য এটি কখনও কাম্য হতে পারে না। কৃষিবিষয়ক সংবাদ নিয়ে সাংবাদিকদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ প্রত্যাশিত। আশার কথা, গণমাধ্যম ও কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা শিক্ষায় কৃষি সাংবাদিকতার অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিতে মনোযোগী হয়েছেন। এ রকম প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায় এ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কৃষি সাংবাদিকতা বিষয়ে আলাদা করে পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা আদৌ রয়েছে কি না। আর দশটি বিষয়ে সাংবাদিকতার মতোই বহুলব্যবহৃত কলাকৌশলগুলো প্রয়োগ করেই তো এরকম সাংবাদিকতা করা যায়—এমন যুক্তিও দেখাতে পারেন কেউ কেউ। হয়তো এটি সম্ভব। তবে কৃষির ব্যাপকতা এবং কৃষির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি বিবেচনায় নিলে অনেকেই একমত হবেন, কৃষিকে সাংবাদিকতায় বিশেষ বিষয় হিসেবে মর্যাদা দেওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত।

কৃষি একটি বহুমুখী বিষয়। এটি একইসঙ্গে জীবনোপায়, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, শিল্প, ব্যবসা, অর্থনীতি, শিক্ষা, নীতি, দর্শন ইত্যাদি। যে কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হোক না কেন, এটি সবসময়ই একটি অপরিহার্য বিষয় হিসেবেই স্থান পাবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ কৃষক—এ সত্যটি যেমন চিরন্তন, তেমনি অন্যান্য যে কোনো বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। এসব উদাহরণ স্পষ্ট ধারণা দেয়, কৃষি সত্যিই কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই কৃষি সাংবাদিকতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের কৃষি নানা ধরনের বিবর্তন ও পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছে। এর সঙ্গে নানা বৈজ্ঞানিক ও আর্থ-সামাজিক নতুনত্ব এবং উদ্ভাবন যুক্ত হচ্ছে। আবার নানা নেতিবাচক উপাদান কৃষক বা কৃষির ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী বা সাংবাদিকতা পেশায় যারা যুক্ত, তাদের বেশিরভাগই কৃষিপ্রধান একটি দেশের নাগরিক হিসেবে কৃষি সম্পর্কে কমবেশি ধারণা রাখেন। তবে শুধু প্রাথমিক ধারণা নিয়ে কৃষি বিষয়ে সাংবাদিকতা করলে কৃষির খুঁটিনাটি নানা বিষয় পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের নজরে আনার সামর্থ্য নাও অর্জিত হতে পারে। তাই কৃষি সম্পর্কে সম্যক ধারণা সাংবাদিকতার একটি বিশাল দিগন্ত খুলে দেবে। এটি প্রকৃতপক্ষে দেশের অগুনতি কৃষক, কৃষি এবং সর্বোপরি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে সমর্থন জোগাবে।

দারিদ্র্য নিরসন, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা এমনকি সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব নিয়ে আর নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে কৃষিই সেই খাত, যার উন্নয়নের সুফল পায় সবচেয়ে বেশি মানুষ। আর জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয় যখন আমাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছে, তখন কৃষিখাতের যুগোপযোগী সৃজনশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করাও জরুরি। এজন্য প্রয়োজন বিষয়টির নানাদিক সবসময় গণমাধ্যমের মতো জায়গায় বিশ্লেষণ ও আলোচনার প্ল্যাটফর্মে রাখা।

আর আগেই বলা হয়েছে, বাংলাদেশের কৃষির পরিসর ব্যাপক। পুরো কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে একজন দরিদ্র চাষি বা জেলে থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মহলের ব্যক্তিবর্গ জড়িত। ফসলবৈচিত্র্যের মতো কৃষির বিভিন্ন খাত-উপখাতও (ফসল ও শস্য, বন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য) নানা শাখাপ্রশাখায় প্রবাহিত। রাষ্ট্র বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষির সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে। কৃষিতে যেমন বস্তুগত বহু বিষয় রয়েছে, আবার মানবিক অনেক বিষয়ও এর সঙ্গে যুক্ত।

আমাদের দেশে কৃষি সাংবাদিকতা এখনও একটি বিশাল সম্ভাবনাময় জায়গা। কৃষি সাংবাদিকতা করতে হলে একজন সাংবাদিককে কৃষির প্রতি পুরোমাত্রায় নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে—স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে নিজেকে বেশি উজাড় করে দিতে হবে। তার মধ্যে দেশপ্রেম থাকবে একজন সাধারণ নাগরিকের চেয়ে অনেক বেশি।

কৃষিবিষয়ক সংবাদে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় বলে অনেকে এতে আগ্রহী হন না। নবীন যারা সাংবাদিকতায় আসছেন তাদের মধ্যে একটি প্রবণতা থাকে রাজনৈতিক বা অপরাধবিষয়ক রিপোর্টের মতো আপাতজনপ্রিয় বিষয়ের দিকে, যাতে সহজেই খ্যাতি পাওয়া যায়। এতে হয়তো প্রভাবশালীদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় কিন্তু মানুষের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় না।

কৃষি সাংবাদিকতার বিকাশের ক্ষেত্রে আরেকটি অন্তরায় হচ্ছে এ বিষয়ে বইপত্রের অভাব। এ শূন্যতা পূরণের একটি সামান্য প্রয়াস এই গ্রন্থটি। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী ও অনুশীলনকারীদের কথা মাথায় রেখে এই গ্রন্থে কৃষির কিছু জরুরি প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষির সামগ্রিক চিত্র, কৃষিখাত ও উপখাতসমূহ, শিল্পসহ অন্যান্য খাতের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক, কৃষিনীতি, কৃষিসংস্কৃতি, কৃষি ও নারী, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি যোগাযোগ ও গণমাধ্যম। এ ছাড়াও কৃষি সাংবাদিকতার কৌশল, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের জন্য রিপোর্টিং, সম্পাদনা, কৃষি পরিভাষা ইত্যাদি বিষয়ও এতে স্থান পেয়েছে। কৃষিবিদ, যোগাযোগবিদ ও সাংবাদিকরা যুক্ত ছিলেন এটির গ্রন্থনায়।

কৃষির সম্ভাবনা ও নতুন চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আরও বেশি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আর গণমাধ্যমই হতে পারে এসব আলোচনা ও বিতর্কের প্রধান বাহক। কৃষি সাংবাদিকতা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের প্রত্যাশা, গ্রন্থ বাংলাদেশের কৃষি সাংবাদিকতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

শাইখ সিরাজ
পরিচালক ও বার্তাপ্রধান
চ্যানেল আই

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা : কৃষি সাংবাদিকতা

আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া

কৃষি সাংবাদিকতা বলতে আমরা কী বুঝি? এটি বোঝার জন্য দুটি ধারণা—'কৃষি' ও 'সাংবাদিকতা'-কে সংজ্ঞায়িত করা দরকার। The American Heritage Dictionary (4th Edition) অনুসারে কৃষি হচ্ছে 'The science, art and business of cultivating soil, producing crops and raising livestock'। এই সর্বাত্মক সংজ্ঞায় ফসল চাষ ও গবাদি পশু পালনের প্রযুক্তিগত দিক ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশে ফসল, মৎস্যসম্পদ, প্রাণিসম্পদ ও বন উপখাতসমূহ কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৩)। একই অভিধান অনুসারে 'সাংবাদিকতা' হচ্ছে 'The collecting, writing, editing and presenting news or news articles in newspapers and magazines and in the radio and television broadcasts.' এই সংজ্ঞায় সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত সকল ধাপের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—সংবাদ সংগ্রহ, লেখা, সম্পাদনা ও উপস্থাপন। গণমাধ্যম যেমন, সংবাদপত্র, রেডিও বা টেলিভিশন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়।

এবারে আসি, কৃষি সাংবাদিকতা বলতে কী বুঝি। কৃষি সাংবাদিকতা হচ্ছে কৃষিসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ, লেখা ও সম্পাদনা করা এবং কোনো না-কোনো গণমাধ্যমে এটি উপস্থাপনা করা। মুদ্রণমাধ্যম তথা সংবাদপত্রে এই উপস্থাপনের কাজটি হয় সংবাদটি পত্রিকার পাতায় ছাপা হওয়ার মাধ্যমে, আর রেডিও এবং টেলিভিশনে হয় নিউজ বুলেটিনের অংশ হয়ে পঠিত বা বিবৃত হওয়ার মধ্য দিয়ে।

কাজের ক্ষেত্রে যেকোনো সাংবাদিকের ন্যায় একজন কৃষি সাংবাদিকেরও যে প্রশ্নগুলো মনে জাগে সেগুলো হচ্ছে—কী নিয়ে তথ্যসংগ্রহ করব? কীভাবে সংগ্রহ করব? কোথা থেকে করব? কেন করব? কী বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় কৃষিতে অনেক বিষয় আছে, যা নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে। যেমন—ফসলের উৎপাদন, ফলন, ফলনের পরিমাণ বাড়া-কমা, কৃষিপ্রযুক্তি, নতুন বীজ আবিষ্কার, ফসল বাজারজাতকরণ, সারের

www.pathagar.com

ব্যবহার, সেচের ব্যবহার, মৎস্যচাষ ও বাজারজাতকরণ, গবাদি পশু পালন ও বাজারজাতকরণ, কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সুখ-দুঃখ, কৃষিসংক্রান্ত নীতিমালা এবং কৃষি বিষয়ে সরকার, এনজিও এবং বেসরকারিখাতের তৎপরতা—এরকম নানা বিষয়ে প্রতিবেদন ও ফিচার তৈরি করা যেতে পারে। এজন্য এসব বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করা দরকার।

একজন সাংবাদিক চারভাবে তথ্য পেতে পারেন :

ক. তার নিজস্ব সূত্র থেকে : একজন প্রতিবেদককে বিভিন্ন কৃষিবিষয়ক প্রতিষ্ঠান যেমন—কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সোর্স তৈরি করতে হবে, যারা তাকে বিভিন্ন তথ্য দেবেন। প্রতিদিন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করা ও এইসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও জনসংযোগ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার মধ্যদিয়ে সোর্স তৈরি হতে পারে এবং কোনো বিষয়ে ক্লু পেতে পারেন।

খ. বিভিন্ন ডকুমেন্ট যেমন—কৃষিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সভার রেকর্ড, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং গবেষণা প্রতিবেদন সংবাদের সূত্র হতে পারে। আবার এগুলো প্রমাণ হিসেবেও প্রতিবেদনে ব্যবহৃত হতে পারে।

গ. বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং রেডিও টেলিভিশনের কৃষিসংক্রান্ত খবর দেখে ও পরবর্তীতে কৃষিসংক্রান্ত কী সংবাদ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অনেক বিষয়েরই পুরোটা দিনের সংবাদে কাভার করা সম্ভব হয় না। ঘটনার ধরনের কারণে অর্থ বা সময়ের স্বল্পতার কারণে এটি হয়। এক্ষেত্রে ফলোআপ প্রতিবেদন করা যেতে পারে। কোনো প্রতিবেদক প্রথমে কোনো খবর মিস করলে বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহ করে ফলোআপ প্রতিবেদন করতে পারেন। এভাবে অন্যান্য গণমাধ্যম প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একজন সাংবাদিক তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান কী কী বিষয়ে রিপোর্ট করছে সেটিও জানতে পারেন। তাতে প্রতিযোগিতার বাজারে তার প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার ও সমৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা বাড়ে।

ঘ. কখনও কখনও কোনো ঘটনায় ভুক্তভোগীরা ফোন করে সংবাদিককে কোনো ঘটনা সম্পর্কে ক্লু বা আভাস দেয়। এটি ধরে সাংবাদিক সামনের দিকে আগায়। সিনিয়র বা সুপরিচিত সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে সাধারণত এটি ঘটে।

ঐ সকল বিষয়েই সাংবাদ সংগ্রহ করতে হয় যে সকল ঘটনার সংবাদ মূল্য রয়েছে বা যে সকল বিষয়ে একটি বড় সংখ্যক মানুষের জানার আগ্রহ রয়েছে। কোন্ বিষয়ে একটি বড় সংখ্যক মানুষ জানতে চায়, তা বোঝার জন্য একটি ঘটনায় সংবাদ মূল নির্ধারণকারী উপাদানসমূহ আছে কি না, তা বিবেচনা করতে হয়। Gerald Lanson এবং Mithchell Stephens (১৯৯৪)-এর মতে সংবাদ মূল্য নির্ধারণের জন্য ১১টি উপাদান বিবেচনা করা উচিত :

ক. তাৎক্ষণিকতা/নতুনত্ব : যে ঘটনাটি নিয়ে রিপোর্ট করা হবে সেটি নতুন কি না বা তাৎক্ষণিক কি না, তা বিবেচনা করতে হবে। পুরোনো ঘটনা হলে এর নতুন দিক

www.pathagar.com

উন্মোচিত হচ্ছে কি না তা দেখতে হবে। যে বিষয় ইতোমধ্যেই প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়েছে সে বিষয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ থাকে না।

খ. ঘটনার প্রভাব/গুরুত্ব : ঘটনার প্রাপ্তি কতটুক হবে এবং ঘটনাটি একটি বড় সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করবে কি না তা বিবেচনা করা উচিত।

গ. বিতর্ক : যুক্তি, তর্ক, দ্বন্দ্ব, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের ঘটনা মানুষের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে। তাই যে বিষয়ে বিতর্ক হতে পারে সেটির সংবাদ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

ঘ. ওজন বা মূল্য : প্রতিদিন হাজারো ঘটনা ঘটে। সব সংবাদ হয় না। যে সকল ঘটনার আকার ও মূল্য অন্যান্য ঘটনার চেয়ে বেশি সেগুলো সংবাদ হয়।

ঙ. আবেগ বা মানুষের আগ্রহ : যেসব বিষয় মানুষের আবেগকে স্পর্শ করে, সেসব বিষয় সম্পর্কে মানুষ জানতে আগ্রহী হয়।

চ. অস্বাভাবিকতা : অস্বাভাবিক ঘটনার প্রতি মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ অনেক বেশি থাকে।

ছ. খ্যাতি : খ্যাতিমান মানুষ বা প্রসিদ্ধ স্থান মানুষের কাছে প্রাধান্য প্রায় তাই এসংক্রান্ত কোনো ঘটনা সংবাদ হতে পারে।

ঝ. নৈকট্য : কাছের ঘটনা মানুষকে দূরের ঘটনার চেয়ে বেশি আগ্রহী করে। নৈকট্য দুই ধরনের হয়। ভৌগোলিক নৈকট্য ও মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্য। ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে স্থানীয় সংবাদের গুরুত্ব বেশি। আবার দূরের ঘটনার প্রতিও মানুষের আগ্রহ জন্মে, যদি মানুষ ঐ ঘটনাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে কাছের মনে করে। যেমন–লন্ডনে কোনো বাঙালির মৃত্যুর ঘটনা আমাদের গণমাধ্যমে সংবাদ হতে পারে মনস্তাত্ত্বিক নৈকট্যের কারণে।

জ. চলমানতা : বর্তমানে মানুষ কী বিষয়ে ভাবছে তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে, কারণ চলমান বিষয়ে মানুষ জানতে চায়।

ঞ. কার্যকারিতা : যেসব তথ্য মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রশ্ন ও কৌতূহলের জবাব দেয়, সেগুলো জানতে মানুষ আগ্রহী হয়।

ট. শিক্ষামূল্য : যেসব তথ্য বা ঘটনা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, সে বিষয়ে পড়তে মানুষ আগ্রহী হয়।

কোনো ঘটনায় উপরোক্ত কোনো একটি উপাদান, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক মানুষের আগ্রহের কারণ হতে পারে; থাকলেই সাংবাদিক ওই ঘটনাটি রিপোর্ট করার জন্য তৎপর হবেন। উপাদানের সংখ্যা যত বেশি হয়, ঘটনার সংবাদগুরুত্ব তত বাড়ে এবং সংবাদটি বড় আকারে পরিবেশিত হয়।

সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিককে প্রতিটি সমাজে বা রাষ্ট্রে কতগুলো নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। বাংলাদেশেও সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের একটি আচরণবিধি (Code of Conduct) আছে, যা ১৯৯৩ সালে প্রথম তৈরি করা হয় এবং ২০০২ সালে সংশোধন করা হয়। তবে সম্প্রচার সাংবাদিকদের জন্য এখনও কোনো আচরণবিধি নেই। প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর অধীনে সংবাদপত্র সাংবাদিকদের এই আচরণবিধি তৈরি করা হয়েছে। এই আচরণবিধিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে :

www.pathagar.com

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি, এ ধরনের কোনো সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

খ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি কোনো সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

গ. তথ্য জানানোর ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে।

ঘ. তথ্যের সত্যতা ও সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সংবাদ উপস্থাপন করতে হবে।

ঙ. নির্ভরযোগ্য সূত্রের উপর ভিত্তি করে জনস্বার্থে সংবাদ প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

চ. গুজবের উপর ভিত্তি করে কোনো সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

ছ. বিকৃত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ করা যাবে না।

জ. বিতর্কিত বিষয়ে সংবাদ লেখা ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাংবাদিককে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তাকে সত্যিকারের তথ্য স্পষ্ট ও অবিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে।

ঝ. কারও প্রতি অবমাননাকর বা অমর্যাদাকর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যাবে না। কোনো বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এলে এটিও প্রকাশ করতে হবে।

ঞ. কোনো ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও জাতীয়তার প্রতি অবমাননাকর বা অসম্মানজনক সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

ট. কোনো সংবাদে কারও সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করা হলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, সংশোধনী দিতে হবে এবং প্রয়োজনে সংবাদটি প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

ঠ. কোনো অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ বা বীভৎস খবর বা ছবি প্রকাশ করা যাবে না।

ড. সংবাদপত্র অপরাধ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

ঢ. সাংবাদিককে তার উৎস/সোর্সের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য ও প্রমাণ সংরক্ষণ করতে হবে।

ণ. কোনো চলমান বিচারকার্য সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে, যাতে প্রতিবেদনের দ্বারা বিচার প্রভাবিত না হয়।

ত. অন্য কোনো সংবাদপত্রে বা কোথাও একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন ও রুচি বিবর্জিত সংবাদ ছাপা হলে এবং তার সম্পর্কে কোনো অভিযোগ না আনা হলে পরবর্তীতে সেটিকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা বা সেটি পুনঃপ্রকাশ করা যাবে না।

থ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সংক্রান্ত খবর গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। নারী, শিশু এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

www.pathagar.com

কোনো ব্যক্তি সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করতে চাইলে সে তার সম্পাদকের সামনে সংবাদিকতার নীতিমালা মেনে সাংবাদিকতা করার শপথ গ্রহণ করবেন এবং প্রেস কাউন্সিলের 'ক' চিহ্নিত ফরমে এই মর্মে স্বাক্ষর করবেন। প্রত্যেক প্রকাশককেও নীতিমালা মেনে চলার শপথ করতে হবে এবং একটি 'খ' চিহ্নিত ফরমে এই মর্মে স্বাক্ষর করতে হবে।

এই আচরণবিধিতে মানুষের একান্ততা (Privacy) রক্ষার বিষয়টিও যুক্ত হওয়া উচিত। উপরোক্ত আচরণ বিধিমালা মেনে চলার পাশাপাশি একজন সম্প্রচার সাংবাদিক বিশেষ করে টেলিভিশন সাংবাদিককে আরও কিছু নির্দেশনা মাথায় রেখে কাজ করতে হয়। কারণ টেলিভিশন সংবাদপত্রের চাইতে অনেক বেশি প্রভাব বিস্তারকারী গণমাধ্যম। টেলিভিশনে ত্রুটিপূর্ণ সাংবাদিকতা সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি সাংবাদিকের নিজের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

একজন টেলিভিশন সাংবাদিককে নিম্নোক্ত নৈতিকতাসংক্রান্ত বিষয়গুলোও মাথায় রাখতে হয় (White and Barnas, 2010)।

ক. মিথ্যা আলো (False light) : ভিডিও এবং অডিও যথার্থভাবে উপস্থাপিত না হলে কোনো ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে একটি ভুল মনোভাব তৈরি হয়। এই ধরনের ভুল মনোভাব তৈরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

খ. সীমানা নির্ধারণ : একজন রিপোর্টার তথ্যসংগ্রহের জন্য কতটা ঝুঁকি নেবেন? তিনি কি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তথ্যসংগ্রহ করবেন বা তথ্যসংগ্রহের জন্য ভুল পরিচয় দিয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ঢুকবেন? এই সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তাকে ভাবতে হবে এই বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ কি না? এই তথ্য জনস্বার্থে অত্যন্ত জরুরি কি না? কারণ মিথ্যা পরিচয়ে তথ্য জানতে চাইলে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে ভুল পরিচয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ধরা পড়লে সাংবাদিকের নিজের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং সাংবাদিকতা পেশার ব্যাপারে মানুষের বিরূপ ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পাদকের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি। সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে তিনি গুপ্তচর নন।

গ. গোপন ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন ব্যবহার : সাংবাদিক তথ্যসংগ্রহের জন্য গোপন ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন ব্যবহার করবে কি না এটি নির্ধারণ করতে গেলে তাকে ভাবতে হবে স্বাভাবিকভাবে তথ্যসংগ্রহের পথ রুদ্ধ কি না এবং এই তথ্য জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় কি না। যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং জনস্বার্থে তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে গোপন ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার আগে সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। কারণ এর সঙ্গেও পেশার সুনামের বিষয়টি জড়িত।

ঘ. অ্যাম্বুশ ইন্টারভিউ (Ambush interview) : এই ধরনের সাক্ষাৎকার হচ্ছে সাক্ষাৎকারদাতাকে আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ করে কোনো জায়গায় তার সামনে ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করা। এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এই ধরনের সাক্ষাৎকারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কোনো উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে বারবার চেষ্টা করেও কোনো সাক্ষাৎকারদাতার কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের সময় না পেলে সংবাদের প্রয়োজনে ও জনস্বার্থে এই ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ঙ. উপহার গ্রহণ : কোনো সংগঠন থেকে উপহার গ্রহণ করলে ঐ সংগঠন সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে প্রতিবেদন করা কঠিন। তাই সংবাদসংশ্লিষ্ট কারও কাছ থেকে উপহার গ্রহণ না করাই উচিত।

চ. স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব (Conflict of interest) : এই ধরনের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়, যখন একজন সাংবাদিক যাদের বিষয়ে প্রতিবেদন করবেন, তাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা নেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সুযোগ-সুবিধা নিলে সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে প্রতিবেদন রচনা করা কঠিন। যেমন, একজন প্রতিবেদক একটি উন্নত জাতের বীজের ফলনের উপর প্রতিবেদন রচনার জন্য যদি বীজ সরবরাহকারী কোম্পানির যাতায়াত সুবিধা ও সেবা নেন তখন এই ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই ধরনের দ্বন্দ্বের অবকাশ না রাখাই উচিত।

ছ. পুনর্সংগঠন (Reenactment) ও মঞ্চায়ন (Staging) : কোনো প্রতিবেদক অ্যাসাইনমেন্টে কাভার করতে যথাসময়ে না এসে যদি সংবাদ সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করে বিষয়টি আবার বলার জন্য তখন তাকে পুনর্সংগঠন বলে। আর একজন ক্যামেরাপার্সন যখন কোনো বিষয়ে লোক জড়ো করে শট নেয়, তখন তাকে মঞ্চায়ন বলে। এই দুধরনের কাজই নৈতিকতা বিরোধী, কারণ এগুলো প্রকৃত ঘটনা নয়, সাজানো।

জ. অবাস্তব শব্দ (Unnatural sound) : কখনও ক্যামেরা অডিও ধারণ করতে ব্যর্থ হলে, পরে শব্দ যোগ করাকে অবাস্তব শব্দ বলা হয়। এটিও নৈতিক দিক থেকে ঠিক নয়, কারণ এটি সত্যি নয়।

ট. ভিডিও প্রতারণা (Video deception) : কখনও সংবাদে কোনো ঘটনার নতুন ছবি বা ফুটেজ না থাকার কারণে পুরোনো বা ফাইল ফুটেজ ব্যবহার করা এক ধরনের প্রতারণা। তাই এসব ক্ষেত্রে 'ফাইল ফুটেজ' শব্দটি উল্লেখ করতে হবে।

ঠ. অযথার্থ সম্পাদনা (Improper editing) : ভিডিও সম্পাদনার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কারও বক্তব্যের অর্থ বদলে না যায়। বিশেষ করে সাউন্ড বাইট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক থাকা দরকার।

ড. জাম্প কাট : সংবাদে জাম্প কাট ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এই ধরনের কাট এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি করে যা সংবাদটিকে অস্বাভাবিক ও বাস্তবতা বিবর্জিতভাবে উপস্থাপন করতে পারে। তাই এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে সাবলীলভাবে যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য জাম্প কাট ব্যবহার না করা উচিত।

ঢ. সংবাদ স্ফীতকরণ (Inflating the news) : ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল পরিবর্তন করে কোনো ঘটনার মাত্রা বাড়ানো/কমানো যায়। যেমন, ক্লোজ আপ শট বা ওয়াইড শটের মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। এই ধরনের পদ্ধতির প্রয়োগ করে কোনো বিষয়ের গুরুত্ব কমিয়ে বা বাড়িয়ে সংবাদ প্রচার করলে দর্শক-শ্রোতার সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা করা হয়।

আচরণবিধি ও নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখে সংবাদসংগ্রহ লেখা ও উপস্থাপন করা সাংবাদিকের নিজের জন্য ও সমাজের জন্য মঙ্গলজনক।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের জন্য সংবাদ লেখার ও টেলিভিশনের জন্য স্ক্রিপ্ট লেখার নানা ধরনের কাঠামো আছে (১২ অধ্যায় দেখুন)। নির্দিষ্ট কাঠামোয় লিখিত সংবাদটি সংবাদপত্রের পাতায় স্থান পায় বা সম্প্রচার মাধ্যমে সংবাদ বুলেটিনের অংশ হিসেবে পঠিত হয়।

কেন এই বই?

কৃষি এখনও বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ হলেও কৃষি বিষয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ ও পর্যালোচনা অনেক কম। কৃষি সাংবাদিকতা বিষয়ে জ্ঞানের অভাব ও দক্ষ কৃষি সাংবাদিকের অভাবই এজন্য দায়ী। কৃষি সাংবাদিকতা পড়ানোর বইয়েরও অভাব রয়েছে। এই বইটিই একমাত্র বই, যা থেকে কৃষি সাংবাদিকতার বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা পাওয়া সম্ভব। এই বইটিতে কৃষি সাংবাদিকতার পাশাপাশি মুদ্রণ ও সম্প্রচার সাংবাদিকতার মূল বিষয়গুলোর উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তাই কৃষি সাংবাদিকদের, বিশেষ করে নতুন সাংবাদিকদের, সাংবাদিকতা শেখার ক্ষেত্রে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বইয়ের কাঠামো

এই বই দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আর দ্বিতীয় অংশে সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বইটিতে কৃষির গুরুত্ব ও কৃষিখাতসমূহ (অধ্যায় ১), কৃষিপ্রযুক্তি (অধ্যায় ২), জিএম প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্য (অধ্যায় ৩), কৃষিতে এনজিওর ভূমিকা (অধ্যায় ৪), কৃষিতে নারীশ্রম (অধ্যায় ৫), কৃষি বাণিজ্য (অধ্যায় ৬), কৃষিতে মেধাস্বত্ব (অধ্যায় ৭), কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (অধ্যায় ৮), কৃষিনীতির পর্যালোচনা (অধ্যায় ৯), কৃষি সংবাদের উৎস ও ধরন (অধ্যায় ১০), কৃষি প্রতিবেদনের ধরন (অধ্যায় ১১), কৃষি বিষয়ে সম্প্রচার প্রতিবেদন রচনার কাঠামো (অধ্যায় ১২) এবং সাক্ষাৎকার (অধ্যায় ১৩) বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষির ব্যাপ্তি আগের চেয়ে অনেক বিস্তৃত। জাহাঙ্গীর আলম ও অন্যরা কৃষির বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন কৃষিখাতসমূহের সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের কৃষিতে প্রথাগত ও আধুনিক দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। জাহাঙ্গীর আলম ও প্রয়াস রায় কৃষিতে প্রথাগত এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার 'কৃষিপ্রযুক্তি' অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। জিন রূপান্তরিত খাদ্যশস্য এখন সর্বাধিক আলোচিত। প্রয়াস রায় তার 'জিএম প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্য' অধ্যায়ে জিন রূপান্তরের পদ্ধতি, তার প্রচলন ও কৃষিতে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কয়েক বছর ধরেই বেশকিছু এনজিও বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে অন্যতম অংশীদার হিসেবে কাজ করছে। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। মো. রেজাউল হক এনজিওর ধরন ও কৃষিতে তাদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছেন। বাংলাদেশের কৃষিতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তাদের শ্রম সমাজে যথার্থভাবে মূল্যায়িত হয় না। ফাহমিদুল হক এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের কৃষিপণ্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করে। বিভিন্ন বাজারের বিষয়টি উঠে এসেছে মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়ার অধ্যায়ে। মেধাস্বত্ব বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রেও মেধাস্বত্বের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্ব মেধাস্বত্ব সংস্থায় কৃষিতে মেধাস্বত্ব নিয়ে সদস্য

www.pathagar.com

রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা, পর্যালোচনা, তক-বিতর্ক প্রায়শই হয়। মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া কৃষিতে মেধাস্বত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেছেন। বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব একটি উদ্বেগের বিষয়। জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা প্রতীয়মান। রিয়াজ আহমদ জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিতে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। কৃষিকে আধুনিক করা ও কৃষি নিয়ে সরকার বিভিন্ন ধরনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সর্বশেষ কৃষিনীতি করা হয়েছে ২০১৩ সালে। সাজিয়া আফরিন কৃষিনীতির বিশ্লেষণের পাশাপাশি কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য আইনগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কৃষিবিষয়ক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার পাশাপাশি কীভাবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ও ফিচার লিখতে হবে এবং কীভাবে সম্প্রচার মাধ্যমের, বিশেষ করে টেলিভিশনের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে, তা জানতে হয় একজন কৃষি সাংবাদিককে। তাই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, প্রতিবেদন ও স্ক্রিপ্ট লেখার কাঠামো ও সাক্ষাৎকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষি সংবাদের ধরন ও উৎস নিয়ে আলোচনা করেছেন অজয় দাশগুপ্ত, মীর মাসরুর জামান ও মীর সাহিদুল আলম। মীর মাসরুর জামান ও রিয়াজ আহমদ আলোচনা করেছেন বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন নিয়ে আর আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া ও অন্যরা প্রতিবেদনের কাঠামো, টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট লেখার কৌশল ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিবদেন বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে ইতোমধ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত কয়েকটি প্রতিবেদনের সবল ও দুর্বল দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বইটিতে সাক্ষাতকার নিয়ে আলোচনা করেছেন শাহনাজ মুন্নী ও মীর মাসরুর জামান। এই গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন প্রধান ফসলের বিভিন্ন রোগ, তার লক্ষণ ও প্রতিকারসংক্রান্ত তথ্য।

তথ্যসূত্র

Lanson, G. and Stephens, M. (1994).*Writing and Reporting The News*. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Ministry of Agriculture.(2013). National Agriculture Policy 2013. Dhaka: Government of the People's Republic of Bangladesh.

White, T. and Barnas, F. (2010). *Broadcast News Writing, Reporting and Producing (Fifth Ed.)* New York: Focal Press.

www.pathagar.com

প্রথম অংশ

কৃষি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১. কৃষি ও কৃষিখাতসমূহ

মো. জাহাঙ্গীর আলম, মীর মাসরুর জামান ও
মীর সাহিদুল আলম

বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনীতিতেই কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সমগ্র জনসাধারণের জন্য খাদ্যের সংস্থান করে কৃষি। আবার অনেক শিল্পের সঙ্গেও কৃষির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কোনো উন্নয়নশীল দেশকে সামাজিকভাবে স্থিতিশীল বলে ধরা হয়, যদি সে দেশের কৃষির ভিত শক্তিশালী হয়।

নিরাপদ খাদ্যের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তা একটি দেশের অর্থনীতির আবশ্যিক উপাদানগুলোর অন্যতম। স্থিতিশীল কৃষি ও কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পই প্রধানত খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করে। একটি দেশের প্রকৃত অগ্রগতির জন্য জনসাধারণের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যা কৃষিই পূরণ করে। অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি এখনও যেকোনো সেক্টরের তুলনায় একটা বড় অবদান রাখছে। মোটকথা কৃষির গুরুত্ব সার্বজনীন ও চিরন্তন।

কৃষিকে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ বলে মানা হয়। আর ভবিষ্যতেও এর গুরুত্ব বজায় থাকবে। দেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং তারা সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উৎপাদনশীল ব্যক্তিখাত। খাদ্যনিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা এখনও সবচেয়ে, বেশি।

আশির দশকের পর থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এসব পরিবর্তনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে সুগভীর গবেষণা ও আলোচনা তেমন হয়নি। গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের উদ্যোগে এসব বিষয় নিয়ে যে আলোচনা হয়, তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মূলত কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং ভোক্তাস্বার্থ। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক বা উৎপাদকের স্বার্থ এক্ষেত্রে তেমন মনোযোগ পায় না, যেমনটা পাওয়া দরকার।

www.pathagar.com

গ্রামীণ অর্থনীতি এখন অনেক বৈচিত্র্যময় এবং গতিশীল। কৃষিতে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক পুঁজির জোগান বেড়েছে। কৃষিতে বড় মাপের বিনিয়োগ বাড়ার কারণে বাণিজ্যিক কৃষি-উৎপাদন ব্যাপকতা লাভ করা শুরু করেছে। আবার কৃষিজমির মালিকানার ক্ষেত্রেও দ্রুততর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, সম্পদশালীদের হাতে জমির মালিকানা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। আর এই প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা জমির মালিকানা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। বহু কৃষক পরিণত হচ্ছে দিনমজুরে বা বর্গাচাষিতে। এখনকার মূল বাস্তবতা হলো, যারা জমির মালিক তারা কৃষক না আর যারা কৃষক তারা জমির মালিক না (মুক্তা, ২০১০)।

বহু কৃষক এখন শহুরে জমির মালিককে জমির ভাড়া দিয়ে চাষাবাদের অধিকার অর্জন করে এবং নিজে চলতি পুঁজির জোগাড় করে। চলতি পুঁজির উৎস এখনও অনেকক্ষেত্রে মহাজনি ঋণ। কৃষি-উৎপাদনের পর্যায়সমূহ (ভ্যালু চেইন) এখন সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত। চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনসহ কৃষিতে কর্পোরেট উপস্থিতি আজ স্পষ্ট দৃশ্যমান। অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও সুপার মার্কেটের উত্থান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন কৃষি ও গ্রামীণ জীবনকে দিচ্ছে আলাদা গতি।

বাংলাদেশের কৃষি এখন গর্ব করার মতো অনেক কিছু অর্জন করেছে, আর নিবেদিত কৃষক এবং কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, গবেষক, সম্প্রসারণবিদসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নিরলস পরিশ্রমই এনে দিয়েছে এসব সাফল্য। একদিকে উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্যের জোগান দিয়ে, অন্যদিকে উদ্বৃত্ত জনশক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাজার থেকে খাদ্য কেনার সামর্থ্য বাড়িয়ে বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে কৃষি। কিন্তু আশির দশকে, যখন কৃষিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সক্রিয় ও অগ্রণী ভূমিকা সবচেয়ে বেশি জরুরি ছিল, তখন কৃষির প্রতি এক ধরনের অবহেলা শুরু হয়। কাঠামোগত সমন্বয়নীতির মাধ্যমে কৃষি থেকে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুটিয়ে ফেলার রাজনৈতিক নির্দেশনা ও অর্থনৈতিক শর্তারোপ করা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, সব দেশে খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজন নেই, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমেই খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। কিন্তু বিভিন্নভাবে খাদ্যপণ্যের মূল্য বাড়ার সময় বাংলাদেশের মতো খাদ্য আমদানিকারক দেশগুলো আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চেয়েও খাদ্য কিনতে পারেনি। সুতরাং কেবল বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে খাদ্যনিরাপত্তা আশা করা সম্ভব নয় (মুক্তা, ২০১০, পৃ. ৯)।

'শিল্পায়ন'-এ মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে গিয়ে কৃষিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকুচিত করে ফেলা হয়। অথচ এখনও শিল্পায়নের জন্য অপরিহার্য মৌলিক উপাদানগুলোর উপস্থিতি এখানে নিশ্চিত হয়নি। বস্তুত এধরনের একটি আরোপিত উন্নয়ননীতি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি ছিল যৎসামান্য। বিশ্বায়নের যুগে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের মাধ্যমে খাদ্যনিরাপত্তার আশা যদিও কঠিন, তবু পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব না হলেও দেশে মৌলিক খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক জোর দিতে হবে। এও মনে রাখা জরুরি, দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলেই সকল নাগরিকের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না। নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা ও বণ্টন এখানে খুব জরুরি বিষয়। ফলে দেশে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ও কৃষিনির্ভর শিল্পে কর্মসংস্থান এবং কৃষি থেকে কৃষকের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের

www.pathagar.com

খাদ্যনিরাপত্তা বিধানে কৃষির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। অকৃষি পেশায় নিয়োজিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ার কারণে তাদের আয় বৃদ্ধিও এখন জরুরি।

তবে নব্বইয়ের দশকে এসে অবস্থাটির পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা নতুন প্রাণসঞ্চার করে দেশের কৃষিতে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বলা যায়, বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৪-২০১৫ আর্থিক বছরে বাংলাদেশ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল শ্রীলংকায় রফতানি করেছে (সায়েম, ১৪২২)।

এই প্রবন্ধে আমরা কৃষির সামগ্রিক চিত্র, খাত, উপখাতসমূহ এবং এদের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনা করব।

বাংলাদেশের কৃষির সামগ্রিক চিত্র

দেশে মোট পরিবার ২ কোটি ৮৬ লাখ ৯৫ হাজার ৭৬৩। কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১ কোটি ৫১ লাখ ৮৩ হাজার ১৮৩ আর কৃষি-বহির্ভূত পরিবার ১ কোটি ৩৫ লাখ ১২ হাজার ৫৮০ (মোট পরিবারের ৪৬.৪৩%)। বাংলাদেশে গ্রামে বাস করে প্রায় ৭৪.৫০% মানুষ। আর শহরে বাস করে ২৫.৫০ ভাগ। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫১ (২০১৪-১৫) (বিবিএস, ২০০৮)।

কৃষি একমাত্র খাত, যেখানে এককভাবে সবচেয়ে বেশি মানুষ সংশ্লিষ্ট। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৫ বছরের উপরের জনসংখ্যার ৪৫.১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। একই জরিপ অনুসারে বাংলাদেশের পুরুষ শ্রমশক্তির ৪১.৭ শতাংশ ও নারী শ্রমশক্তির ৫৩.৫ শতাংশ কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত (BBS, 2015)। কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধির হার ৩.০৪%, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৫.৯৬ শতাংশ কৃষির অবদান (এআইএস, ২০১৬)। তবে কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্যের হিসাব ধরলে জিডিপির প্রায় ৪৫ শতাংশ কৃষি থেকে আসে। আবার আরেকটি বিষয়ও এখানে বিবেচনার দাবি রাখে। যেমন, একজন কৃষক তার জমি বিক্রয় করে সেই টাকা দিয়ে ছেলেকে বিদেশে পাঠায়। ছেলেটি বিদেশ থেকে যে টাকা পাঠায় সেটি মূলত কৃষিজমিরই টাকা। আবার ঐ টাকা মূলত কৃষির উৎপাদনখাতেই পুনঃব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রেও কৃষি তথা কৃষকের অবদান রয়েছে।

কর্মক্ষম জনগণের সিংহভাগ কৃষিতে নিয়োজিত থাকলেও অকৃষিখাতে শ্রম বাড়ছে; যেসব কৃষি-পরিবারে অকৃষিখাতের কোনো আয় যোগ হচ্ছে না, সেসব পরিবার কৃষিকাজ থেকে ছিটকে পড়ছে। বহুক্ষেত্রে নিরুপায় হয়েই কৃষককে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে কৃষিতে। অন্যদিকে প্রতিবছর ১% হারে মানে ২২২ হেক্টর আবাদি কৃষিজমি নষ্ট হয়ে অনাবাদি অকৃষিখাতে চলে যায়; মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৬৬ হেক্টর, ২০২০ সালে এটা দাঁড়াবে ০.০৫৩ হেক্টরে (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

জাতীয় পরিসরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রে কৃষির ভূমিকা সবার জানা। কৃষির বিকাশের মাধ্যমেই সর্বত্র শিল্প ও সেবাখাত বিকশিত হয়েছে, সেজন্যই সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ কৃষিতে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষায়

www.pathagar.com

কৃষির ভূমিকা মুখ্য। কৃষিতে সঠিক উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও কৌশলের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে উদ্ভিদ, প্রাণবৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণে কৃষি সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখতে পারে।

কৃষি, কৃষিভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর শিল্প ও বাণিজ্য এখন পর্যন্ত কর্মসংস্থানের বৃহত্তম ক্ষেত্র। তাই দারিদ্র্য কমাতে কৃষির ভূমিকা সর্বাধিক। জাতীয়ভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রে কৃষির ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কৃষির বিকাশের মাধ্যমেই সর্বত্র শিল্প ও সেবাখাত বিকশিত হয়েছে, সেজন্যই সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ কৃষিতে সর্বাধিক জোর দিয়ে থাকে।

কৃষিখাত ও উপখাতসমূহ

কৃষি শুধু এ দেশের অর্থনীতি নয়, সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর সংস্কৃতিগতভাবেও এর নানা রূপ, নানা খাত-উপখাত দেখা যায়, যেমন–মাঠের কৃষি, আঙিনার কৃষি, ঘরের কৃষি, অন্দরের কৃষি, জলজ কৃষি, ফল-ফুল, ভেষজ, মসলা, মাছ, প্রাণিসম্পদ, পাখি, পরিবেশ ও বন, পুষ্টিকৃষি, আহরণোত্তর কৃষি, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি বিপণন ইত্যাদি।

সাধারণভাবে কৃষি বলতে ফসল কৃষি বা মাঠ ফসল কৃষিকে বোঝানো হলেও আমাদের দেশে কৃষির পরিধি ব্যাপক। এর মধ্যে রয়েছে–

ক. ফসল বা শস্য খ. প্রাণিসম্পদ গ. মৎস্যসম্পদ ঘ. অন্যান্য

বাংলাদেশে কৃষিজমির পরিমাণ কম, ফসলের নিবিড়তা বেশি। নিচের টেবিলে কৃষিজমির ব্যবহার দেখানো হলো :

জমির ধরন	জমির পরিমাণ
কৃষি এলাকা	১ কোটি ৪৮ লাখ ৪৬ হাজার হেক্টর
আবাদযোগ্য জমি	৮৫,০৫, ২৭৮.১৪ হেক্টর
আবাদযোগ্য পতিত জমি	২,০৪,৩৬৬.২৪ হেক্টর
সেচকৃত জমি	৭১,২৪,৮৯৫.৪১ হেক্টর
একফসলি জমি	২৪,৪০,৬৫৯.১০ হেক্টর
দুইফসলি জমি	৩৮,২০,৬৩৭.১৪ হেক্টর
তিনফসলি জমির পরিমাণ	১৬,৩৭,৭৬২.৭৯ হেক্টর
নিট ফসলি জমি	৭৯,০৮,৭৭১.৫০ হেক্টর
মোট ফসলি জমি হলো	১,৫০,৩৪,০৭১.৬০ হেক্টর

এআইএস, ২০১৬, পৃ. ২ অবলম্বনে তৈরি

www.pathagar.com

ক. ফসল বা শস্য : খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূল, অর্থকরী ফসল। যেমন—পাট, ফুল, বৃক্ষ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৪-১৫ হিসাব অনুযায়ী খাদ্যশস্য উৎপাদন চাল ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪১৭ মেট্রিক টন, গম ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৬ মেট্রিক টন আর ভুট্টা ২১ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৭২ মেট্রিক টন। ফসল বা শস্যখাতই মূলত আমাদের কৃষির ভিত্তি। আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থা বা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিষয়টি নির্ধারিত হয় দানাদার শস্য যেমন—ধান, গম এগুলোর উপর ভিত্তি করে (এআইএস, ২০১৬)।

যে ধরনের শস্যই হোক উৎপাদনের গুণ ও পরিমাণ বাড়াতে বড় ভূমিকা বীজের। সরকারি পর্যায়ে বিএডিসি, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কৃষক বীজের জোগান দেয়। এ ছাড়া বিভিন্ন বীজ কোম্পানিও বীজ উৎপাদন বা আমদানি ও সরবরাহে নিয়োজিত রয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বীজের বড় জোগানদাতা কৃষক। শুধু মানসম্মত বীজ ব্যবহার করে ১৫%-২০% অতিরিক্ত ফলন নিশ্চিত করা যায়। মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নিয়ে যেতে পারলে কৃষি উৎপাদনে বিশাল অগ্রগতি আনা সম্ভব।

আধুনিক পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের পরিণামে মাটির জৈব ও রাসায়নিক পুষ্টি উপাদান দিন দিন কমে যাচ্ছে। একারণে আনুপাতিক হারে মাটির পুষ্টিচাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। রাসায়নিক ও জৈবসারের সমন্বয়ে সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়। অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য ১৯৫০-এর দশক থেকে রাসায়নিক সার বাংলাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইউরিয়া (নাইট্রোজেন), টিএসপি (ফসফরাস), এমওপি (পটাশিয়াম), সালফার, দস্তা, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, তামা ও ক্লোরিন ইত্যাদি সার এর মধ্যে অন্যতম। মনুষ্যসৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক কারণে মাটির গুণমানের হেরফের হচ্ছে; অঞ্চলভেদে এটা বিভিন্ন রকম। মাটির পুষ্টিচাহিদা ভবিষ্যতে বাড়তেই থাকবে। সুষম সার ব্যবহারের ধারণাটি এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে কৃষকদের উপলব্ধি করানো যায়নি। জৈবসারের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। অর্থাৎ মাটিকে উর্বর রেখে সর্বোচ্চ ফলন নিশ্চিত করা এখন বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ফসল উৎপাদন মূলত সেচনির্ভর। বিশেষ করে বোরো ধান উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি পানির প্রয়োজন হয়। সেচের জন্য ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা হয়। এ পর্যন্ত গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প, অন্যান্য পদ্ধতি এবং দেশীয় সব পদ্ধতির সমন্বয়ে অর্ধেকের মতো জমি সেচের আওতায় এসেছে। বাকি জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য আরও বেশি উদ্যোগ দরকার। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, ভূ-উপরিস্থ পর্যাপ্ত পানির সংস্থান নিশ্চিত না হওয়া, লবণাক্ততা, সেচ খরচ ইত্যাদি বিষয় সেচব্যবস্থায় বিভিন্নমুখী চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। সে কারণে ভূপৃষ্ঠের পানি দিয়ে বেশি পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

খ. প্রাণিসম্পদ : এ খাতে রয়েছে ডেইরি–গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া এবং পোলট্রি–হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েল ইত্যাদি। ২০১৪-২০১৫ সালে প্রাণিসম্পদের প্রবৃদ্ধির হার ৩.১০% (জিডিপিতে অবদান ২.৬৭%)। বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও সামগ্রিক কৃষিতে প্রাণিসম্পদের অবদান মাত্র ১৭.০৩% (এআইএস, ২০১৬, পৃ. ৩)। চামড়াজাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান ৪.৩১%। এ ছাড়া প্রতিবছর ১২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন জৈবসার উৎপাদিত হয় এ খাত থেকে। আবার গৃহস্থালি জ্বালানির ২৫% আসে এ খাত থেকে। বায়োপ্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে ২১৮০টি (এআইএস, ২০১৬, পৃ. ৩)।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ খাতের উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই অধিদপ্তরের কাজের মধ্যে রয়েছে গবাদি পশুপাখির চিকিৎসা; গবাদি পশুপাখির টিকা উৎপাদন ও বিতরণ; পোলট্রি খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাঁসমুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও বিতরণ; খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ; ডেইরি খামার ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন; ছাগল, ভেড়া, মহিষ, খরগোশ ও শূকর উন্নয়ন খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; গবেষণা; প্রাণিচিকিৎসা; প্রশিক্ষণ; চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রাণিজ আমিষের জোগানে আমাদের প্রাণিসম্পদ খাত এখনও অনুন্নত। জনপ্রতি ২৫০ দৈনিক মিলিলিটার চাহিদা হিসেবে দেশে দুধের চাহিদা ১৪.৪৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন আর আমরা উৎপাদন করতে পারছি ৬.৯৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অর্থাৎ জনপ্রতি জোগান হচ্ছে ১২২ মিলিলিটার। বিপুল ঘাটতির (৭.৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন) একটা অংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয় (এআইএস, ২০১৬, পৃ. ৩)। জনপ্রতি দৈনিক ১২০ গ্রাম হিসেবে মাংসের চাহিদা ৬.৯৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, উৎপাদন হচ্ছে ৫.৮৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন অর্থাৎ জনপ্রতি প্রাপ্যতা মাত্র ১০২.৬২ গ্রাম। মোট ঘাটতি ১.০৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। আর ডিমের ক্ষেত্রে চাহিদা ১৬৫০৪ মিলিয়ন, উৎপাদন হচ্ছে ১০৯৯৫.২০ মিলিয়ন। বছরে জনপ্রতি ১০৪টি ডিমের চাহিদার বিপরীতে পাওয়া যাচ্ছে ৭০.২৬টি। এখনও ডিমের ঘাটতি ৫৫০৯.৬০ মিলিয়ন (এআইএস, ২০১৬, পৃ. ৩)।

গ. মৎস্য : আমাদের দেশের মাছের জোগান তিনটি উৎস থেকে আসে। অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয় (খাল, বিল, নদীনালা, হাওর, হ্রদ ইত্যাদি), বদ্ধ জলাশয় (পুকুর-ডোবা) ও সমুদ্র। সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদন উৎসাহব্যাঞ্জক। জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান–জিএনপিতে মাছের মূল্য (২০০৯-১০ সনের তথ্যানুযায়ী) ১৯ হাজার ৫৬৮ কোটি টাকা। জিডিপিতে অবদান ৩.৬৯% এবং সামগ্রিক কৃষিখাতে অবদান ২২.৬০% (এআইএস, ২০১৬, পৃ. ৫)।

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ মৎস্যক্ষেত্র

জলাশয়ের ধরন		জলাশয়ের পরিমাণ
মোট বদ্ধ জলাশয়		৭, ৮৯, ৩৪১ হেক্টর
	পুকুর ও ডোবা	৩, ৭১, ৩০৯ হেক্টর
	অক্সবো লেক	৫ ,৪৮৮ হেক্টর
	চিংড়িখামার	২, ৭৫ , ২৭৪ হেক্টর
মুক্ত জলাশয়		৩৯, ১০,০৫৩ হেক্টর
	নদী ও মোহনা	৮,৫৩,৮৬৩ হেক্টর
	সুন্দরবন	১৭৭৭০০ হেক্টর
	বিল	১, ১৪,১৬১ হেক্টর
	কাপ্তাই লেক	৬৮,৮০০ হেক্টর
	প্লাবনভূমি	২৬, ৯৫,৫২৯ হেক্টর

এআইএস, ২০১৬, পৃ. ৫ অবলম্বনে তৈরি

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে ৭৭,৫৮৪.১২ মেট্রিক টন যার মূল্য ৩৪০৮.৫১ কোটি টাকা। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট রয়েছে ১৬২টি (লাইসেন্সকৃত ৭৫, ইইউ অনুমোদিত ৭৪)। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাতের অবদান ২.৭০%। দৈনিক জনপ্রতি মাছের চাহিদা ৬০ গ্রাম। মাথাপিছু বার্ষিক ২১.৯০ কেজি চাহিদা হিসেবে মাছের বার্ষিক প্রয়োজন ৩২.৭২ লাখ মেট্রিক টন। বার্ষিক জনপ্রতি মাছের প্রাপ্যতা ১৯.৩০ কেজি। অর্থাৎ ঘাটতি ৩.৭২ লাখ মেট্রিক টন। প্রাণিজ আমিষের ক্ষেত্রে মৎস্যখাতের অবদান ৬০% (এআইএস, ২০১৬, পৃ. ৫)।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাছের উপর নির্ভরশীল (BCAS, 2009)। বাংলাদেশের কোনো কোনো এলাকায় বাড়িঘরের পাশে ছোট পুকুরে নারী চাষিরা অল্পবিস্তর মাছ চাষ করেন, যা থেকে মূলত পরিবারের প্রয়োজন মেটানো হয়। নারীদের মাছ চাষের বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়। তারা মূলত পুকুর খনন বা চাষ শেষের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তবে ৫০ শতাংশ নারী প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্টে কাজ করেন।

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অ্যাকুয়াকালচার গত ২০ বছরে ১০ শতাংশ বেড়েছে বলেই দেখা যায় এবং বাংলাদেশে এই বৃদ্ধির হার ২৯ শতাংশ (BCAS, 2009)।

www.pathagar.com

এফএও'র ২০১৪ সালের হিসেব অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য আহরণ ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে (আজাদ, ২০১৫)।

দেশের মৎস্যখাতে নিয়োজিত রয়েছে বেশ অনেকগুলো শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব। রয়েছে ডিম সংগ্রহকারী, হ্যাচারি মালিক, নার্সারি মালিক, পোনা ব্যবসায়ী, মাছের খাবার প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী, মাছের ওষুধ প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী, ব্যবসায়ী, নিলামকারী এবং রপ্তানিকারক। একইসঙ্গে রয়েছে সহযোগী অন্যান্য সেবা সংস্থা যেমন মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৎস্য বিভাগ। মৎস্যচাষে ঋণের সুবিধাও রয়েছে।

মৎস্যখাতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষ এবং মূল্যশৃঙ্খল নিচের ছকে দেখানো হলো :

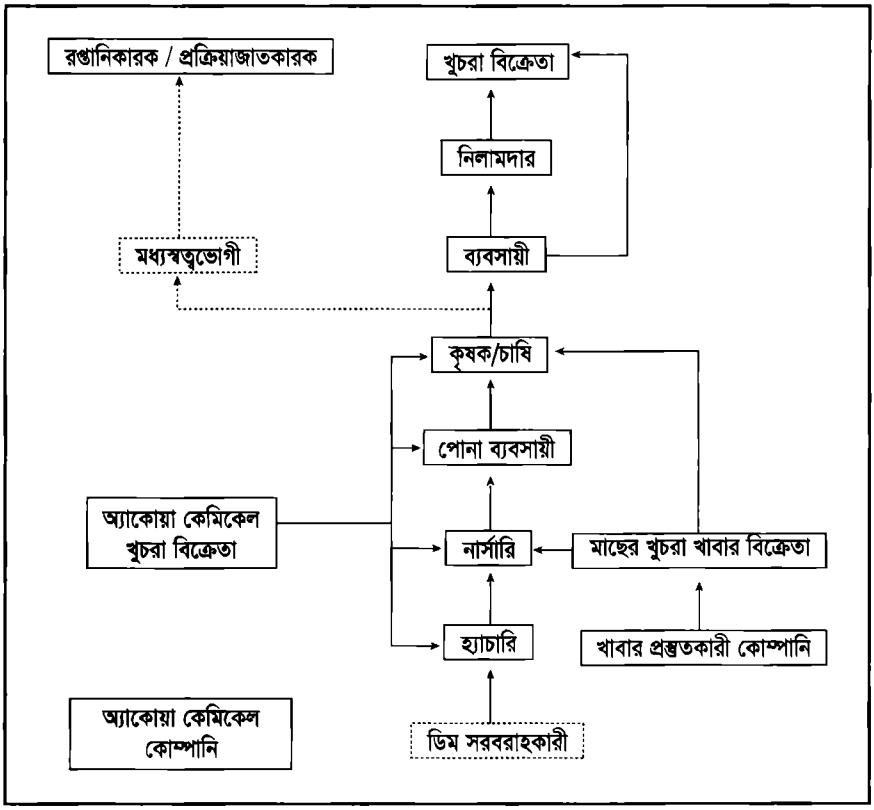

খাতের সাফল্য

মৎস্যচাষে বিনিয়োগের ফলাফল নির্ভর করে চাষের প্রযুক্তি, জাত ইত্যাদির উপর। বাংলাদেশে অসংখ্য পুকুর থাকায় সহজেই মাছচাষে বিনিয়োগ করা যায়। বিশ্লেষণে দেখা যায়, এক হেক্টরে এখানে লাভের পরিমাণ এক হাজার ১৪ মার্কিন ডলার থেকে এক হাজার চারশ মার্কিন ডলার। তাই ব্যাপক মাত্রায় এই ব্যবসায় লাভ খুবই বেশি (BCAS, 2009)।

www.pathagar.com

খাতের সমস্যাসমূহ

এই খাতে সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে মানসম্মত পোনা, মাছের খাদ্য, ওষুধসহ প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়াদির অভাব। আর একারণে এখানে যেমনটি লাভ হবার কথা তা হয় না। অনেক সময় হ্যাচারির মালিকরা দক্ষ কর্মীর অভাবে মানসম্মত পোনা দিতে ব্যর্থ হয়। অনেকক্ষেত্রেই খাবার সরবরাহকারীরা পর্যাপ্ত খাবার সরবরাহ করতে পারে না। কেননা তাদের উৎপাদন সক্ষমতা অনেক কম। একই সঙ্গে রয়েছে কাঁচামালের স্বল্পতা, জ্বালানির উচ্চমূল্যসহ নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের অভাব।

মাছচাষের নানা ওষুধ ও আনুষঙ্গিক রাসায়নিকের ব্যবহার নতুন হলেও চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে এগুলো ব্যবহারে সচেতনতার অভাবও রয়েছে। কেননা, বেশিরভাগ চাষি চুনাপাথর ব্যবহার করে অভ্যস্ত। অনেক সময় কোম্পানিগুলো চাহিদা বাড়াতে পণ্যের বিপণন করে না। কেননা এতে তাদের খরচ অনেক বেড়ে যায়। অবশ্য মাছের উন্নতমানের খাবারের যে বিদ্যমান আইন তা প্রয়োগ হয় না এবং সরকারেরও আইন প্রয়োগের সক্ষমতা বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে। উন্নতমানের খাবারের জন্য যে পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন, অনেক চাষিই তা করতে সমর্থ নয়।

অনেক চাষির তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তারা মাছচাষে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। তা ছাড়া ভুলভাবে চাষে যে কী ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাও অনেক চাষি জানেন না। তাদের তথ্যের উৎস হিসেবে সরকারের যে অবকাঠামো রয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত জনবল, অর্থ আর নানা সংকটে যথার্থ সেবা দিতে পারে না।

বেসরকারি সূত্র বা গণমাধ্যম থেকেও তারা পর্যাপ্ত সহযোগিতা পায় না। এ ছাড়া রয়েছে অর্থায়নের সুযোগের অভাব, রপ্তানির সঠিক চ্যানেলের অভাবসহ নানাবিধ সমস্যা। এই খাতে নারীরা অনেক বড় ভূমিকায় থাকলেও তাদের অবদান থাকে একেবারেই লোকচক্ষুর অন্তরালে। বিশেষ কর্মসূচির আওতায় তাদের লক্ষ করে কর্মকাণ্ড গৃহীত হলে তা একদিকে যেমন নারীদের ক্ষমতায়নে প্রভাব ফেলবে, একইসঙ্গে তা দারিদ্র্য দূরীকরণেও সহায়তা করবে।

যদিও চাষের জন্য ব্যবহার করা নানা ওষুধ ও রাসায়নিক কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না, তবে অনেক সময় কীটনাশক ব্যবহার করায় তা খাদ্যনিরাপত্তায় ঝুঁকি তৈরি করে। চাষিদের তথ্যের ঘাটতি দূর করা, তাদের সঠিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শ্রমিকদের জীবনমান নিশ্চিত করা হলে তা এইখাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

উপখাতসমূহ

ক. আলু

আলুখাত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির চাষিদের অর্থাৎ যাদের জমির পরিমাণ আড়াই একরের কম, তাদের আয় ব্যাপক ভিত্তিতে বাড়াতে সক্ষম। নানা জাতের আলু উৎপাদন করেও এ খাত থেকে প্রচুর আয় সম্ভব। এখানে যদি শক্তিশালী প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিমুখী শিল্প গড়ে ওঠে, তাহলে কৃষকরা উৎপাদনের আরও বেশি নিরাপদ বাজার পাবে। মূলত বাংলাদেশের আলুর বেশিরভাগ উৎপাদিত হয় দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। তবে এ খাতে বড়

www.pathagar.com

বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার পরিবহনসেবা তথা জাহাজে করে রপ্তানির বিষয়টি অনুন্নত ও খরচবহুল। একারণে আন্তর্জাতিক বাজারে আলুর দামে বাংলাদেশ অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে। যারা রপ্তানিকারক তাদের যথার্থ বাজার সংযোগও নেই। দাম ছাড়াও পণ্যের মান এবং ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের আলুকে আন্তর্জাতিক বাজারে পিছিয়ে রখেছে।

খ. চিংড়ি

দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে চিংড়িখাতের সম্ভাবনাময় চারটি বিশেষ দিক রয়েছে। প্রথমত, দেশের কিছু এলাকায় বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মাছচাষ ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ করার বা আয়ের উৎস থাকে না। বছরে একবার ধানচাষ করা গেলেও পুকুর বা ঘের থাকলে বছরের বাকি সময়টাতে তারা চিংড়ি বা অন্য মাছচাষ করতে পারে। আবার পুকুর বা ঘেরের পাশে তারা সবজিচাষও করতে পারে। দ্বিতীয়ত, চিংড়ি যেহেতু উচ্চমূল্যের চাষের পণ্য, চাষিরা এর থেকে অনেক বেশি লাভবান হতে পারে। তৃতীয়ত, স্বাদু পানির চিংড়ি ছোট পুকুর বা ঘেরে চাষ করাও সম্ভব। তবে চিংড়িচাষ শ্রমঘন। এর জন্য পরিচর্যা, খাবার দেওয়া, ঘেরের যত্ন নেওয়া এবং পানি পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। এতে করে দরিদ্র মানুষ এসব কাজের সুযোগ পায়।

খামার ব্যবস্থাপনায় নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বৃহত্তর যশোর ও খুলনায় দেখা যায় নারীরা খাবার দেওয়ার কাজটি করে থাকে। চাষপরবর্তী কর্মকাণ্ডেও নারীরা নিয়োজিত থাকে। তবে পরিবারের নারীরা যদি চাষিদের জন্য কাজ করে সেক্ষেত্রে দেখা যায় তার শ্রমের কোনো মূল্য পায় না। আয় কিংবা খামার পরিচালনার কাজেও তাদের মতামতের কোনো সুযোগ নেই। কিছু এলাকায় নারীরা চিংড়িচাষে অগ্রণী ভূমিকায় রাখলেও তাদের বাজারের সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তাই বর্তমানে বেসরকারি খাতে নারীদের লক্ষ করে সুনির্দিষ্ট সেবা যেমন কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আগ্রহ কম।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

এই খাতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রতিবছর চার শতাংশ হারে স্বাদু পানির চিংড়ির বাজার বাড়ছে। চিংড়ির শিল্পবাজার প্রায় ২ দশমিক ২৫ মিলিয়ন ডলারের যেখানে বাংলাদেশের অবদান মাত্র ৬ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রতিবছর বিশ্বে ১ দশমিক ১৫ শতাংশ করে চাহিদা বাড়ছে এবং এ খাতে বাংলাদেশের মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে (Katalyst, 2012)।

খাতওয়ারি চিত্র

এই খাতে বেশকিছু শ্রেণির মানুষ জড়িত যাদের মিথস্ক্রিয়া এবং নৈপুণ্যে ছোট চাষিসহ অনেকেই জীবিকা নির্ভর করছে। এদের মধ্যে রয়েছে পোনা সংগ্রহকারী, লার্ভা সংগ্রহকারী, হ্যাচারি, খাবার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, নার্সারি, পিএল ট্রেডার, চাষি, ডিপো, বরফ কারখানা, এজেন্ট, বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সংগঠন এবং সরকার। তবে উৎপাদন ও গড় লাভ বিবেচনায় আনলে দেখা যায়, আধুনিক চাষপদ্ধতি অনুসরণ করলে চাষিরা প্রায় চল্লিশ শতাংশ উৎপাদন বেশি করতে পারে, যা তাদের লাভের মাত্রা বাড়াতে সক্ষম। কিন্তু চিংড়িখাতে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে যার কারণে এই খাত যতটা ভালো করার কথা ছিল, তার

www.pathagar.com

চেয়ে অনেক কম সফলতা দেখাচ্ছে। প্রথমত, চাষিদের তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ যথার্থ উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং চাষপরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ জ্ঞানের অভাব রয়েছে চাষিদের মধ্যে। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হয় মৌখিকভাবে। আর সরকারি কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের চালসহ অন্যান্য কৃষিপণ্যের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হয়। তা ছাড়া গণমাধ্যমও সার্বিকভাবে এই বিষয়ে অতটা মনোযোগী নয়।

দ্বিতীয়ত চাষিদের মানসম্মত ইনপুট বা প্রয়োজনীয় খাবারের মতো বিষয়ে জানাশোনার অভাব আছে। চিংড়ির বিষয়ে কমপ্লায়েন্সও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। শ্রমিকদের বিষয়েও আমদানিকারক দেশগুলোর নানা বিধি রয়েছে। এক্ষেত্রে দুধরনের সমস্যা রয়েছে—সঠিক প্রক্রিয়ার বা মানের বিষয়ে তথ্যের অভাব এবং কিছু প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনীহা। পাশাপাশি রয়েছে রপ্তানি বাজারের বহুমুখীকরণ এবং অর্থায়নের অভাব।

পরিবেশের দিক বিবেচনায় আনলে স্বাদু পানির চিংড়িচাষ পরিবেশবান্ধব। তবে যারা হিমায়িত প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে নিয়োজিত, ক্রেতাদের কঠোর বিধি অনুযায়ী মান বজায় রেখে তাদের কাজ করতে হয় অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশে। এ কারণে তাদের নানা ধরনের রোগের শিকার হতে হয়। এ বিষয়টির দিকে মনোযোগী হলে শুধু শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নই নয়, তাদের উৎপাদনও বাড়বে।

গ. সবজি

সবজিখাতের উন্নয়ন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বিক্রি বাড়িয়ে তাদের আয় বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির চাষি অর্থাৎ যাদের আড়াই একরের কম পরিমাণ জমি রয়েছে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ কৃষক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজিচাষ করে থাকে। তাদের যদি বাজারে প্রবেশ এবং উৎপাদন ও লাভের পরিমাণ বাড়ানোর বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা যায় তাহলে আয় বহুগুণ বাড়তে পারে। চালের চেয়েও বেশি পরিমাণ লাভ নিয়ে আসতে পারে সবজি চাষ। বাংলাদেশে নানা জাতের সবজিচাষ হয় এবং ফলন ও লাভ বিবেচনা করলে শস্যজাতীয় উৎপাদনের চেয়ে সবজি উৎপাদনে বেশি লাভ। আর সবজির চাষও শ্রমঘন হওয়ায় দরিদ্ররা এর থেকে উপকৃত হতে পারে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ১২ শতাংশের বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে এ খাতে (বিবিএস, ২০০৮)। এদের মধ্যে নারী অন্তত দশ লাখ (বিবিএস, ২০০৫-২০০৬)। অবশ্য গ্রামাঞ্চলের বিপুলসংখ্যক নারী এখন বসতভিটার পাশে ছোট্ট জমিতে সবজিচাষ করে থাকেন।

নারীরা সবজিচাষে একটি বড় ভূমিকায় থাকেন, বিশেষত চাষ ফলনপরবর্তী সময়ে সবজি ধোয়া, পরিষ্কার করা, বিন্যস্ত করা ইত্যাদি। পুষ্টির একটি উৎস হিসেবে বাংলাদেশে সবজি খাওয়া হয় নির্ধারিত মাত্রার অনেক কম। অধিক উৎপাদন স্থানীয়ভাবে এর ভোগ বাড়াতে পারে।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

গত এক দশকে উৎপাদনের পাশাপাশি সবজির ব্যবহার বেড়েছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের জিডিপিতে সবজি খাতের অবদান ছিল প্রায় ৭১ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার। ৯ লাখ ৩৬ হাজার একর জমিতে সবজি উৎপাদিত হয়েছে ৩২ লাখ মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০১০)।

www.pathagar.com

২০০১ থেকে ২০১০ পর্যন্ত সময়ে সবজির উৎপাদন ৯ শতাংশ বেড়েছে এবং অনেক কৃষকই সবজিচাষে ঝুঁকছেন। তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ভালো বীজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য আনায় এবং সবজিচাষে লাভের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় কৃষকরা ব্যাপক মাত্রায় এর চাষে নিয়োজিত হচ্ছেন। তবে বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় উৎপাদন এখনও কম। তারপরও ৪৫টি দেশের বাজারে ক্রমবর্ধমান হারে বাংলাদেশের সবজি ও ফল যাচ্ছে এবং মূলত অনিবাসী বাংলাদেশিরা এসব সবজির বাজার হলেও বিদেশে সকল সাধারণ খুচরা বাজার বাংলাদেশের জন্য বিশাল সম্ভাবনা হিসেবে এখনও অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে।

খাতওয়ারি তথ্য

এই খাতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, আইপিএম ক্লাব, বীজসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, বীজ বিপণন ডিলার, বাংলাদেশ বীজ অ্যাসোসিয়েশন, রাসায়নিক কীটনাশক কোম্পানি ও এর ডিলার, খুচরা বিক্রেতা, সার কারখানা, রপ্তানিকারক কৃষক, বেপারি, ফড়িয়া, আড়তদার, বাজার, পাইকার, সুপারশপ, হোটেল রেস্টুরেন্টসহ অনেক শ্রেণির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। মূলত ফলনপরবর্তী সময়ে এক বিরাট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সবজি ক্রেতার কাছে যায়। তবে এই ফলনপরবর্তী প্রক্রিয়ায় নারীদের অনেক বড় অবদান থাকে।

সবজিখাতের সমস্যা

সবজিখাতে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে এবং এ কারণে এই খাতে উৎপাদন ও মুনাফা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কৃষকদের অনেকেরই লাভজনক চাষপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা নেই। তাদের চাষসংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। যেহেতু সবজিচাষে চাষপদ্ধতি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, এটা অনেক সময় চাষিদের সমস্যার কারণ হয়। সঠিক বীজ, ব্যবহার প্রণালি সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব, সমন্বিত কীটনাশক ব্যবহারে জ্ঞানের অভাব বড় বাধা হিসেবে কাজ করে।

তা ছাড়া নানা কারণে জমির উর্বরতা কমে গেছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টি কম হওয়াসহ নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এ ছাড়া দুর্বল বাজারসংযোগ ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ঘাটতি, বাজারবিষয়ক তথ্যের অভাব এবং বাজার গবেষণার অভাবও বড় কারণ হিসেবে প্রবৃদ্ধির অন্তরায়। তবে যথার্থ প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণব্যবস্থার অভাবে প্রতি বছর প্রচুর সবজি নষ্ট হয়। ফলনপরবর্তী সময়েই শতকরা ১৫ ভাগ সবজি নষ্ট হয়। প্রচুর নারী এই খাতে সংশ্লিষ্ট থাকায় চাষিদের লক্ষ করে এই খাতে যে কোনো উন্নয়ন নারীদের উপকারে আসতে পারে। পরিবেশের দিক বিবেচনায় নিলে কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার যদিও খারাপ প্রভাব ফেলছে। তবে যথার্থ জ্ঞান চাষিদের অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারে।

ঘ. সার

বর্তমানে বাংলাদেশে মাটির সার্বিক পরিস্থিতি বেশ দুর্বল। বেশিমাত্রায় চাষাবাদ, উচ্চ ফলনশীল ফসল এবং রাসায়নিক সারের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে মাটির উর্বরতা কমেছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ১৯৯৮ সালে এক গবেষণায় দেখেছে বাংলাদেশের মাটিতে জৈব উৎপাদন উদ্বেগজনকভাবে কম এবং এর মাত্রা

www.pathagar.com

মাত্র ১ শতাংশ। একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণভাবে যদি সারের ব্যবহার করা যায়, তবেই মাটির ক্ষয় রোধ করে উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে খামারগুলোতে ভর্তুকিতে পাওয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। মাটির উর্বরতা বাড়লে ফলন বাড়বে ও প্রবৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবেই বেগবান হবে। একইসঙ্গে কমে যাবে উৎপাদন খরচ। কিন্তু ভারসাম্য বজায় না রেখে সার ব্যবহারে লাভ যেমন কমে যায় তেমনি প্রবৃদ্ধির পথে এটি অন্তরায়। মূলত ক্ষুদ্র শ্রেণির চাষিরাই অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের ব্যবহারে ভারসাম্য আনতে যেসব আনুষঙ্গিক বিষয় যোগ করা দরকার হয়, তা তারা টাকার অভাবে করতে পারে না। সঠিক মাত্রার সার ব্যবহার সুসমন্বিত চাষের দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে জৈবসার তৈরিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

বাংলাদেশে ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ২৫ বছরে ইউরিয়া সারের ব্যবহার পাঁচ গুণ বেড়েছে। তবে গত এক দশকে সার ব্যবহরের মিশ্র চিত্র দেখা যায়। কম্পোস্ট বা জৈব সারের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারকারী বাড়লেও এ সংক্রান্ত সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে (Katalyst, 2012)।

খাতওয়ারি তথ্য

দেশে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাসায়নিক সার উৎপাদন ও বিতরণ হয়। আর জৈব সারের উৎপাদন ও বিতরণ হয় ব্যক্তিখাতে। সরকারিভাবে বাংলাদেশ কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন সারের উৎপাদনের বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে। উৎপাদন মৌসুমে কৃষকদের সারের চাহিদার বিষয়টি জানা হয় এবং এটা নির্ধারিত হয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে। সকল জেলা থেকে চাহিদার পরিমাণ জানার পর জাতীয় পর্যায়ে কত চাহিদা তা নির্ধারণ করা হয়। এরপর স্থানীয় কারখানা এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহকারীদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ করা হয় এবং ডিলারদের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। এখানে বেসরকারি খাতও মিশ্র সারের উৎপাদন এবং নিজস্ব ডিলারের মাধ্যমে বণ্টন করে থাকে। তবে জৈব সারের বিষয়টি পুরো বেসরকারি খাতের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। জৈব সারের জন্য বেশকিছু বড় উৎপাদনকারী রয়েছে তবে মোটা দাগে এটি এসএমই বা ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পের অবদান। তাদের কাঁচামাল নানা উৎস থেকে আসে এবং সরবরাহ সবসময় একরকম হয় না। আর কৃষকরাও বেশিমাত্রায় জৈব সার ব্যবহারে এখনও মানসিকভাবে এতটা উজ্জীবিত নয়। এখন পর্যন্ত ছোট ও মাঝারি মিলিয়ে প্রায় ১৬টি প্রতিষ্ঠান জৈব সার তৈরি করছে। এরমধ্যে মাত্র ৩টির সার বিক্রির লাইসেন্স আছে। এখানেও জড়িত রয়েছে ডিস্ট্রিবিউটর ও খুচরা বিক্রেতাদের একটি বড় শ্রেণি। তা ছাড়া রয়েছে প্রযুক্তি উপদেষ্টা ও সেবাদানকারী, লাইসেন্স এবং আর্থিক সহযোগিতাদানকারীরা।

বাধা বা সমস্যা বিশ্লেষণ

জৈব সারের মান নিয়ন্ত্রণে এবং এই খাতের পর্যবেক্ষণে কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। কৃষিতে নিয়োজিত একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্যে দেখা যায় খুবই নিম্নমানের জৈব সার

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয়। সয়েল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট পাক্ষিক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করে এবং সার আমদানির সময় মান দেখতে চাওয়া হয়। তবে এরপর মান নিয়ন্ত্রণ বা পর্যবেক্ষণের আর কোনো ব্যবস্থা নেই।

জৈব সার তৈরির প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়ার গতি খুবই ধীর। দীর্ঘদিন ধরে জৈব সার প্রস্তুত ও বিতরণের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে ১৩টি প্রতিষ্ঠান, যদিও তারা সার প্রস্তুত ও বিতরণ করছে। তবে অনুমোদন না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা এবং নিজস্ব ব্র্যান্ডিং করতে পারছে না।

তাছাড়া চাষিদের মাঝে সচেতনতা, দক্ষতা ও জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। সঠিক পরিমাণে সার ব্যবহার বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা, মানসম্মত সারের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাসহ নানা সমস্যায় এই খাত জর্জরিত। সঠিক পরিমাণে সার ব্যবহারসংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই খাতে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা, নারীরা কৃষিকাজের বড় একটা অংশে নিয়োজিত। অনেক জৈব সার প্রস্তুত কারখানায় মানবসম্পদের অর্ধেকই নারী। এই খাতের উন্নয়ন হলে তারা পুরুষের চেয়ে বেশি উপকৃত হবে।

৬. পাট

বহুবছর ধরেই বাংলাদেশে তথা পুরো বেঙ্গল ডেল্টা অঞ্চলে পাটচাষ হয়ে আসছে এবং সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা যায়, প্রায় ৪০ লক্ষ কৃষক ১২ লাখ একর জমিতে পাটচাষ করে থাকেন। পাট খুবই শ্রমঘন একটি কৃষিপণ্য এবং এর তিন-চার মাসের উৎপাদনপ্রক্রিয়ায় প্রচুর ভূমিহীন কৃষক শ্রম দেয় (Katalyst, 2012)। ফলে ফসল ওঠার পর এই খাতে অতিরিক্ত দেড় লক্ষাধিক নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়। পরবর্তী সময়ে পাটকলে এক লক্ষ ৯০ হাজার শ্রমিক পাট সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত থেকে এটিকে দেশের দ্বিতীয় বড় শিল্পশ্রমিকের খাতে পরিণত করেছে (Katalyst, 2012)।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

ভারতের পর বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ এবং কাঁচাপাট রপ্তানিতে বিশ্বে প্রথম। তা ছাড়া গত কয়েক বছরে পাটের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে আর জিডিপিতে পাটের অবদান ৫ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে পাটখাতে যেখানে আয় ছিল বার্ষিক ৬৫ বিলিয়ন টাকা, ২০০৯-১০ অর্থবছরে এসে এই খাতে আয় দাঁড়িয়েছে ৩৫০ বিলিয়ন টাকা (Katalyst, 2012)। পাটখাত বেশকিছু ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের পাটের সুতার মান ভালো, দামও কম।

খাতওয়ারি তথ্য

পাটবীজের মাত্র ৩১ শতাংশ দেশে পাওয়া যায় আর বাকি অংশ ভারত থেকে আমদানি করতে হয় (Katalyst, 2012)। পাটচাষিরা মার্চে বীজ বপনের সময়ে খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে বীজ কিনে বপন করে এবং জুলাই মাস নাগাদ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। কৃষক এবং কারখানার মধ্যে তিন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী জড়িত থাকে, যাদের মধ্যে ফড়িয়ারা

www.pathagar.com

হলো প্রথম যার কাছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শ্রেণির কৃষকরা পাট বিক্রি করে থাকে। ফড়িয়াদের কাছ থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং তাদের হাত ঘুরে জেলা পর্যায়ের ব্যবসায়ী বা মিল-কারখানার এজেন্ট—এই তিন শ্রেণি পাটকলে পাট প্রবেশের আগে হাতবদল করে। এরপর মিল বা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রপ্তানি হয়। যে পরিমাণ পাট রপ্তানির পর বাকি থেকে যায়, সেগুলো দেশের ৬৪টি স্পিনিং মিল অথবা ১১৫টি কম্পোজিট মিলে আসে। যেখান থেকে সুতাসহ নানা রকমের পাটজাত পণ্য তৈরি হয়। পাটকল থেকে সুতা হিসেবে যেমন রপ্তানি হয় আবার তেমনি পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারীরা তা সংগ্রহ করে পণ্য তৈরির পর স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে। আর কম্পোজিট মিল থেকেও তা রপ্তানি হয় এবং পাটভিত্তিক পণ্য প্রস্তুতকারীরা তা সংগ্রহ করেন (Katalyst, 2012)।

এই খাতে ব্যাংকের সহযোগিতা, ঋণসুবিধা, সরকারি নানা প্রতিষ্ঠানের তথ্য, জ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, বিপণন, প্যাকেজিং ও পরিবহনের সুবিধা বিদ্যমান। এই খাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পাটচাষি রয়েছেন। যাদের জমির পরিমাণ আড়াই একরের কম, তাদের উৎপাদিত পাটের পরিমাণ, দাম, মান, মুনাফার পরিমাণ, শ্রমিকের প্রয়োজন, বীজসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য, রেটিং বা পাটকলে পাট ছাড়ানোর পদ্ধতি, বিক্রয় প্রবণতাসমূহ অঞ্চলভেদে আলাদা হয়।

কৃষির অন্যান্য পণ্যের মতো পাটের ক্ষেত্রেও তিন ধরনের আনুষঙ্গিক দ্রব্য রয়েছে : বীজ, কীটনাশক ও সার। এদের মধ্যে বীজের মান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, ৩০ শতাংশ বীজ ভারত থেকে চোরাচালান হয়ে দেশে আসে (Katalyst, 2012)। দেশে বিএডিসির বড় অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও মানসম্মত বীজের চাহিদা শতভাগ পূরণ করতে পারে না, তবে তারা বীজ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে চেষ্টা করছে। এই খাতে সারা বছরই এক শ্রেণির ব্যবসায়ী থাকে আবার তাদের সঙ্গে যোগ হয় মৌসুমি ব্যবসায়ী। তাদের কারণে মুনাফার তারতম্য হয় এবং ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ায়, গ্রেডিং এবং সংরক্ষণে তারা ভূমিকা রাখে। তা ছাড়া কাঁচাপাট রপ্তানিকারক, তাদের ক্রয় ব্যবহার বা প্রবণতা, সংঘবদ্ধতা, মিলগুলোর ক্ষমতা, ক্রয়পদ্ধতি, প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি, কাঠামো, সক্ষমতা, সংগঠন, ক্রেতার সঙ্গে সম্পর্ক, পাটজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এবং তাদের ভূমিকা এই খাতে নানা ভূমিকা রেখে থাকে।

প্রতিবন্ধকতা

নানা কারণে পাট আরও উৎপাদনশীল এবং বেশি লাভজনক খাত হতে পারছে না। এর মধ্যে রয়েছে বীজসহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম, মান, চাষের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নানা প্রক্রিয়া, মিলগুলোতে সক্ষমতার ঘাটতি। এখানে বীজের মানের উপর অনেকগুলো বিষয় নির্ভর করে। ভালো বীজের অভাবে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হয় তেমনি সার্বিক ক্ষতির কারণও এটি। চাষপদ্ধতিতে নানা জটিলতা রয়েছে। যেমন রেটিংয়ের সময় কাদা লেগে যাওয়াসহ বেশকিছু কারণে তন্তুর মানের উপর বড় প্রভাব পড়ে। মিলগুলোতে ক্ষমতার চাইতে অনেক কম পরিমাণ কাজ হয়। সেখানে দক্ষতার ঘাটতি ও প্রশিক্ষণের অভাব বড় সমস্যা।

তবে নারীদের জন্য এই খাত এক বড় সম্ভাবনার জায়গা। তাদের জন্য এই খাত নানাভাবে আয়ের উৎস হয়েছে। পরিবেশগতভাবে পাটচাষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমাতে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

এর গোড়া মাটির উর্বরতা বাড়ায়। তবে মিলের পরিবেশ অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত নয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়নের মাধ্যমে পাটের উৎপাদন যেমন বাড়তে পারে, তেমনি শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ভালো হতে পারে।

চ. ভুট্টা

ভুট্টাচাষ শ্রমঘন একটি খাত। Labour Assessment Study ২০১৪ আনুযায়ী যশোর এবং রংপুরে ভুট্টা খাতে ১ লাখ ২ হাজার শ্রমিক ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনপরবর্তী প্রক্রিয়ায় জড়িত। বীজ বপন, চাষ এবং চাষপরবর্তী পর্যায়ে অনেক নারীশ্রমিক এখানে যুক্ত হন। চর এলাকায় দেখা গেছে সংখ্যায় কম হলেও নারীরাও চুক্তিভিত্তিক ভুট্টার চাষ করে থাকেন। যদিও তাদের জমি লিজ নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান নেই, তবে যাদের সঙ্গে চাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন, তারা তথ্য ও আনুষঙ্গিক সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। যদি নারীরা এই কাজে ঋণের সুবিধা পান তবে তারা অন্য পুরুষ চাষিদের মতো বড় আকারে চাষে নিয়োজিত হতে পারেন। চর এলাকার দরিদ্র কৃষকদের ভুট্টাচাষে সবচেয়ে বড় সমস্যা প্রাথমিক মূলধনের অভাব। ভুট্টাচাষিরা মূলত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে। এই খাতে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ঘাটতি আছে এবং দরিদ্র চাষিরা মানসম্মত উপকরণ যেমন বীজ পায় না। তারা সনাতন চাষের উপর নির্ভরশীল (Katalyst, 2014)।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

২০১১-১২ মৌসুমে বাংলাদেশে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে। উৎপাদন ছিল ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ মেট্রিক টন। চাষির সংখ্যাও বেড়েছে (২০১৪ সালের প্রথমভাগে এ সংখ্যা ছিল সাড়ে ৪ লাখ) (Katalyst, 2014)।

যদিও বাংলাদেশে ভুট্টাচাষ শতাব্দীকাল ধরেই হচ্ছে, তবে এর বিস্তৃতি মূলত পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় জুমচাষে সীমাবদ্ধ ছিল। ২০০০ সাল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলেও এর চাষ শুরু হয় এবং উৎপাদন বাড়তে থাকে। ২০০৮ সালে দেশের পোলট্রি শিল্পে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হলে ভুট্টার চাহিদা কমে যায় কারণ শতকরা ৯০ ভাগ ভুট্টা পোলট্রি শিল্পে খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খাত হিসেবে ভুট্টার বার্ষিক আয় ২০০৯-১০ সালে দেখা যায় ৯ দশমিক চার বিলিয়ন টাকা এবং এই খাতে সে সময় ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার কৃষক ও ৯৪ হাজার শ্রমিক নিয়োজিত ছিলেন (Katalyst, 2012)। প্রচুর মানুষ নিয়োজিত থাকায় এই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখা সম্ভব। তাছাড়া চর এলাকায় ভুট্টার চাষ বাড়িয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যায়। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা অসংখ্য মানুষের ভাগ্য বদলে দিতে পারে ভুট্টাচাষ।

খাতওয়ারি চিত্র

ভুট্টাখাতে কৃষকরা ছাড়াও বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, ফড়িয়া, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পাইকারি, স্থানীয় পোলট্রি ফিড বিক্রেতা, ফিড মিল্ক, সংগঠন, সরকারি সংস্থা, দাতা সংস্থার কিছু প্রকল্প রয়েছে।

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতা

২০০৯ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাধাবিপত্তি না থাকলে এই খাতের সাফল্য অনেক বেশি হতে পারত। মূলত চারটি বাধা এই খাতের উন্নয়নের পথে অন্তরায় : কম উৎপাদনশীলতা, পর্যাপ্ত ও সঠিক বীজ ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের ঘাটতি, নিম্নমানের ভুট্টা উৎপাদন যা মূলত পোলট্রি ফিড হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বাজারের যে কোনো অপ্রত্যাশিত আঘাত সামলানোর ক্ষমতার অভাব। আর এসব কারণ আরও গভীরে গিয়ে দেখলে দেখা যায়, চাষিরা যথার্থ চাষপদ্ধতি সম্পর্কে জানে না, তাদের শিক্ষার হারও কম। তা ছাড়া সরকারিভাবে বিভিন্ন সংস্থা যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব থাকায় তারা সব চাষিকে প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা দিতে পারে না। প্রাথমিকভাবে ভুট্টাচাষে অনেক টাকা লাগলেও ব্যাংক বা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারীরা এক্ষেত্রে ঋণ দেয় না। ফলে তারা ব্যক্তিগত উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করে। মানসম্মত বীজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরবরাহ, খারাপ পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন রকম সমস্যা এই খাতের উন্নয়নে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

আর পাহাড়ি এলাকার ভুট্টাচাষে আরও বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। সেখানে উৎপাদিত ভুট্টা মূলত মানুষের ভোগের জন্যই উৎপাদিত হয়। তবে সেখানকার পাহাড়ি মানুষ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে পোলট্রি শিল্পে সরবরাহ করতে পারলেও এ বিষয়ে তারা উদাসীন। এই খাতে নিয়োজিতদের ৭০ ভাগই নারী এবং তারা পারিশ্রমিক পান। তবে অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি আয় করতে পারেন যদি তারা ভুট্টা প্রতি টুকরো হিসেবে বিক্রি করেন। অনেক ক্ষেত্রে নারীরা দলগতভাবে কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন এবং এতে তাদের দৈনিক পারিশ্রমিক বেশি হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষ চাষির স্ত্রী ও কন্যা চাষে সহযোগিতা করেন তবে তাদের ভূমিকা নীরবেই থেকে যায়। নারীদের বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম বিক্রি তাদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। এ কারণে তাদের অনেক বড় ভূমিকা থাকলেও তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে দেখা যায় সেখানে ভুট্টাচাষের ফলে পরিবেশ ও মাটির উন্নতি হয়েছে। উর্বরাশক্তি বেড়েছে মাটির। তাছাড়া ভুট্টার কারণে জ্বালানি হিসেবে গোবরের ব্যবহার কমেছে এবং এতে করে গোবর জৈব সার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ বেড়েছে যা মাটির পুষ্টি বাড়াতে সক্ষম। তবে ভুট্টাচাষে উচ্চ মাত্রায় কীটনাশকের ব্যবহার মাটির উপর ও পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কীভাবে সঠিক পদ্ধতিতে পরিমিত কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় সেসব বিষয়ে তথ্যপ্রবাহের দক্ষতার মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে ভূমিকা রাখা যায়।

ছ. বীজ

বীজ হচ্ছে এমনই এক কৃষি-উপকরণ যা উল্লেখযোগ্য ফলন বাড়াতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। শিল্পায়নের দিকে যাত্রা শুরু করলেও বাংলাদেশে কৃষি এখনও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান ২১ শতাংশ, তবে মানসম্মত বীজ ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদন ১০%-১৫% বাড়ানো সম্ভব (Katalyst, 2012)। এছাড়া হাইব্রিড বীজের ব্যবহার ফলন ২০% বাড়াতে সক্ষম (Katalyst, 2012)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কৃষকদের ৫৩% নিম্নমানের বীজ দিয়ে চাষাবাদ করেন এবং এই শ্রেণির কৃষকরাই দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত। তবে এখন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি খাতের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে মানসম্মত বীজ ব্যবহারে সচেতনতা বাড়ছে। বেসরকারি খাত থেকে বেশি করে মানসম্মত বীজ দেওয়া হচ্ছে। বীজনীতি ও আইনের বিষয়ে সরকারি খাতে যদি কিছুটা সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া হয় এবং বেসরকারি খাতকে সহযোগিতা করা হয়, তাহলে বীজখাত আরও ভালো করতে সক্ষম হতো। এর ফলে কৃষকরাও বেশিমাত্রায় উপকৃত হতেন এবং কৃষি উৎপাদনে এর প্রভাব পড়ত। মাটির উর্বরতার জন্যও মানসম্মত বীজ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে এবং এতে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার কমানো যায় (Katalyst, 2012)।

প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা

বাংলাদেশে বীজখাতের ৫০ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৯৫৪-৫৫ সালের আগ পর্যন্ত সরকারি খাতে কোনো বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং তখন প্রথম বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ১৯৬২ সালে বিএডিসির যাত্রা শুরু হয় এবং ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কারিগরিভাবে বীজ উৎপাদনের বিষয়টি গোছানো ছিল না। ফলে মান যেমন নিম্ন ছিল, তেমনি নানাবিধ সমস্যাও ছিল। আগের বছরের চাষ থেকে রেখে দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এদেশের কৃষকরা বীজ সংগ্রহ করেছে। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু হবার পর চাষিদের মধ্যে ভালো মানের বীজের চাহিদা বাড়ে। ৯০-এর দশকে এসে এই চাহিদা বেসরকারি খাতের জন্ম দেয়। ফলে কারিগরি ও পেশাদারিত্বের ছাপ পড়ে বাজারে। সারা দেশে এখন একসঙ্গে বেশি বীজ কোম্পানি কাজ করছে এবং ৮ হাজার রেজিস্টার্ড ডিলার কাজ করছে (Katalyst, 2012)। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় বীজখাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্রুতগতিতে ভালো করছে।

খাতওয়ারি পরিস্থিতি

এই খাতে সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন বিএডিসি, বিএআরআই-এর পাশাপাশি বড় বেসরকারি খাত যুক্ত হয়েছে। তবে ধান এবং পাটবীজে দেখা যায় সরকারি খাত মুখ্য ভূমিকা রাখছে। আর সবজি, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি খাতে দেখা যায় বেসরকারি খাত এগিয়ে রয়েছে। দেশের চাহিদার ৮৩% জোগান দেয় সরকারি খাত (Katalyst, 2012)। সরকারি খাতে বীজ শাখা (কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে), জাতীয় বীজ বোর্ড, সিড সার্টিফিকেট এজেন্সি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি বা কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল বা বিএআরসি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কাজ করছে। আর বেসরকারি খাতে বীজ উৎপাদনসহ নানা কাজে ২০টি বড় মানসম্মত বীজ সরবরাহকারীর পাশাপাশি ১০০-এর মতো ক্ষুদ্র বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা, বীজ উৎপাদনকারী কৃষক, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বীজ সংক্রান্ত অ্যাসোসিয়েশন, দাতা সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে।

প্রতিবন্ধকতা

বীজখাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা কৃষকদের মানসম্মত বীজ সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান। এর সঙ্গে রয়েছে আধুনিক চাষপদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব। এর ফল হলো কম উৎপাদন।

www.pathagar.com

তবে মানসম্মত বীজ পাওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু বাধা রয়েছে। যেসব চাষি প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন তাদের কাছে অনেক জাতীয় বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পৌঁছায়নি। যারা চুক্তিতে বীজ উৎপাদন করে, বিএডিসি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অনেক সময় তাদের মূল্য পরিশোধে দেরি করে। তাছাড়া খুবই ভালোমানের বীজ উৎপাদন করে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম। বীজের ক্ষেত্রে ভেজালের মাত্রাও অনেক বেশি। আমদানি করা বীজ অনেক সময় ময়লা পরিবেশে রাখা হয়। তাছাড়া খারাপ বীজ ভালো মানের বীজের সঙ্গে মিশে যায় বা মেশানো হয়। সেগুলোও খারাপ পরিবেশে রাখায় তাদের মান আরও নিচে নেমে যায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও সবসময় ভালো মানের বীজ দিতে পারে না। তা ছাড়া বণ্টন ব্যবস্থায়ও রয়েছে অনেক সমস্যা। সার্বিকভাবে বীজ নীতিমালার যথার্থ প্রয়োগের অভাবও রয়েছে।

কৃষিখাত : সরকারি ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সরকারিভাবে কৃষি মূলত দুটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে। একটি হলো কৃষি মন্ত্রণালয়, অন্যটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। এছাড়া বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, পানিসম্পদ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়েরও কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি (ফসল) উন্নয়ন সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। এর অধীনে রয়েছে আটটি বিভাগ বা উইং।

এগুলো হলো—সরেজমিন উইং, প্রশিক্ষণ উইং, হর্টিকালচার উইং, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ক্রপস উইং; পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং; প্রশাসন ও অর্থ উইং।

সরেজমিন উইংয়ের আওতায় রয়েছে ১০টি অঞ্চলভিত্তিক অফিস, ৬৪টি জেলাভিত্তিক অফিস এবং সকল উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিস। বাংলাদেশের যে কোনো সরকারি অফিসের তুলনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জনবল বেশি এবং সেটা মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত। কৃষকদের তাৎক্ষণিক সহযোগিতার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে রয়েছে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা।

হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় সারা দেশে ৭২টি হর্টিকালচার সেন্টার রয়েছে যেগুলো মানসম্মত বীজ, চারা, কলম উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ২১টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র উদ্ভিদের রোগবালাই দেশে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় রয়েছে ১৩টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই) ও একটি জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (National Agriculture Training Academy)।

কৃষি পর্যায় (ভ্যালু চেইন)

ভ্যালু চেইন একটি বিস্তৃত ধারণা। সহজ করে বলা যায়, কোনো পণ্য উৎপাদক বিভিন্ন হাতবদল হয়ে যেভাবে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে পৌঁছায়, সেটাই ভ্যালু চেইন। একটি ভ্যালু চেইনে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন পক্ষ থাকে। এক হাত থেকে অন্য হাতে পণ্য যেতে

www.pathagar.com

যেতে বিভিন্ন কারণে (যেমন—গ্রেডিং, প্যাকেজিং, প্রসেসিং, পরিবহন) নতুন মূল্য সংযোজিত হয়। এছাড়া ভ্যালু চেইনে পশ্চাৎসংযোগ (ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ), সেবা প্রদানকারী, সরবরাহ বা জোগান ব্যবস্থা, ব্যবসায়িক ও নীতিগত পরিবেশ ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার কখনও কখনও একটি পণ্যের ভ্যালু চেইন অন্য পণ্যের ভ্যালু চেইনের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত হতে পারে।

সামগ্রিক কৃষিখাতের ভ্যালু চেইন একটি জটিল বিষয়। তাই সহজবোধ্য করার জন্য কৃষিখাতকে বিভিন্ন উপখাত ও উপখাতকে সুনির্দিষ্ট পণ্যে বিভাজন করে ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন—মাঠ ফসল একটি উপখাত; এর একটি পণ্য ধান। কৃষক এখানে প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী। কৃষক এখানে কৃষির বিভিন্ন উপকরণ যেমন—পুঁজি, বীজ, সার, সেচ, মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদি সেবা প্রদানকারী বা পশ্চাৎসংযোগ থেকে সংগ্রহ করে ধান উৎপাদন করে। এই ধান কোনো মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী (ব্যাপারি, ফড়িয়া) কিনে নেয়। সেখান থেকে ছোট বা বড় প্রক্রিয়াজাতকারী ধানকে চালে রূপান্তর করে।

চাল আবার পাইকার, স্থানীয় বাজার, খুচরা ব্যবসায়ী প্রভৃতি স্তর পেরিয়ে চূড়ান্ত ভোক্তার কাছে যায়। ভ্যালু চেইনের প্রতিটি স্তরে পণ্যের সঙ্গে মূল্য সংযোজিত হয়। ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য যৌক্তিকভাবে পণ্যের মূল্য বাড়ানো যাতে সকল পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে ভ্যালু চেইনে আলু উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেখানো যায় নিম্নলিখিতভাবে :

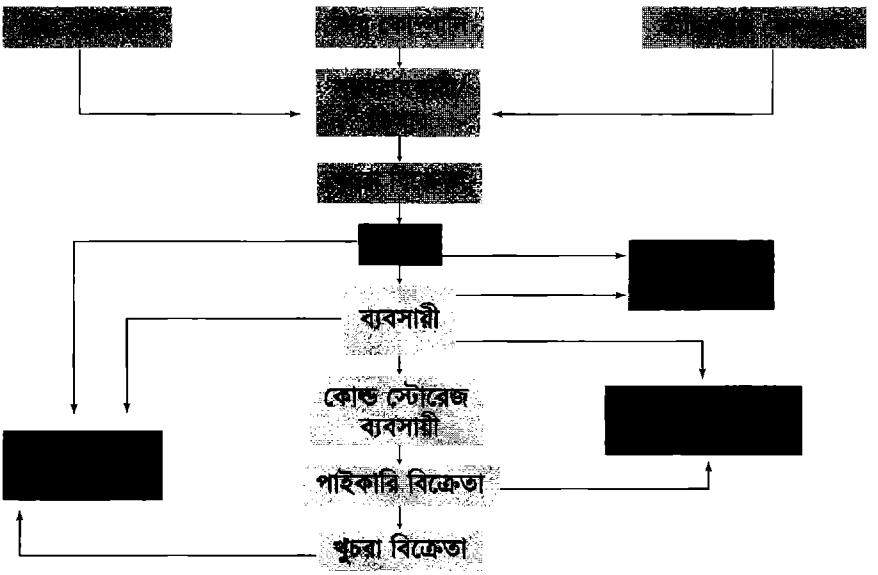

www.pathagar.com

শিল্পসহ অন্যান্য খাতের সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক

কৃষির সঙ্গে শিল্প সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত। কিছু কিছু শিল্প সম্পূর্ণ কৃষিপণ্যের উপর নির্ভরশীল। পাটশিল্প, আখ বা চিনিশিল্প, তুলা-সুতা-বস্ত্রশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী শিল্প (চাল, চিপস, জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, চাটনি, বেকারিপণ্য ইত্যাদি), হ্যাচারিশিল্প, পোলট্রিশিল্প, ডেইরি ও ডেইরিজাত শিল্প, ভেষজশিল্প, ওষুধশিল্প, কসমেটিক ও প্রসাধনী, কাগজ, সার ইত্যাদি কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কৃষির বিকাশের মাধ্যমেই সর্বত্র শিল্প ও সেবাখাত বিকশিত হয়েছে, সেজন্যই সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ কৃষিতে সর্বাধিক জোর দিয়ে থাকে।

কৃষকের শ্রেণিবিভাগ

দেশের কৃষকদের তাদের জমির মালিকানার উপর ভিত্তি করে মোটামুটিভাবে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। সে হারে শ্রেণিভুক্ত কৃষক :

কৃষকের শ্রেণিবিভাগ	[illegible]	মোট কৃষি পরিবারের অংশ (%)	[illegible]
ভূমিহীন কৃষক	[illegible]	৫২.৫৫%	[illegible]
প্রান্তিক কৃষক	[illegible]	২৩.৫৩ %	[illegible]
ক্ষুদ্র/ছোট কৃষক	[illegible]	১০.৫০%	[illegible]
মাঝারি কৃষক	১.০১-৩.০	১১.৬৫%	[illegible]
বড় কৃষক	৩.০১ হেক্টরের বেশি	০১.৬৭%	[illegible]

উৎস : DAE, 1999

ইদানীং হিসাবের সুবিধার্থে ৫ শ্রেণির কৃষককে ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যে কৃষকদের জমির পরিমাণ ০.০০ থেকে ১.০ হেক্টর অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, ক্ষুদ্র/ছোট কৃষকদের একত্রে ভূমিহীন কৃষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ভূমিহীন কৃষকরা মোট কৃষি পরিবারের ৮৬.৫৮% যা মোট মালিকানার ৪১.২০% (DAE, 1999)।

কৃষকের মধ্যে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ছোট কৃষকই বেশি। কৃষিখাত এগিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনসহ সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই দরিদ্র কৃষকদের উপর বেশি জোর দেওয়া জরুরি। তারাই যেহেতু উৎপাদক পর্যায়ের শ্রমশক্তি, সুতরাং তারা যাতে সার, বীজ, কীটনাশকসহ উৎপাদনের সকল সুবিধা এবং ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়, তেমন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

www.pathagar.com

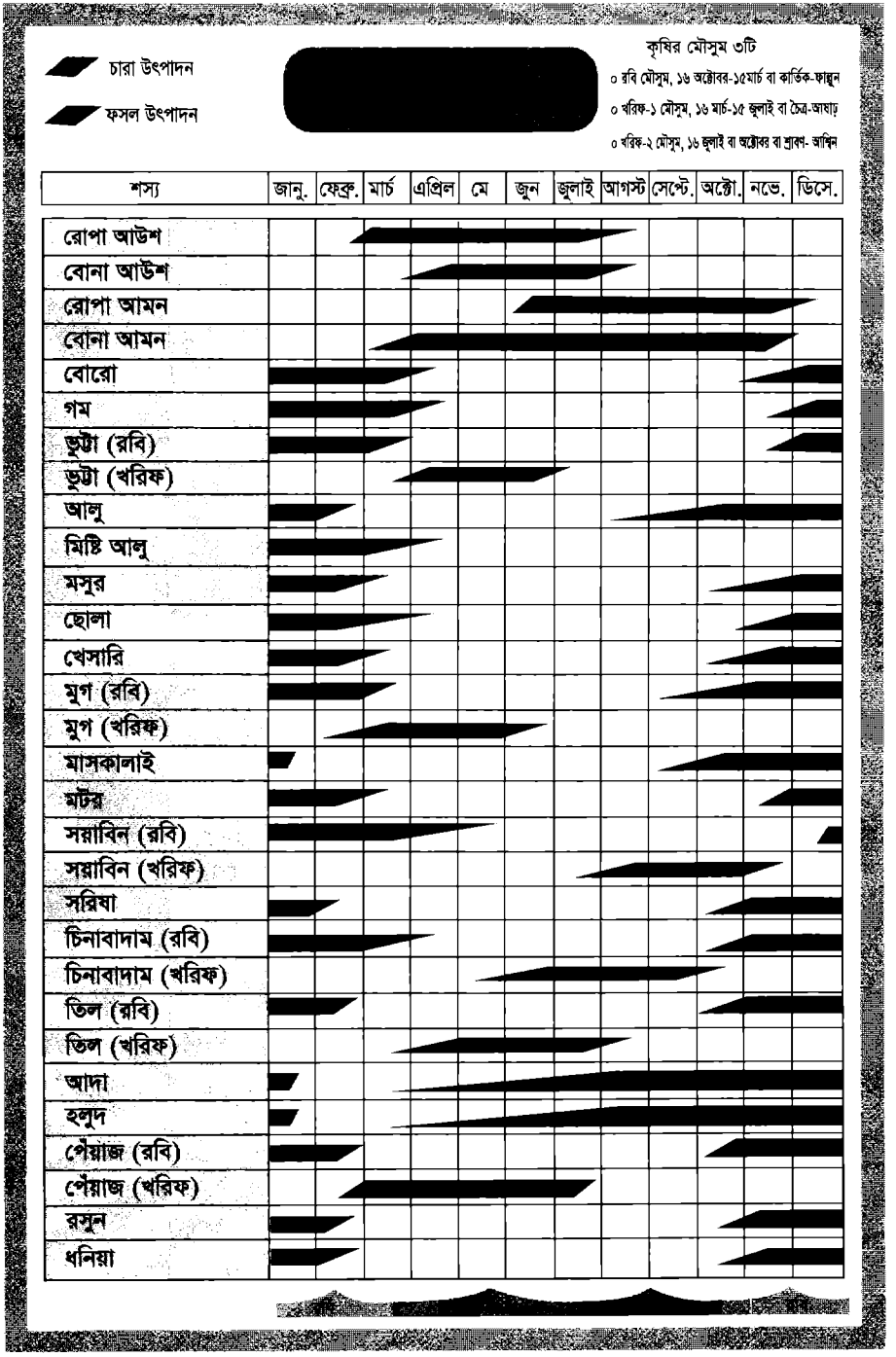

www.pathagar.com

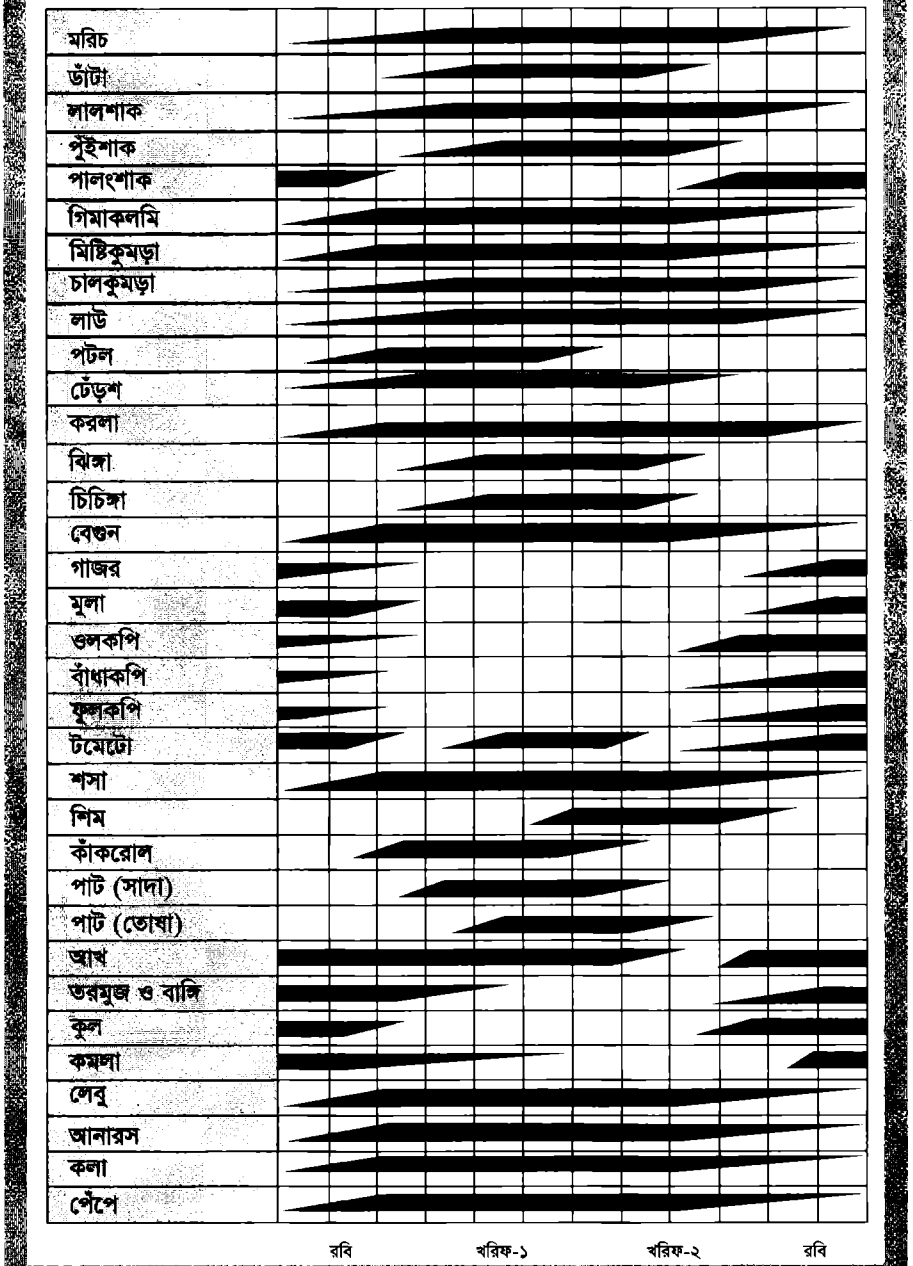

www.pathagar.com

কৃষির মৌসুম

বাংলাদেশের কৃষি মৌসুমকে তিনটি ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো : ক. রবি, খ. খরিফ-১, এবং গ. খরিফ-২ (চৈতালি বা বাসন্তিক ফসল ও হৈমন্তিক)।

ক. রবি মৌসুম : ১ কার্তিক থেকে ৩০ ফাল্গুন (১৬ অক্টোবর থেকে ১৫ মার্চ)। ১৫২ দিন।

খ. খরিফ-১ : ১ চৈত্র থেকে ৩১ আষাঢ় (১৬ মার্চ থেকে ১৫ জুলাই)। ১২৩ দিন।

গ. খরিফ-২ : ১ শ্রাবণ থেকে ৩০ আশ্বিন (১৬ জুলাই থেকে ১৫ অক্টোবর)। ৯২ দিন।

এখানে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, সময় ধরে যদিও তিনটি মৌসুমের সময়সীমা ভাগ করা হয়েছে, তবে এই সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফসলের চারা রোপণ থেকে শুরু করে উৎপাদনের শেষ সময় পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সময়ের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

কৃষি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

পৃথিবীর কোনো কৃষিই এখন আর নিজ দেশে সীমাবদ্ধ নেই। নিজেদের প্রয়োজনে এবং সার্বিক কল্যাণে কৃষি এখন বহির্বিশ্বমুখী হয়ে গেছে। সেজন্য কৃষিসংশ্লিষ্ট আমদানি-রফতানি আরও বেশি বেগবান হয়েছে। এক সময় এদেশের কৃষি ছিল 'খোরাকি কৃষি'। আর সময়ের বিবর্তনে কৃষি এখন 'বাণিজ্যের কৃষি' বা সমৃদ্ধির কৃষি। কৃষকরা এখন আর মান্ধাতা আমলের কৃষি উপকরণ কৌশল অনুসরণ করে থেমে থাকতে চান না। আরও লাভজনক কৃষির অবতারণা করতে চান কৃষিজীবীরা। স্থানীয় জাতের পর কৃষকরা নিলেন স্থানীয় আধুনিক জাত, উচ্চ ফলনশীল জাত। এরপর হাইব্রিড জাত, সুপারব্রিড জাতের গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। টিস্যুকালচারের মাধ্যমে নতুন নতুন বীজ আসছে। ৩ মাসের জীবনকালসম্পন্ন ফসল এখন ২ মাসে চলে এসেছে। কৃষি গবেষণা, পরিকল্পনা, উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, সংরক্ষণ সবকিছুই এখন আর শুধু দেশে সীমাবদ্ধ নয়। সকল ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি গরিব, উন্নয়নশীল কিংবা ধনী সব দেশের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের কৃষিপণ্য বিশেষ করে সবজি ও মৎস্য বর্তমানে বিশ্বের বহুদেশে রপ্তানি হচ্ছে। ফলে এ খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং করতে পারলে বহির্বিশ্বে দেশের কৃষিপণ্যের চাহিদা দিন দিন আরও বাড়বে।

তথ্যসূত্র

BBS [Bangladesh Bureau of Statistics]. (2015). *Report on Labour Force Survey 2013.* Dhaka: Retrieved on December 15, 2015, from http://bbs.gov.bd/

BCAS [Bangladesh Centre for Advanced Studies, BD]. (2009). *A comprehensive study on the fisheries sector of Bangladesh.* Dhaka: BCAS.

DAE [Departmnet of Agriculture Extension, Ministry of Agriculture, Bangladesh]. (1999). *Agricultural Extension Manual.* Dhaka: DAE.

www.pathagar.com

Katalyst. (2014). *Katalyst Sector Brief.* Dhaka: Katalyst.

Katalyst. (2012). *Katalyst Sector Strategy*. Dhaka: Katalyst.

আজাদ, সৈ. আ. (২০১৫). *বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাত, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৫.* ঢাকা: মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ।

এআইএস [কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ]. (২০১৬). *কৃষি ডাইরি.* ঢাকা : এআইএস।

কৃষি মন্ত্রণালয়. (২০১৩). *জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩.* ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিবিএস [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো]. (২০০৮), *কৃষি শুমারি.* ঢাকা : বিবিএস।

বিবিএস [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো]. (২০০৫-২০০৬), *শ্রম শক্তি জরিপ.* ঢাকা : বিবিএস।

মুক্তা, জি. হ. (২০১০). *জাতীয় কৃষি কনভেনশন স্মারক পুস্তিকা.* ঢাকা : গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য প্রচারাভিযান।

সায়েম, মো. আ. (অগ্রহায়ণ, ১৪২২). *কৃষি কথা.* ঢাকা : এআইএস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২. কৃষিপ্রযুক্তি

মো. জাহাঙ্গীর আলম ও প্রয়াস রায়

যে পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃষির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় তাকে কৃষিপ্রযুক্তি বলে। কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। কৃষিকাজে লাগসই বা টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করলে খরচ কম হয় এবং উৎপাদন বেশি হয়।

বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রযুক্তি আছে যার খরচও বিভিন্ন ধরনের। যেমন : প্রথাগত প্রযুক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তি। দেশীয় প্রেক্ষাপটে স্থায়িত্বশীল, কার্যকর ও পরিবেশেবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করাই ভালো। কৃষি উন্নয়নে কৃষি প্রযুক্তির বিকল্প নেই। পরিপূরক প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো বিশেষ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো যায়। কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করা যায়। প্রথাগত প্রযুক্তিগুলো কৃষকের প্রচলিত জীবনধারা ও কৃষক আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত কৌশল আর আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ দেশি-বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত। বাংলাদেশের কৃষিতে প্রথাগত ও আধুনিক উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হয়।

নিচে বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রযুক্তি আলোচনা করা হলো :

১. প্রথাগত প্রযুক্তি

ক. বীজ বাছাই : মিশ্র বা মন্দ জাতের বীজ থেকে ভালো জাতের বীজ বাছাই করার পদ্ধতি এটি। এই পদ্ধতিতে রোগমুক্ত সজীব স্বাস্থ্যবান সুন্দর বীজ বাছাই করা হয়। হাত বাছাই, পানির মাধ্যমে, চালনি বা মেশিনের মাধ্যমে বীজ বাছাই করা হয়।

খ. বীজতলায় ছাই দেওয়া : বীজতলায় ছাই দেওয়া একটি প্রচলিত কার্যকর প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বীজতলায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে ও মাটি পুষ্টিসম্মত হয়, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বীজতলার চারার বৃদ্ধিও ভালো হয়, বালাইয়ের আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং বীজতলা থেকে চারা তুলতে সুবিধা হয়। এসব কারণে বীজতলায় ছাই ছিটানো হয়। একইভাবে বিভিন্ন ফসলে জাবপোকা দমনে ছাই ব্যবহার একটি লাগসই প্রযুক্তি।

www.pathagar.com

গ. কাকতাড়ুয়া : এটি গ্রামীণ কৃষিতে অধিক প্রচলিত একটি কৌশল। কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে যে কাকতাড়ুয়া শুধু পোকা, পাখি, জন্তু, জানোয়ারের আক্রমণ থেকেই রক্ষা করে না, ফসলে কারও কুনজর থেকেও রক্ষা করে। মূলত খড়, পুরোনো লুঙ্গি, প্যান্ট, জামা, মাটির পাতিল, বাঁশ, কালি, চুন ব্যবহার করে একটি মানুষের ডামি তৈরি করা হয়। এতে পশুপাখি অন্যান্য জন্তুজানোয়ার ভয় পেয়ে ফসল আক্রমণ করে না।

ঘ. জমিতে পলিথিন ঝুলানো : ইঁদুর ফসলের প্রচুর ক্ষতি করে। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ইঁদুরের ক্ষতি থেকে ফসল রক্ষা করা হয়, যেমন ফসল পাকা শুরু হলে অথবা ফল আসা শুরু হলে সারা জমিতে দড়ি দিয়ে পাতলা পলিথিনের টুকরা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যেন বাতাসের কারণে পলিথিনে পতপত শব্দ হয়। এতে আওয়াজ পেয়ে ইঁদুর জমির কাছে আসে না। জমির মধ্যে কলাগাছ লাগালেও একই ফল পাওয়া যায়।

ঙ. টিন/পটের আওয়াজ : এ কৌশলটিও দীর্ঘদিন থেকে গ্রামবাংলার কৃষিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেসব ফসল পরিপক্ব হওয়ার আগ থেকে বিভিন্ন জন্তু, পাখি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেসব ফসলের ক্ষেত্রে এ কৌশল ব্যবহার করা হয়। বৃক্ষজাতীয় প্রায় সব ফল, মাঠের কাউন, ভুট্টা বা ছড়াজাতীয় ফসল, বিভিন্ন তরিতরকারি অন্যতম। এক্ষেত্রে জমিতে বা গাছের উপযুক্ত স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে টিনের মধ্যে বা পাশে এমনভাবে হাতুড়ি লাগানো থাকে, দূর থেকে দড়ি দিয়ে টানলে টিনে বাড়ি লাগে এবং বেশ আওয়াজ হয়। তখন এ ফসল ক্ষতিকারক জীবজন্তু, পাখি আর পোকামাকড় দূরে চলে যায়।

চ. গোলাঘর বা সংরক্ষণ পাত্রে ইঁদুর আক্রমণ করে অনেক ক্ষতি করে। ইঁদুর দমনে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে অতি সাধারণ একটি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হলো টিনের ১ থেকে ২ ফুট চওড়া একটি খণ্ড নারকেল, সুপারি বা অন্য কোনো গাছের চতুর্দিকে ভালোভাবে আটকে দিলে ইঁদুর আর উপরে উঠতে পারে না। গ্রামে খুঁটি দিয়ে মাচা তৈরি করে গোলাঘর বা সংরক্ষণ পাত্র রাখা হয়। এসব খুঁটিতে টিনের পাত বা অ্যাঙ্গেল করে আটকে দিলেও ইঁদুর উপরে উঠতে পারে না। অনেক দেশেই এ প্রযুক্তিটির বেশ কার্যকর ব্যবহার রয়েছে।

২. আধুনিক প্রযুক্তি

ক. বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা : এ পরীক্ষার মাধ্যমে ভালো মানের বীজ বাছাই করা হয়। কমপক্ষে ৮০ শতাংশ ভালো বীজ থাকলে সে বীজকে মানসম্মত বীজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সাধারণভাবে বালি, কাগজ, মাটির পাত্র, কলাপাতা, কলার খোল এসব দিয়ে খরচবিহীনভাবে বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করা হয়। যেভাবেই পরীক্ষা করা হোক না কেন প্রথমে ১০০টি বীজ নেওয়া হয়। উল্লিখিত বস্তুতে (বালি, কাগজ, মাটির পাত্র, কলাপাতা, কলার খোল) বীজ ভিজিয়ে বৃত্তাকারে বা বর্গাকারে সাজিয়ে ঢেকে রাখা হয় কয়েকদিন। প্রতিদিন একবার করে সাবধানে হালকা পানি দিয়ে বীজের গা ভিজিয়ে দিতে হয়। ৩-৫ দিন পরে বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। ভালোভাবে অঙ্কুরোদগম শেষ হলে একটি একটি করে আলাদাভাবে অঙ্কুরিত বীজ গণনা করা হয় এবং শতকরা হার নির্ণয় করা হয়।

www.pathagar.com

খ. বীজ শোধন : বিভিন্ন বীজবাহিত রোগবালাই বীজের গায়ে লেগে থাকে। এগুলো পরবর্তীতে বীজের অঙ্কুরোদগম বা ফসল বৃদ্ধির সময় গাছকে আক্রান্ত করে, ফলন কমিয়ে দেয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতভাগ ফলন নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য বীজ বপনের আগে বিভিন্ন বালাইনাশক বা রাসায়নিক দিয়ে বীজকে শোধন করে বালাইমুক্ত করা হয়। এতে বীজ ভালো থাকে এবং পরবর্তীতে ভালো ফলন দেয়। বীজ শোধনে খরচ কম কিন্তু লাভ বেশি।

গ. বীজতলা শোধন : বীজ অঙ্কুরোদগমের পর বীজতলায় বপন করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় বীজতলায় বিভিন্ন বালাইয়ের আক্রমণের কারণে চারা আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে আক্রান্ত চারা কোনোমতেই ভালো বা কাঙ্ক্ষিত ফলন দিতে পারে না। সেজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রযুক্তি অবলম্বন করে বীজতলাও শোধন করা হয়। বীজতলা শোধন করলে পরবর্তীতে ভালো মানসম্মত চারা পাওয়া যায়। ফরমালডিহাইড, পলিথিন, বালাইনাশক এসব দিয়ে বীজতলা শোধন করা হয়।

ঘ. বীজ শুকানোর সৌর টেবিল : স্থানীয়ভাবে বাঁশের মাচা বা টেবিল দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। সাধারণ রোদ, টিনের গরম, পলিথিন দেওয়ার জন্য গরমে বীজ বা ফসল দ্রুত শুকায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আর গুমোট গরম বীজ শুকাতে দারুণ কাজে লাগে। পলিথিনের কারণে বীজ ভিজবে না, গুমোট গরমে আস্তে আস্তে অনায়াসে বীজ শুকিয়ে যায়।

ঙ. ধানের চারার দস্তা ট্রিটমেন্ট : আমাদের দেশে ৫০-এর দশকে মাটিতে প্রথম ইউরিয়ার তথা নাইট্রোজেনের অভাব ধরা পড়ে। অধিক ফলনের জন্য ইউরিয়া, পরে টিএসপি, এমওপি, আরও পরে দস্তার অভাব দেখা দেয়। দস্তার অভাবে জমিতে ফসলের অসমান বৃদ্ধির কারণে ফলন কম হওয়া বা একেবারে না হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাসায়নিক সারের মধ্যে দস্তার দাম সবচেয়ে বেশি। সাধারণ কৃষকরা দামের কারণে জরুরি হলেও দস্তা সার ব্যবহার করেন না। এ প্রেক্ষিতে যত্নের সঙ্গে বীজতলা থেকে চারা তুলতে হবে। এরপর আগেই তৈরিকৃত দস্তার দ্রবণে ধানের চারা অল্পসময়ের জন্য ডুবিয়ে আবার তুলে ফেলতে হবে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারলে পরবর্তীতে মূল জমিতে আর দস্তা ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না।

চ. গরম পানিতে ফল শোধন : আম একটি পচনশীল ফল। পরিপক্ব আম গাছ থেকে পাড়ার পর ২-৩ দিনের মধ্যে পেকে যায় বা পচে যায়। এতে ব্যবসায়ী বা চাষিরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা অতি সুলভ এবং সহজ একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। পদ্ধতি হলো– পাকা বা পরিপক্ব আম ৫০-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ যে গরমে আমরা চা খাই সে গরমে আমকে ৫-৭ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে ছেঁকে ফেলতে হবে। এরপর ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় শুকিয়ে নিলে আমকে ৫-৭ দিন রেখে দেওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে শোধন করলে আমের স্বাদের কোনো তারতম্য হয় না। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গরম পানিতে আম শোধন করার একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেছে। বাণিজ্যিকভাবে এ যন্ত্রটি দিয়ে আম শোধন করা যায়। এতে প্রতি কেজি আম শোধন করতে খরচ পড়ে মাত্র ১৭ পয়সা। সাধারণ চাষিরা ঘরোয়াভাবে গরম পানিতে আম শোধন করতে পারেন।

www.pathagar.com

ছ. এলসিসি (LCC) : লিফ কালার চার্টের সংক্ষিপ্ত নাম এলসিসি। ধানের পাতার রঙের সঙ্গে এলসিসির চার্টের রং মিলিয়ে দেখে তবেই কেবল ইউরিয়া সার ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাই করা হয়। এতে প্রয়োজন বা দরকার ছাড়া ইউরিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না বলে সার ব্যবহারে সাশ্রয় হয়। এ কাজটি করতে মোটেই কোনো খরচ হয় না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করলে তারা চার্ট নিয়ে কৃষকের জমিতে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এ পরীক্ষাটি করে দেয়। এতে ইউরিয়া সার ব্যবহারে অনেক সাশ্রয় হয়।

জ. এডব্লিউডি (AWD) : অলটারনেটিভ ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং অর্থাৎ পর্যায়ক্রমিকভাবে জমিকে ভেজানো ও শুকানো। আমাদের দেশের কৃষকরা সাধারণভাবে ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার লিটার পানি ব্যবহার করেন, যা অপচয়। অথচ এডব্লিউডি ব্যবহারের ফলে ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে ১ থেকে দেড় হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত পানি অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ধানের সেচ বিজ্ঞানীরা এ প্রযুক্তিটি আবিষ্কার করেছেন। বাঁশের চোঙ, প্লাস্টিকের বোতল বা প্লস্টিকের পাইপ দিয়ে সামান্য খরচে এ পাইপ তৈরি অনেক দিন ব্যবহার করা যায়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যও এ প্রযুক্তিটি বেশ কার্যকর।

ঝ. স্বল্পপরিসরে মাটিবিহীন চাষাবাদ মডেল : স্বল্পপরিসরে মাটিবিহীন চাষাবাদ বা মাইক্রো গার্ডেন মডেল পদ্ধতিটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি নতুন প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে মাটির পরিবর্তে পানিতে অথবা নারকেলের আঁশের গুঁড়ায় প্লাস্টিকের টবে বিভিন্ন পাতা, ফল ও মূলজাতীয় সবজি ও কিছু কিছু ফলের চাষাবাদ করা যায়।

ঞ. হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সবজি ও ফল উৎপাদন প্রযুক্তি : হাইড্রোপনিক একটি অত্যাধুনিক ফসল উৎপাদন পদ্ধতি। অতি লাভজনক ফসলের ক্ষেত্রে এ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাটির পরিবর্তে পানিতে গাছের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন করা হয়। জনবহুল দেশে যেখানে স্বাভাবিক চাষের জমি কম কিংবা নেই সেখানে ঘরের ছাদে বা আঙিনায় এ পদ্ধতিতে সবজি ও ফল উৎপাদন সম্ভব।

ট. কৃষিতে যন্ত্রায়ন : মান্ধাতার আমলের কৃষি পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক কৃষিতে উপনীত হওয়ার প্রথম এবং প্রধান সোপান কৃষিতে যন্ত্রায়ন। কৃষিতে যন্ত্রায়নে কৃষি আরও সহজ হয়েছে, খরচ কমেছে, উৎপাদন বেড়েছে। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, কালটিভেটর। ট্রাক্টর বেশি জমিতে বড় পরিসরে চাষ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর পাওয়ার টিলার কম জমিতে অল্প পরিসরে চাষ দেওয়ার জন্য। পাওয়ার টিলার আর টিলারের পরে এদেশের কৃষিতে এসেছে সেচের জন্য পাওয়ার পাম্প। যার মধ্যে আছে ডিপ টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল, লোলিফট পাম্প, রোয়ার পাম্প, ট্রেডল পাম্প। মাড়াইয়ের জন্য আছে প্যাডল থ্রেসার ও পাওয়ার প্যাডল থ্রেসার। বীজ বপনের জন্য আছে সিডড্রিল, সোয়িং মেশিন। চারা রোপণের জন্য আছে ট্রান্সপ্লান্টার। আগাছা দমনের জন্য উইডার। বালাই দমনের জন্য স্প্রেয়ার ও পাওয়ার স্প্রেয়ার। ফসল শুকানোর জন্য ড্রায়ার। ঘাস কাটার জন্য কাটার ও চপার। ফসল

www.pathagar.com

তোলা মাড়াইয়ের জন্য আছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার। শুকানোর জন্য ড্রায়ার। ঝাড়াইয়ের জন্য উইনোয়ার। গুটিইউরিয়া প্রয়োগের জন্য এপ্লিকেটর ও কম্পোস্ট সেপারেটর।

ঠ. সেচ : মাটির এবং ফসলের প্রয়োজনে বাইরে থেকে পানি সরবরাহকে সেচ বলে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হয়। আমাদের দেশে সাধারণত গভীর নলকূপ বা ডিপ টিউবওয়েল, অগভীর নলকূপ বা শ্যালো টিউবওয়েল, লো লিফট পাম্প দিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে সেচ দেওয়া হয়। তা ছাড়া ট্রেডল পাম্প, রোয়ার পাম্প, টানাকল, ঢেঁকিকল, দোন, সেঁউতি এসব দিয়েও সেচ দেওয়া হয়। ইদানীং ভূপৃষ্ঠের পানি ব্যবহারের চেয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আমাদের সেচ বিজ্ঞানীরা এডব্লিউডি বা অলটারনেটিভ ড্রাইং অ্যান্ড ওয়েটিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার মাধ্যমে পানি ব্যবহারে সাশ্রয় হয়। হিসাব করে দেখা গেছে সাধারণ পদ্ধতিতে ১ কেজি ধান উৎপাদনের জন্য আমাদের কৃষকগণ ৩ থেকে ৫ হাজার লিটার পানি ব্যবহার করেন। অথচ এডব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ১ কেজি ধান উৎপাদনে মাত্র ১ থেকে দেড় হাজার লিটার পানির ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে।

ড. জীবপ্রযুক্তি : ইউএন কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, যে কোনো প্রযুক্তি যা জৈবিক প্রণালী, জীব বা এদের থেকে প্রাপ্ত সামগ্রী ব্যবহার করে নতুন কিছু তৈরি করে অথবা পুরাতন কিছুকে পরিবর্তন করে, সেটাই জীবপ্রযুক্তি। কৃষিক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্য মূলত উদ্ভিদ, প্রাণী কিংবা অণুজীবসমূহের নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। মানুষ প্রায় এক হাজার বছর পূর্ব থেকে ভালো জাতের উদ্ভিদ বা প্রাণীর মধ্যে সংমিশ্রণ বা প্রজনন ঘটিয়ে বন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীর জাত উন্নয়ন করে আসছে। এই দিক বিবেচনায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার চলে আসছে, যা প্রধানত অভিজ্ঞতানির্ভর। বর্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণার প্রসারের ফলে জীবপ্রযুক্তির স্বরূপ অনেকটাই বদলে গেছে। আধুনিক জীবপ্রযুক্তির পুরোটাই রয়েছে জীবের সকল বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক ডিএনএ (DNA) সম্পর্কিত জ্ঞান ও তার প্রয়োগ।

সনাতন পদ্ধতিতে বাহ্যিক গুণাগুণের ভিত্তিতে কিছু উন্নত জাত নির্বাচন করে তাদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে উন্নত সংকর জাতের ফসলি উদ্ভিদ উৎপন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য সফলতা অর্জন করতে অনেক সময় লেগে যায়, কারণ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপন্ন চারা গাছে মাতৃ-উদ্ভিদের সকল গুণাগুণ এসেছে কি না, তা নিশ্চিত হতে চারা গাছটি থেকে ফসল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা দুটি ভালো জাতের মধ্যে সংকরায়নের ফলে যে চারাগাছ তৈরি হয়, তার ডিএনএ যাচাই করে, অনেকক্ষেত্রেই ওই চারাগাছ থেকে ভবিষ্যতে কেমন ফসল ফলবে তা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। এর ফলে ফসল আসা পর্যন্ত অপেক্ষার আর দরকার হয় না এবং জিনগতভাবে অনুন্নত চারাগাছের পেছনে শ্রম এবং অর্থ ব্যয় প্রয়োজন হয় না। চারাগাছের ডিএনএ যাচাই করে তুলনামূলক উন্নত জাত নির্বাচন করার এই প্রক্রিয়াকে বলে মার্কার অ্যাসিস্টেড সিলেকশন (Marker Assisted Selection) (Collard and Mackill, 2007)। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো গত কয়েক দশকে ক্রমবর্ধমানহারে বিভিন্ন ফসলি উদ্ভিদের উন্নত জাত উদ্ভাবন করে চলেছে।

www.pathagar.com

টিস্যু কালচার (Tissue Culture) পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি উদ্ভিদের ছোট একটি অংশ, যেমন—একটি পাতা, কাণ্ডের টুকরো ইত্যাদি ব্যবহার করে পরীক্ষাগারে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করতে পারেন। এর ফলে বিজ্ঞানীরা খুব সহজেই একটি ভালো জাতের উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফেলতে পারেন। এছাড়াও রোগাক্রান্ত উদ্ভিদ থেকে রোগমুক্ত এবং রোগপ্রতিরোধী উদ্ভিদ তৈরিতেও টিস্যু কালচার পদ্ধতি ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের নানামুখী ক্ষতি হচ্ছে। প্রকৃতিতে সাধারণভাবে নানাধরনের অণুজীব (Microorganism) আছে যারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে। কিছু অণুজীব আছে যারা এমন উপাদান তৈরি করে যা নানাধরনের কীটপতঙ্গকে প্রতিরোধ করতে পারে। এধরনের অণুজীব এবং তাদের দ্বারা উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদানকে কাজে লাগিয়ে জীববিজ্ঞানীরা উন্নত জৈবসার (Biofertilizer) এবং জৈব-কীটনাশক (Biopesticide) তৈরি করেছেন। সুনির্দিষ্ট জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরি বলে এই সকল সার ও কীটনাশক অনেক বেশি কার্যকরী এবং পরিবেশের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি নিরাপদ।

জীবপ্রযুক্তির সবচেয়ে বড় সম্ভাবনার দিক হচ্ছে জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering)-এর প্রয়োগ। বিজ্ঞানীরা এখন জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে এক জীবের জিন অন্য জীবে স্থানান্তর করতে সক্ষম। এটি নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

জিন প্রকৌশল পদ্ধতি ব্যবহার করে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াও চলছে। যেমন—গাল্ডেন রাইস নামক একজাতের ধানগাছ উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা থেকে উৎপন্ন চালে অধিক পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। উল্লেখ্য, যে কোনো ধানগাছের পাতায় বা অন্যান্য অংশে ভিটামিন-এ প্রস্তুতের মূল উপাদান বিটা-ক্যারোটিন উৎপন্ন হলেও ধানের যে অংশটি আমরা খাই অর্থাৎ চাল বা এন্ডোস্পার্ম (Endosperm), সেখানে ভিটামিন-এ থাকে না। এই কারণে যেসব দেশে ভাত প্রধান খাদ্য, সেসকল দেশের শিশুরা যদি অন্যান্য খাদ্য থেকে ভিটামিন-এ-র জোগান না পায় তবে ভিটামিন-এ স্বল্পতাজনিত নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যার সমাধান করতেই গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করা হয়। নানা কারণে এখনও গোল্ডেন রাইস বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা না হলেও পুষ্টিচাহিদা নিরসনে এমন উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। এগুলো ছাড়াও আরও নানা ধরনের সমস্যা নিরসনে জিন প্রকৌশল তথা আধুনিক জীবপ্রযুক্তি অবদান রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্যা বা খরা সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব। বন্যা বা খরাতে অধিকাংশ উদ্ভিদ মারা গেলেও কিছু বিশেষ উদ্ভিদ এইসব প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। সেইসব উদ্ভিদের নির্দিষ্ট জিনগত তথ্য যদি কাঙ্ক্ষিত ফসলের জাতে নিয়ে আসা সম্ভব হয় তাহলে সেই জাত ঐ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের উপকূলীয় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে কোনো ধরনের চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সিরাজ দীর্ঘ ১০ বছরেরও অধিক সময়ের গবেষণায় লবণাক্ততা সহনশীল একটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন (Ahmed, ২০১৫)। দেশের খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষার্থে এধরনের গবেষণা এবং প্রযুক্তির প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

ডিএনএ বা জিনগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ফসলি উদ্ভিদ বা গবাদি পশুর নানা ধরনের রোগ দ্রুত নির্ণয় করা সম্ভব। শুধু রোগ নির্ণয়ই নয়, রোগ নিরাময়েও জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা নানা ধরনের ভ্যাকসিন বর্তমানে বিশ্বের নানা উন্নত দেশে ব্যবহার করা হচ্ছে। এভাবেই আধুনিক জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ কৃষিক্ষেত্রে নানা আঙ্গিকে নানারকম উন্নয়নমূলক ভূমিকা রাখছে (Glick et al., ২০০৯)।

৩. প্রথাগত ও আধুনিক পদ্ধতির সংমিশ্রণ

ক. লাগসই পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ : মোটামুটিভাবে খরচবিহীন বা অল্পখরচের মাধ্য বীজকে ১ বছরের জন্য সংরক্ষণ করার একটি জনপ্রিয় লাগসই পদ্ধতি এটি। এখানে বালি, চুন আর বীজ দিয়ে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঙ্গে শুকনো বিশকাটালি, নিম, নিশিন্দার পাতা গুঁড়া করে বীজের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এ প্রযুক্তিতে মাটির পাত্র, প্লাস্টিক বা টিনের পাত্র-কৌটা, কাচের বোতল, পলিথিন বা চটের বস্তা ব্যবহার করে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। পাত্রের তলায় বালি তারপর বীজ দিয়ে পুরো পাত্র ভরে দিয়ে মাঝখানে একখণ্ড শুকনো চুন ব্যবহার করা হয়।

খ. কুমড়াজাতীয় সবজির হস্তপরাগায়ন : কুমড়াজাতীয় সবজির একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল ধরে। কিন্তু আলাদা ফুল হয় বলে যথাযথ পরাগায়নের সুযোগ ও সম্ভাবনা কম থাকে। প্রাকৃতিকভাবে ভ্রমর, মৌমাছি, বাতাস বা অন্য কোনোভাবে পরাগায়ন ঘটে থাকে। কুমড়াজাতীয় সবজিতে প্রাকৃতিকভাবে পরাগায়ন হয় বলে মাত্র ৫-১০% পরাগায়িত ফুল ফলে পরিণত হয়। বাকি ৯০-৯৫% ফুল নষ্ট হয়ে ঝরে যায়। সামান্য সচেতনতা আর প্রচেষ্টায় এ ক্ষেত্রে অভাবনীয় ফল আসতে পারে। প্রতিদিন ভোরবেলা সদ্য ফোটা পুরুষ ফুল সাবধানে কেটে নিয়ে সবকটি পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলে পরাগরেণুসহ পুংকেশর আলতো করে সদ্য ফোটা স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে স্পর্শ করলে অসংখ্য পরাগরেণু স্ত্রী ফুলের পরাগদণ্ডে লেগে যাবে। অথবা পুংকেশর স্ত্রীকেশরের মাথার উপরে রেখে হাল্কা করে টোকা দিলে অসংখ্য পরাগরেণু গর্ভমুণ্ডে পড়বে। এতেই পরাগায়ন হয়ে যাবে এবং পরাগায়িত প্রতিটি স্ত্রী ফুল নিষিক্ত হয়ে সময়ের ব্যবধানে ফলে পরিণত হবে।

গ. পারচিং/খুঁটিপোঁতা : পারচিং মানে জমিতে ডাল/কাঠ, কঞ্চি এসব পোঁতা। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবকরা ফসল ব্যবস্থাপনা তথা পোকা দমনে পারচিংকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এসব ডালপালায় দিনে রাতে ফিঙে, শালিক, পেঁচা বসে ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় খেয়ে ফেলে।

ঘ. আলু/মিষ্টি আলু সংরক্ষণ : বাড়ির আঙিনায় লাগসই এ পদ্ধতিটি অনুসরণ করলে নিজের প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলু সংরক্ষণ করা যায়। বাছাই করে রোগমুক্ত, সমআকারের, অক্ষত আলুকে আলাদা করে ছায়াতে ২-৩ দিন শুকানোর পর আলু সংরক্ষণ উপযোগী হয়। ঘরের যে অংশে ছায়া বা ঠান্ডা আছে সে কোনায় মাচা বানিয়ে মাচার উপর চাটাই বিছিয়ে ১-২ ইঞ্চি শুকনা ঠান্ডা পরিষ্কার বালু রাখা হয়। বালুর উপর প্রয়োজনীয় পরিমাণ আলু রেখে তার উপর আবার বালু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এভাবে ৪-৫ মাস পর্যন্ত আলু রাখা যায়।

www.pathagar.com

ঙ. ফল পাতলাকরণ : আমাদের দেশে প্রায় সব ফলগাছে যত ফুল হয় তত ফল হয় না। আবার যত ফল হয় তত ফল টেকে না। পরীক্ষা এবং পদ্ধতিগত কৌশল প্রমাণ করে যদি গাছ ফলবান হওয়ার পরপর যৌক্তিকভাবে ফল পাতলা করে দেওয়া হয় বাকি ফলগুলো আকারে বড় এবং স্বাদে অতুলনীয় হয়। কাঁঠাল এবং পেঁপের ক্ষেত্রে ফল পাতলাকরণ অভাবনীয় ফল দিয়েছে। গাছে যখন ফুল থেকে পরাগায়ন শেষে ফল দেখা দেবে এবং প্রতিটি ফল আকারে বড় হতে থাকবে, তখন অধিকতর সাবধানতা এবং সতর্কতার সঙ্গে দুর্বল, ছোট, অসম আকারের ফলগুলোকে কেটে বা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। কাজটি যৌক্তিকভাবে সযত্নে করলে ফলচাষে বেশ লাভবান হওয়া যায়।

চ. আলোর ফাঁদ : জমিতে আলোর ফাঁদ দিয়ে পোকাকে আকর্ষণ করানো হয়। এতে পোকাগুলো আলোর কাছে আসে এবং আলোর ফাঁদের ভেতর পড়ে মারা যায়। সাধারণত সন্ধ্যার পর জমির এক পাশে হ্যাজাক লাইট, হারিকেন বা বেশি পাওয়ারের বাল্‌ব দিয়ে আলোর ফাঁদ তৈরি করা হয়। ফাঁদে ডিটারজেন্ট বা সাবানগুঁড়া মিশানো থাকে। পোকা আলোর কাছে এসে ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানিতে পড়ে মারা যায়।

ছ. ভাসমান সবজি ও চারা উৎপাদন : আমাদের দেশে কোথাও কোথাও ফসলি জমি বছরের ৬-৭ মাস কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় পানিবন্দি থাকে। ফলে সেখানে কোনো ফসল আবাদ করা যায় না। কৃষি বিভাগের সহায়তায় কৃষকরা কচুরিপানাসহ অন্যান্য লতাপাতা দিয়ে ভাসমান বীজতলা তৈরি করে সেখানে শাকসবজি ও চারা উৎপাদন করে। এটি পরিবেশবান্ধব এবং অল্পখরচেই তৈরি করা যায়।

তথ্যসূত্র

Ahmed, R. (2015, September 11). 'Four varieties of salinity tolerant rice show promise'. *The Daily Star*. p. 01.

Collard, B. C.Y. and Mackill, D. J. (2007). Marker-assisted selection: an approach for precision plant breeding in the twenty-first century. *Philosophical Transaction B.* 363 (1491), 557–572.

Glick, B. R., Pasternak, J. J., and Patten, C. L. (2009). *Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. (4th ed)*. USA: ASM Press.

GM Projukti O Khaddo-shossho

www.pathagar.com

৩. জিএম প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্য

প্রয়াস রায়

পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন প্রায় ৭.৩ বিলিয়ন। গত ১২ বছরেই এই সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১ বিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালে পৃথিবীতে প্রায় ৮.৫ বিলিয়ন মানুষ বসবাস করবে এবং ২০৫০ সালের মাঝে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ৯.৭ বিলিয়নে (UN, 2015)। দৃশ্যত জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক দ্রুততর। সার্বিকভাবে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা। মেধা, শ্রম ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে গত কয়েক দশকে কৃষিজ উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার সর্বক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক নয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে যেখানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশি, সেখানে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার সেই অনুপাতে বেশি নয়। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে সর্বশেষ এবং সর্বোত্তম উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। উন্নত দেশসমূহে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আধুনিক জীবপ্রযুক্তি তথা জিএম প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষার্থে জিএম প্রযুক্তির মতো উন্নত প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের সুচিন্তিত, সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ ও প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জিন প্রকৌশল ও জিএম শস্য

জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering) বা জিএম প্রযুক্তি হচ্ছে একধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এক জীবের জিন (Gene) অন্য জীবে স্থাপন অথবা কোনো জীবের জিনগত তথ্য পরিবর্তন করতে পারেন। জিন হচ্ছে কোনো জীবের ডিএনএ (DNA)-এর একটি অংশ যেখানে সেই জীবের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের তথ্য জৈবিক ভাষায়

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন, গোলাপফুলের প্রজাতিভেদে ফুলের পাপড়ির রং বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। এর কারণ হলো একেক প্রজাতিতে পাপড়ির রঙের জন্য দায়ী জিনে একেক রকম তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। যেহেতু জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে এক জীবের জিন অন্য জীবে নিয়ে যাওয়া যায় তাই এক জীবের একটি বৈশিষ্ট্য অন্য জীবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞানে জিন প্রকৌশলের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। অনেক ডায়াবেটিক রোগীর নিয়মিত ইনসুলিন নিতে হয়। ইনসুলিন হচ্ছে একধরনের প্রোটিন যা প্রাণিদেহের অগ্ন্যাশয়ে উৎপন্ন হয়। অতীতে ইনসুলিন সংগ্রহ করা হতো অন্যান্য প্রাণী, বিশেষ করে খাওয়ার উদ্দেশ্যে হত্যা করা গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে। এই ইনসুলিন পুরোপুরি মানুষের ইনসুলিনের মতো না হওয়ায় মানবদেহে এর কার্যকারিতা ছিল কম, কিন্তু জোগান স্বল্পতার কারণে দাম ছিল অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন এক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএতে যুক্ত করেন। এর ফলে সেই ব্যাকটেরিয়া মানুষের ইনসুলিনের মতো ইনসুলিন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। জিনগতভাবে পরিবর্তিত এই ব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে কম সময়ে এবং শ্রমে অধিক পরিমাণে উন্নতমানের ইনসুলিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে একটি জীবের মাধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন বা বিয়োজন করে মানবকল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব। ১৯৫৩ সালে বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক এবং জেমস ওয়াটসন কর্তৃক ডিএনএ-এর গঠন আবিষ্কৃত হবার পর জিন এবং জিনগত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা স্পষ্ট হতে থাকে। ফলে ডিএনএ এবং জিন নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা বাড়তে থাকে। ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম পরীক্ষাগারে জিন প্রকৌশল পদ্ধতি প্রয়োগ করে এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া তৈরি করা হয়। প্রধানত ১৯৭০-এর দশক হতে নানাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান হারে জিন প্রকৌশলের প্রয়োগ শুরু হয় (Glick, Pasternak and Patten, 2009a)।

কৃষিক্ষেত্রে জিন প্রকৌশলের সম্ভাবনা অপরিসীম। জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের জাতে জিনগত পরিবর্তন এনে ফসল বা শস্যের জাত উন্নয়ন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এধরনের জিনগতভাবে পরিবর্তিত শস্যকে বলা হয় জেনেটিক্যালি মডিফাইড (Genetically Modified) বা সংক্ষেপে জিএম শস্য (GM Crop)। বর্তমানে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে বিভিন্ন এককোষী জীব (যেমন—ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট) এবং বহুকোষী উদ্ভিদ বা প্রাণিদেহে জিনগত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। উদ্ভিদ বা প্রাণী নির্বিশেষে যে কোনো জীব যার মধ্যে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনগত পরিবর্তন করা হয়েছে তাদের জেনেটিক্যালি মডিফাইড অরগানিজম (Genetically Modified Organism) বা সংক্ষেপে জিএমও (GMO) বলা হয়। জিএমও থেকে উৎপন্ন অথবা সরাসরি জিএমও বা জিএমও থেকে আগত কোনো উপাদান ব্যবহার করে তৈরি যে কোনো খাবারকেই জিএম খাদ্য (GM Food) বলা হয় (Zaid, Hughes, Porceddu and Nicholas, 2001)। সুতরাং জিএম শস্য থেকে তৈরি সকল খাদ্যই জিএম খাদ্য।

একটি সফল জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বেশ কয়েক বছরের গবেষণা দরকার হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যেসব জিএম শস্য চাষ হচ্ছে, তার অনেকগুলোই কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী অর্থাৎ কীটপতঙ্গ এসব উদ্ভিদে আক্রমণ করে সফল হতে পারে না। কীভাবে একটি উদ্ভিদকে

www.pathagar.com

কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী করে তোলা যায়? ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস (Bacillus thuringiensis) নামক এক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া আছে, যারা একধরনের প্রোটিন অণু তৈরি করে, যা লেপিডোপ্টেরন (Lepidopteron) গোত্রের কীটপতঙ্গের জন্য বিষাক্ত। ঐ ব্যাকটেরিয়ার নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী ঐ প্রোটিনের নামকরণ হয়েছে বিটি টক্সিন (Bt toxin)। ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েন্সিস ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএতে অবস্থিত যে জিনটির কারণে বিটি টক্সিন উৎপন্ন হয় তার নাম ক্রাই জিন (Cry gene)। ক্রাই শব্দাংশটি এসেছে ইংরেজি crystal শব্দ থেকে। বিটি টক্সিন মূলত একধরনের crystal বা স্ফটিকাকার প্রোটিন, তাই এ ধরনের নামকরণ। বিজ্ঞানীরা ব্যাকটেরিয়ার ক্রাই জিন সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে নির্দিষ্ট শস্য প্রজাতি বা উদ্ভিদকোষের ডিএনএতে যুক্ত করেছেন। পরবর্তীতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ওই কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয়। এভাবে উৎপন্ন উদ্ভিদের প্রতিটি কোষে ক্রাই জিন উপস্থিত থাকায় উদ্ভিদটির প্রতি অংশে বিটি টক্সিন উৎপন্ন হয়। এধরনের উদ্ভিদে লেপিডোপ্টেরন গোত্রের কোনো পতঙ্গ আক্রমণ করলে সেই পতঙ্গ মারা যাবে। উল্লেখ্য, লেপিডোপ্টেরন গোত্রের কীটপতঙ্গ বিভিন্ন ফসলি জাতের নানা ধরনের রোগের জন্য দায়ী। এভাবে ক্রাই জিন সংযুক্ত করার মাধ্যমে অনেকগুলো জিএম শস্য তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে বিটি ভুট্টা, বিটি সয়াবিন, বিটি তুলা ইত্যাদি অন্যতম।

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী ছাড়াও অন্যান্য অনন্য বৈশিষ্ট্যের জিএম শস্য তৈরি করা হয়েছে, যেমন—

- **আগাছানাশক (Herbicide) প্রতিরোধী শস্য উদ্ভিদ :** জমিতে আগাছা নির্মূল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের আগাছানাশক রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এতে আগাছা প্রতিরোধ করা গেলেও শস্য উদ্ভিদের বেশ ক্ষতি হয়। আগাছানাশক প্রতিরোধী শস্য জাত আবিষ্কারের ফলে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।
- **ভাইরাস (Virus) প্রতিরোধী উদ্ভিদ :** হাওয়াইতে পেঁপের একটি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা আক্রমণকারী ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম।
- **উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন শস্য উদ্ভিদ :** উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন জিএম শস্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ, গোল্ডেন রাইস (Golden rice) নামক ধানের প্রজাতি যা থেকে উৎপন্ন চালে অধিক পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে।
- **ঘাত সহনশীল (Stress tolerant) শস্য উদ্ভিদ :** বন্যা, খরা, মাটির লবণাক্ততা ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক কারণে ফসলের উৎপাদন নানাভাবে ব্যাহত হয়। জিন প্রকৌশলকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকতে সক্ষম শস্যের জাত উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি প্রসারের কাজসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন।

এক্ষেত্রে এ বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে জিএম প্রযুক্তি বলতে শুধু এক জীবের জিন অন্য জীবে স্থাপন করাকেই বোঝায় না। অনেকক্ষেত্রে কোনো জিনের প্রতিস্থাপন ছাড়াই একটি জীবের নির্দিষ্ট জিনের কার্যক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা শুরু বা বন্ধ করার মাধ্যমে সে জীবের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা যায় যা জিএম প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত। জিএম প্রযুক্তি এবং সংকরায়ন

www.pathagar.com

(Hybridization) প্রক্রিয়ার পার্থক্য হচ্ছে, সংকরায়ন প্রক্রিয়ায় একই প্রজাতির দুটি কাছাকাছি এবং উন্নত জাতের জীবের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাত তৈরি করা হয়। জিন প্রকৌশল বা জিএম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রজাতির সীমাবদ্ধতা নেই। অণুজীব থেকে বহুকোষী জীব, প্রাণী থেকে উদ্ভিদ কিংবা উদ্ভিদ থেকে প্রাণী সর্বক্ষেত্রে জিন প্রকৌশল সম্ভব যদি তাদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকে (Glick, Pasternak & Patten, 2009b)।

বিশ্বব্যাপী জিএম শস্য চাষাবাদের সার্বিক চিত্র

২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে ১৮ মিলিয়ন কৃষক জিএম শস্য উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত (James, 2013)। ১৯৯৬ সালে যেখানে মাত্র ১.৭ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে জিএম শস্যের চাষ বাদ হতো, ২০১৩ সাল নাগাদ সেই জমির পরিমাণ গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭৫.২ মিলিয়ন হেক্টরে। অর্থাৎ ১৯৯৬ থেকে ২০১৩, এই ১৮ বছরে জিএম শস্য চাষকৃত জমির পরিমাণ ১০০ গুণেরও বেশি বেড়েছে। ২০১৩ সালে জিএম শস্য উৎপাদনকারী ২৭টি দেশের মাঝে ১৯টি-ই ছিল উন্নয়নশীল দেশ এবং বাকি ৮টি ছিল শিল্পোন্নত দেশ। বর্তমানে ৩০টির মতো দেশ জিএম শস্য উৎপাদন করছে। আশাব্যঞ্জক ব্যাপার হচ্ছে, এই কৃষকদের অধিকাংশই প্রায় ১৬.৫ মিলিয়ন হচ্ছে গরিব এবং প্রান্তিক শ্রেণির কৃষক, যারা বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে। জিএম শস্য চাষাবাদ শুরুর প্রথম দিকে উন্নত দেশগুলোতে উৎপাদনের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হলেও বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জিএম শস্য উৎপাদনের মোট পরিমাণ উন্নত দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। জিএম শস্য উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৭০ মিলিয়ন হেক্টরেরও বেশি জমিতে জিএম ভুট্টা, সয়াবিন, তুলা, ক্যানোলা, সুগারবিট, পেঁপেসহ অন্যান্য জিএম শস্য উৎপাদিত হচ্ছে (James, 2013, p. 3)। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত ভুট্টার ৯২%, সয়াবিনের ৯৪%, তুলার ৯৪% হচ্ছে জিএম প্রজাতি (USDA, 2015)। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমারে যথাক্রমে প্রায় ১১.০, ২.৮ এবং ০.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বিটি তুলার চাষ হচ্ছে। ফিলিপাইনে বিটি ভুট্টার চাষ হচ্ছে (James, 2013, p. 3)। যুক্তরাষ্ট্র তথা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোতে জিএম প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার হলেও ইউরোপে নানা কারণে এই প্রযুক্তির আশানুরূপ ব্যাপ্তি ঘটেনি। এর পেছনে বিভিন্ন আইনি জটিলতা, ইউরোপিয়ানদের রুচি এবং চিন্তাভাবনা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তবে বিশ্বব্যাপী জিএম শস্য উৎপাদন সম্প্রসারণের বর্তমান গতি নিঃসন্দেহে জিএম প্রযুক্তিকে গত কয়েক যুগ ধরে উদ্ভাবিত কৃষিজ প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রাখবে।

জিএম শস্য এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে আধুনিক সংকরায়ন বা hybridization পদ্ধতি ব্যবহার করে নানা ধরনের উচ্চ ফলনশীল, রোগপ্রতিরোধী এবং অন্যান্য আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের হাইব্রিড ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ধানের বেশ কয়েকটি অধিক ফলনশীল জাত (যেমন–ব্রি ধান২৯, ব্রি ধান২৮ ইত্যাদি)-এর কথা বলা যায়। উল্লেখ্য, এসব হাইব্রিড

www.pathagar.com

শস্য কিন্তু জিএম শস্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। হাইব্রিড শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেলেও জিএম শস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অগ্রগতি তেমন নয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুমোদনপ্রাপ্ত একমাত্র জিএম শস্য হচ্ছে বিটি বেগুন। সাধারণ বেগুনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে ফল ও ডগা ছিদ্রকারী (Fruit and shoot borer) পোকা। তবে এই পোকা বিটি বেগুনের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। ২০১৩ সালের ৩০ অক্টোবর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনা এবং সুপারিশ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার বিটি বেগুনের চারটি জাত সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার আওতায় মাঠ পর্যায়ে সীমিত আকারে চাষাবাদের অনুমতি দেয় (MOEF, 2013)। মাঠ পর্যায়ে বিটি বেগুন চাষাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২৯তম দেশ হিসেবে জিএম শস্য উৎপাদনকারী দেশের খাতায় নাম লেখায় (Daily Star, 2014)। বর্তমানে বাংলাদেশে অন্য কোনো জিএম শস্য বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। তবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে ব্রি ধান২৯ এবং ২৮-এর মধ্যে গোল্ডেন রাইসের প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রিনহাউজে পরীক্ষার পর বর্তমানে এদের মাঠ পর্যায়ে সীমাবদ্ধভাবে পরীক্ষা (Confine field trial) চলছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে লেট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী আলুর জাত নিয়ে গবেষণা চলছে (Hossain, 2013; Hasan, Khan and Ivy, 2007)। ২০১৫ সালের জুলাই মাস হতে শ্রীপুর তুলা খামারে বিটি তুলার পরীক্ষামূলক গ্রিনহাউজ চাষাবাদ শুরু হয়েছে (Bt Cotton, 2015)।

বাংলাদেশে অনুমোদনপ্রাপ্ত বিটি বেগুনের জাত চারটি মূলত দেশীয় বেগুনের জাত উত্তরা, কাজলা, নয়নতারা এবং ISD-006 সমূহে বিটি প্রযুক্তি যুক্ত করার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। ২০০৫ সালে ভারতীয় বীজ কোম্পানি মাহিকো (Mahyco) বেগুনের বিটি প্রযুক্তি, ইউএসএআইডি (USAID)-এর অ্যাগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি সাপোর্ট প্রোগ্রাম-২ (ABSP-II)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটকে প্রদান করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং মাহিকোর মধ্যে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কিংবা ব্যবসায়িক শর্ত নেই। বাংলাদেশে উৎপন্ন দেশীয় জাতের বিটি বেগুন জাতসমূহের মালিকানা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের। এই বিটি বেগুনের জাতগুলো ওপেন পলিনেটেড (Open pollinated) হওয়ায় বা হাইব্রিড (hybrid) না হওয়ায় কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ করতে পারবে (ABSP-II, 2005; Choudhary, Nasiruddin and Gaur, 2014)। ফলে বীজ ক্রয়ের জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপর কৃষকদের নির্ভরশীলতা কমে আসবে এবং তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

২০১৪ সালের ২২ জানুয়ারি, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বাংলাদেশের চারটি অঞ্চল—গাজীপুর, জামালপুর, পাবনা এবং রংপুরের ২০ জন কৃষকের মাঝে বিটি বেগুনের চারা বিতরণ করেন। প্রতি কৃষককে মোট ১ হাজার ১৪০টি চারা বিতরণ করা হয়, সব মিলিয়ে যা প্রায় ২ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত (Daily Star, 2014)। ২০১৪ সালেরই অক্টোবর মাসে ১৭টি জেলায় ১০৮ জন কৃষককে বিটি বেগুনের চারা সরবরাহ করা হয়। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিটি বেগুন নিয়ে তাদের সফলতা তুলে ধরে। তাদের মতে ফল এবং ডগা ছিদ্রকারী (Fruit and shoot borer) পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার মাধ্যমে বিটি বেগুনের চারটি জাত—উত্তরা, কাজলা,

www.pathagar.com

নয়নতারা এবং ISD-006 থেকে যথাক্রমে গড়ে ৬৬%, ৬৮%, ৪০% এবং ১০০% বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এই সফলতার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বর্তমান বছরের রবি মৌসুমে বিটি বেগুনের আরও ৩টি নতুন জাত (দোহাজারী, সিংনাথ, খাটখাটিয়া) মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদ শুরু করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। এই নতুন ৩টি জাতসহ আগের ৪টি জাতের চারাগাছ প্রায় ২০০ কৃষকের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আগামী বছর বিটি বেগুনের আরও ২টি জাতের চাষাবাদ শুরু করার ব্যাপারে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করে (The Financial Express, 2015); (New Age, 2015).

জিএম শস্যের সুফল ও সীমাবদ্ধতা

যেসব জিএম শস্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চাষ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে চাষাবাদের জন্য চিন্তা করা হচ্ছে তাদের সুফলের দিকগুলো সুস্পষ্ট। যেমন—যে সকল শস্য উদ্ভিদে ক্রাই জিন সংযুক্ত করা হয়েছে তারা নির্দিষ্ট গোত্রের কীটপতঙ্গকে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে ফসলের ক্ষতি কমিয়ে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। যেহেতু সকল ধরনের কীটপতঙ্গ এই প্রযুক্তি দ্বারা প্রতিরোধ করা যায় না, সেহেতু কীটনাশকের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব না হলেও কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পাবে যা মানুষ এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য কল্যাণকর। শুধু ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতেই জিএম প্রযুক্তির সুফল সীমাবদ্ধ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাজারজাতকরণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রথম জিএম শস্য ছিল মূলত একধরনের টমেটো, যার নাম ফ্লেবার সেভার (Flavr savr) টমেটো। এই টমেটোর বৈশিষ্ট্য ছিল এটি পেকে যাবার পর ধীরে ধীরে নরম হতো বা পচন প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু হতো। এর ফলে এই টমেটো দীর্ঘদিন সংরক্ষণ এবং দূরদুরান্তে পরিবহন করে নেওয়া সম্ভব (Bruening and Lyons, 2000)। ২০১৪ সালের নভেম্বরে USDA আলুর একটি জিএম জাত অনুমোদন করে যে আলু তেলে ভাজলে সাধারণ আলুর তুলনায় কম অ্যাক্রাইলামাইড (acrylamide) উৎপন্ন হয় (Pollack, 2014)। উল্লেখ্য, অ্যাক্রাইলামাইড হচ্ছে একধরনের রাসায়নিক যৌগ যা ক্যান্সার হবার আশঙ্কা অনেকাংশে বৃদ্ধি করে। উন্নয়নশীল যে সকল দেশে ধান প্রধান খাদ্যশস্য, সেসব দেশের নাগরিকদের ভিটামিন-এ স্বল্পতাজনিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে গোল্ডেন রাইস বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এভাবে প্রতিটি আলাদা আলাদা জিএম শস্যের আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট গুণাগুণ আছে।

সার্বিকভাবে জিএম শস্যগুলোর সুফল ও সম্ভাবনার দিকগুলো নিম্নোক্তভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—

১. কীটপতঙ্গ, রোগব্যাধি এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি কমিয়ে ফসলের মোট উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

২. কীটনাশক এবং নানারকম সারের ব্যবহার কমিয়ে শস্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস।

৩. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

৪. সর্বোপরি, শস্যের পরিমাণ, খাদ্যমান ও পুষ্টিগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিশ্বজনসংখ্যার খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

জিএম প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে, সকল প্রযুক্তির কিছু না-কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। জিএম প্রযুক্তির সম্ভাবনা অনেক কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি সকল সমস্যার সমাধান নয়। তাছাড়া এ প্রযুক্তির অপরিকল্পিত এবং অদূরদর্শী প্রয়োগ নানাধরনের ক্ষতিসাধন করতে পারে। জিএম প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করার আগে কিছু বহুল আলোচিত প্রশ্নের উত্তর জেনে রাখা প্রয়োজন।

ক. জিএম খাদ্য কি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর?

অনেকেই মনে করে জিএম খাদ্য মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে অনেকেরই ধারণা হলো বিটি শস্য যেগুলো কীটপতঙ্গকে মেরে ফেলতে সক্ষম সেসব শস্য মানুষের দেহেও বিষাক্ততা তৈরি করে পারে। কিন্তু এটা প্রমাণিত যে বিটি টক্সিন বিষাক্ততা সৃষ্টি করার জন্য যে পরিবেশ এবং নির্দিষ্ট রিসেপ্টর (Receptor) দরকার হয়, তা কিছু নির্দিষ্ট ক্ষতিকর কীটপতঙ্গেই আছে। বিটি টক্সিন তাই উপকারী কীটপতঙ্গের কোনো ক্ষতি করে না। মানবদেহের উপর বিটি শস্যসমূহের ক্ষতিকারক কোনো প্রভাব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় খুঁজে পাওয়া যায়নি (Mendelsohn, Kough, Vaituzis and Matthews, 2003)। তবে প্রতিটি জিএম শস্যতেই যেহেতু জিনগত পরিবর্তনের ধরন আলাদা তাই একটি শস্য নিরাপদ হলেই অন্য আরেকটি জিএম শস্য নিরাপদ প্রমাণিত হবে তা নয়। সুতরাং প্রতিটি জিএম শস্য আলাদা আলাদা পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। বর্তমানে অনুমোদিত সকল জিএম শস্যকেই নানাধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়েছে। তাই এই সকল জিএম শস্য মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হবার কথা নয়। মূলত যে কোনো নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাবেই সেই প্রযুক্তি নিয়ে কিছু সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। যেমন, হাইব্রিড শস্যগুলো যখন প্রথম বাজারে আসে তখন এদের নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন প্রশ্ন এসেছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে সকল শস্য বা সবজি (যেমন–চাল, গম, বেগুন, টমেটো, শসা ইত্যাদি) খাই তার অধিকাংশই হাইব্রিড জাত। হাইব্রিড ফসল খাওয়ার জন্য আমাদের কোনো ক্ষতি হয়েছে এমন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায়নি। জিএম প্রযুক্তির মতো হাইব্রিড প্রযুক্তিতেও জিনগত পরিবর্তন হয়, তবে জিএম প্রযুক্তি অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং সুনির্দিষ্ট। মূলত সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমরা জিএম শস্য নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মাত্রাতিরিক্ত সন্দিহান, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কাম্য নয়।

খ. জিএম শস্য কি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক?

আধুনিক কৃষিব্যবস্থা তথা কিছু উন্নত বা আর্থিকভাবে অধিক লাভজনক প্রজাতির উচ্চহারে চাষাবাদ জীববৈচিত্র্যের জন্য কমবেশি হুমকিস্বরূপ। উন্নত জাত আবিষ্কারের ক্রমাগত ধারায় অনেক আগে থেকেই নানাধরনের আঞ্চলিক জাত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জিএম শস্যসমূহের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। জিএম শস্যের নানাবিধ গুণের কারণে কৃষকেরা এই ধরনের শস্য চাষে বেশি আগ্রহী হবে এবং তাতে করে অন্য শস্যগুলোর চাষাবাদ কমতে থাকবে। এটি মূলত প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা নয়, বরং মানুষের চাহিদা এবং জোগানের অসামঞ্জস্য থেকে সৃষ্ট সমস্যা। জিএম শস্যসমূহ নানা ধরনের উপকারী কীটপতঙ্গের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বলে অনেকের

www.pathagar.com

ধারণা। যেমন, ১৯৯৯ সালে একটি গবেষণাপ্রবন্ধে উত্তর আমেরিকায় মোনার্ক প্রজাপতি কমে যাবার পেছনে বিটি ভুট্টা চাষাবাদকে দায়ী করা হয় (Losey, Rayor and Carter 1999)। তবে ২০০১ সাল নাগাদ এটি পরিষ্কার হয় যে মোনার্ক প্রজাপতির সংখ্যা কমে যাবার জন্য বিটি ভুট্টা আবাদের প্রভাব অত্যন্ত তুচ্ছ (Sears et al., 2001)। আবাসস্থল ও খাদ্যের অভাব, কীটনাশকের ব্যবহার ইত্যাদি নানা কারণে মোনার্ক প্রজাপতির সংখ্যা এমনিতেই দিন দিন কমে যাচ্ছে। গবেষণা থেকে দেখা যায়, নানা ধরনের অক্ষতিকর কিংবা উপকারী কীটপতঙ্গের সংখ্যা বিটি শস্যের ক্ষেতগুলোতেই তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে কেননা এসব খেতে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ কম (Marvier, McCreedy, Regetz and Kareiva, 2007)।

গ. জিএম শস্যের মেধাস্বত্বসংক্রান্ত বিষয়গুলো কি কৃষকদের নৈতিক অধিকার কেড়ে নেবে?

এটা সত্য যে জিএম শস্যের মেধাস্বত্বসংক্রান্ত জটিলতা সাধারণ কৃষকদের ঝামেলায় ফেলতে পারে। বেশিরভাগ জিএম শস্য বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির বিনিয়োগে উৎপন্ন হয়েছে। এই কোম্পানিগুলো তাদের বিনিয়োগের বিপরীতে লাভের ব্যাপারটি সর্বদাই মাথায় রাখবে। এটি ভুলে গেলে চলবে না, আর্থিক প্রণোদনা ব্যতীত কোনো নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব এবং প্রসার ঘটে না। বাংলাদেশে বিটি বেগুন এবং গোল্ডেন রাইসের মতো প্রজেক্টগুলো মূলত উন্নয়নশীল দেশে উন্নত কৃষিব্যবস্থা এবং গণস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত দেশসমূহের সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের দেশীয় জাতে জিএম প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তকরণসংক্রান্ত গবেষণাগুলো সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোনো কোম্পানির সঙ্গে কোনোধরনের ব্যবসায়িক শর্ত না থাকায়, বাংলাদেশের কৃষকরা এসব ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। ভবিষ্যতে নতুন কোনো জিএম শস্য চাষাবাদ শুরুর ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব, বীজস্বত্বসংক্রান্ত বিষয়গুলো সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই করে সর্বোত্তম নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এসব সিদ্ধান্ত এবং খাদ্যনিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তির প্রসার এই দুইয়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য ভারসাম্য থাকতে হবে যাতে সর্বোপরি দেশের স্বার্থ রক্ষিত হয়।

এসব নীতিনির্ধারণী জটিলতার বাইরে জিএম শস্যের কিছু বৈজ্ঞানিক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রকৃতিতে অবস্থানরত প্রতিটি জীব সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হয়। কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী যে সকল জাত বর্তমানে উদ্ভাবিত হয়েছে, এগুলো আজীবনের জন্য কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী হয়ে গেছে তা বলা যাবে না। বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে প্রাকৃতিক উপায়ে জিনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সংবেদনশীল কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। সুতরাং অধিকাংশ জিএম শস্যের আশানুরূপ কার্যদক্ষতার একটি সময়কাল আছে। এর মানে হচ্ছে বর্তমানে যেসব জাত কীটপতঙ্গ বা আগাছানাশককে প্রতিরোধ করতে সক্ষম সে জাতগুলো আজ থেকে ৩০-৪০ বছর পরে একইরূপ প্রতিরোধ দেখাতে সক্ষম নাও হতে পারে। তবে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করে চাষাবাদ করলে এই সময়কালকে দীর্ঘায়িত করা যায়। যেমন, জিএম শস্যের খেতে নির্ধারিত মাত্রায় একই প্রজাতির নন-জিএম (Non-GM) শস্য চাষ করলে কীটপতঙ্গের বিবর্তনের গতিকে অনেকটা রোধ করা যায়। যেকোনো কিছুই সময়ের সঙ্গে কার্যক্ষমতা

www.pathagar.com

হারায়, তাই গবেষণার প্রক্রিয়াটি চলমান রাখতে হয়। বিজ্ঞানীরা বিটি টক্সিনের মতো গুণাবলিসমৃদ্ধ অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের সন্ধান করে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে বিটি টক্সিনের কার্যকারিতা হ্রাস পেলে অন্যান্য উপাদান নিয়ে বিকল্প চিন্তা করা যেতেই পারে। আরেকটি দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে প্রকৃতিতে এক জীব থেকে অন্য জীবে জিন স্থানান্তর হতে পারে, যদিও প্রক্রিয়াটি বেশ সময়সাপেক্ষ। যদি জিএম শস্যে সংযুক্ত জিন অন্য উদ্ভিদ বা প্রাণীতে চলে যায় তাহলে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে। যেমন, আগাছানাশক প্রতিরোধের জিন যদি আগাছা উদ্ভিদেই চলে যায়, তাহলে সেই আগাছাকে পরবর্তীতে আর আগাছানাশক দিয়ে নিধন করা সম্ভব হবে না। এই ধরনের আগাছাকে বলা হয় সুপার উইড (Super weed)। সুপার উইড উৎপন্ন হবার সম্ভাব্যতা আগাছানাশক প্রতিরোধী শস্যের প্রধান সীমাবদ্ধতা। বর্তমানে অনুমোদিত আগাছানাশক প্রতিরোধী জাতগুলো মূলত গ্লাইফসেট (Glyphosate) নামক আগাছানাশককে প্রতিরোধ করতে পারে। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত আগাছানাশকগুলোর মধ্যে গ্লাইফসেটই তুলনামূলক সবচেয়ে নিরাপদ। এই কারণে অন্যান্য আগাছানাশক ব্যবহারের চেয়ে গ্লাইফসেট প্রতিরোধী শস্য এবং গ্লাইফসেটের ব্যবহার জীববৈচিত্র্য এবং মানবস্বাস্থ্যের জন্য একটি ভালো পদক্ষেপ। তবে গ্লাইফসেট প্রতিরোধী আগাছার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় ভবিষ্যতে মানবস্বাস্থ্যের জন্য তুলনামূলক নিরাপদ অন্য আগাছানাশক খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। এধরনের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জিএম শস্যগুলো আমাদের যে সুবিধা দিচ্ছে বা ভবিষ্যতে দিতে পারে, তা অতুলনীয়। একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় জিএম শস্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর অধিকাংশই এই প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত সমস্যা নয়, বরং নীতি-নির্ধারণী, প্রায়োগিক এবং নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত জটিলতা থেকে উদ্ভূত সমস্যা। সঠিক ও সময়োপযোগী জ্ঞান, সিদ্ধান্ত এবং তার প্রয়োগের মাধ্যমে জিএম শস্যসংক্রান্ত নেতিবাচক ধারণা এবং সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

উপসংহার

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বিটি তুলাচাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে বেশ লাভবান হয়েছে, কিন্তু দুঃখজনকভাবে সেই ভারতেই বিটি বেগুনের উপর স্থগিতাদেশ বহাল আছে। ফিলিপাইনেও বাণিজ্যিকভাবে বিটি বেগুনের চাষ শুরু করা যায়নি, যদিও সেই একই দেশে বিটি ভুট্টাচাষ হচ্ছে। অথচ এই ফসলগুলোতে একই ধরনের জিনগত পরিবর্তন করা হয়েছে। সে কারণেই একটির অনুমোদন এবং অন্যটিতে স্থগিতাদেশের ব্যাপারগুলো বিভ্রান্তিকর। ভারত এবং ফিলিপাইন উভয় দেশই জিএম শস্য চাষাবাদের ফলে আর্থিক ও সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছে। তবু নতুন জিএম শস্যচাষের ক্ষেত্রে দেশ দুটির নেতিবাচক অবস্থানের পেছনে কিছু গোষ্ঠী ও মহলের মিথ্যা, অবৈজ্ঞানিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার-প্রচারণাকে দায়ী করা যায়। বিটি বেগুনের উদ্ভাবন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতে সম্পন্ন হয়েছে। এসব গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে ২০০৯ সালে ভারতের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রুভাল কমিটি বিটি বেগুনকে পরিবেশের জন্য নিরাপদ বলে ঘোষণা করে, যদিও তাদের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিটি বেগুনের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। এই স্থগিতাদেশের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করে কিছু এনজিও এবং জিএম প্রযুক্তিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারণা। কী উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

এধরনের প্রচারণা পরিচালিত হয় তা স্পষ্ট নয়, তবে ২০১৪ সালে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো কর্তৃক তাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাখিলকৃত এক রিপোর্টে দেখা যায়, এধরনের এনজিওগুলো জিএম প্রযুক্তির বিরোধিতা করার জন্য দেশি-বিদেশি উৎস থেকে প্রচুর অর্থ পায় (Gupta, Choudhary & Gheysen, 2015)। বাংলাদেশেও কিছু প্রতিষ্ঠান সক্রিয় আছে, যারা জিএম প্রযুক্তি নিয়ে নানা ধরনের ভ্রান্তধারণা ও বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত বিটি বেগুনের চাষাবাদ সম্প্রসারণ করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থানে আছে। উন্নত প্রযুক্তির সম্প্রসারণে সরকারের এই অবস্থান প্রশংসার দাবি রাখে। তবে একই সঙ্গে সরকারকে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এ লক্ষ্যে জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিকে (এনসিবি) শক্তিশালী করতে হবে। সরকারের জীবপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন—ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজিতে (এনআইবি) লোকবল ও গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় জোরদার করতে হবে। জিএম প্রযুক্তির উপর সরকারের সঠিক ও যুগোপযোগী নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং কৃষকের স্বার্থ রক্ষিত হলে এই প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র

ABSP-II. (2005). *Fruit and Shoot Borer Resistant Eggplant- Fact Sheet.* Agricultural Biotechnology Support Project II (ABSPII), Cornell University, Ithaca, NY.

BT Cotton [Cotton Development Board]. (2015, March 9). Retrieved November 24, 2015, from http://www.cdb.gov.bd/site/news/afc4cee5-7a9b-4351-9632-f25c311087f5/nolink/বটিতুলা

Bruening, G.and Lyons, J. M. (2000). The case of the FLAVR SAVR tomato. *California Agriculture*, 54(4), 6-7.

Choudhary, B., Nasiruddin K. M. and Gaur, K. (2014). *The status of commercialized Bt brinjal in Bangladesh.* ISAAA Brief no. 47. ISAAA: Ithaca, NY

Glick, B. R., Pasternak, J. J., Patten, C. L. (2009a). The development of molecular biotechnology. In *Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA.* (4th ed., pp. 3-13). USA: ASM Press.

Glick, B. R., Pasternak, J. J., Patten, C. L. (2009b). Engineering plants to overcome biotic and abiotic stress. In *Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA.* (4th ed., pp. 759-802). USA: ASM Press.

Gupta, P.K., Choudhary, B. and Gheysen, G. (2015). 'Removing Bt eggplant from the face of Indian regulators'. *Nature Biotechnology*, 33(9), 904-907. DOI:10.1038/nbt.3331

Hasan, M., Khan, M. I., and Ivy, N. A., (2007). 'Agricultural Biotechnology and proverty reduction in south Asia'. *Progressive Agriculture*, 18(2), 247-254.

Hossain, M. S. (2013, December 23). 'Golden Rice in Bangladesh'. *New Age.* Retrieved October 29, 2015, from http://www.thefinancialexpress-bd.com/2013/12/23/10098.

James, C., (2013). *Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013.* ISAAA Brief No. 46. ISAAA: Ithaca, NY.

Losey, J. E., Rayor, L. S. and Carter, M. E. (1999). Transgenic pollen harms monarch larvae. *Nature,* 399(6733), 214.

Marvier, M., McCreedy, C., Regetz, J., & Kareiva, P. (2007). A Meta-Analysis of Effects of Bt Cotton and Maize on Nontarget Invertebrates. *Science*, 316 (5830), 1475–1477. DOI: 10.1126/science.1139208.

www.pathagar.com

Mendelsohn, M., Kough, J., Vaituzis, Z. & Matthews, K., (2003). Are Bt crops safe? *Nature Biotechnology*, 21(9), 1003-1009.

MOEF. (2013). *Gazette for Bt Brinjal-1, 2, 3, 4.* Environment subsection-2, Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of the People's Republic of Bangladesh.

New Age. (2015, July 28). Despite failure, BARI going to release more Bt Brinjal varieties. *New Age.* Retrieved November 01, 2015, from http://newagebd.net/141619/despite-failure-bari-going-to-release-more-bt-brinjal-varieties/

Pollack, A. (2014, November 8). U.S.D.A. Approves Modified Potato. Next Up: French Fry Fans. *The New York Times*, p. B1.

Sears, M. K., Hellmich, R. L., Stanley-Horn, D. E., Oberhauser, K. S., Pleasants, J. M., Mattila, H. R., Siegfried, B. D., & Dively, G. P., (2001). Impact of Bt corn pollen on monarch butterfly populations: A risk assessment. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 98(21), 11937-11942. DOI: 10.1073/pnas.211329998

The Daily Star. (2014, January 23). Modified brinjal goes to farmers. *The Daily Star.* Retrieved November 01, 2015, from http://www.thedailystar.net/modified-brinjal-goes-to-farmers-8088

The Financial Express. (2015, July 29). BARI set to release three BT Brinjal varieties this yr. *The Financial Express*, p. 23.

UN. (2015). *World Population Prospects: The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables.* Working Paper No. ESA/P/WP.241. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

USDA. (2015). *Data Set- Genetically engineered (GE) corn varieties by State and United States, 2000-2015.* United states Department of Agriculture (USDA), Economic Research Service.

Zaid, A., Hughes, H. G., Porceddu, E. and Nicholas, F. (2001). *Glossary of Biotechnology for Food and Agriculture - A Revised and Augmented Edition of the Glossary of Biotechnology and Genetic Engineering.* FAO Research and Technology paper no. 9. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪. এনজিও ও কৃষি

মো. রেজাউল হক

এনজিও শব্দটি ননগভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনের সংক্ষেপিত রূপ। বাংলায় বেসরকারি সংস্থা। এনজিও সাধারণত সরকারের অংশ নয় এবং প্রচলিত কোনো মুনাফামুখি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকে না। সাধারণ নাগরিক বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বিশেষ কোনো সামাজিক উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ ধরনের সংস্থা গড়ে তোলেন। সরকার, দাতা সংস্থা, ফাউন্ডেশন, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির অর্থায়নে এনজিওর কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এনজিওগুলো বহুমাত্রিক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এনজিওকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা কিছুটা জটিল, কারণ একেক দেশে এই ধরনের সংস্থার বৈশিষ্ট্য ও কার্যপ্রণালি একেক রকম। কোথাও এরকম সংস্থাকে এনজিও বলা হয়, আবার কোথাও এটা অলাভজনক সংস্থা বা নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন (এনপিও), স্বেচ্ছাসেবী, দাতব্য সংস্থা ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত।

The Social Work Dictionary এনজিওকে সংজ্ঞায়িত করেছে অলাভজনক এবং জনস্বার্থে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত আর্থিক লাভের চেয়ে কিছু সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এনজিও ধারণাটি সাধারণত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক সামাজিক সংস্থার জন্য সংরক্ষিত। মালিকানাধীন বা স্বত্বাধিকারী লাভজনক সামাজিক সংস্থা এনজিও নয় (Barker, 1995)।

এনজিওর কাজের ক্ষেত্র, কর্মপরিধি ও ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর এগুলোকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়। মানবাধিকার সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবার প্রসার, দারিদ্র্য হ্রাস ইত্যাদি বিশেষায়িত ইস্যুকে কেন্দ্র করে এনজিও গড়ে উঠতে পারে এবং বিশেষায়িত ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিচিত হতে পারে। যেমন–মানবাধিকার সংস্থা, পরিবেশবাদী সংস্থা ইত্যাদি। আবার ভৌগোলিক কর্ম-এলাকার উপর ভিত্তি করে এগুলো স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থা নামেও পরিচিত হতে পারে। কাজের ধরন বা কর্ম-এলাকা নির্বিশেষে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে বাধ্যতামূলক সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিবন্ধন নিতে হয়।

www.pathagar.com

১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ সৃষ্টি হওয়ার পর এনজিও প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়। জাতিসংঘ বিশেষায়িত কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তাদের সম্মেলন ও সভা পর্যবেক্ষণের অনুমোদন দেয়। এসব সংস্থা রাষ্ট্র বা সরকারের অধীনস্থ নয়। পরবর্তীতে এধরনের সংস্থা এনজিও নামে পরিচিতি পায়। ১৯৪৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘ সনদের ৭১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বেসরকারি সংস্থাগুলোর পরামর্শ লাভের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। জাতিসংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গেও একই ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে (শহীদুল্লাহ, ২০১৩)।

জাতিসংঘ সনদের ৭১ নং অনুচ্ছেদ এনজিওর আইনগত ভিত্তি। একারণে কোনো দেশের সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা এনজিওগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য (শহীদুল্লাহ, ২০১৩, পৃ. ২৭৯)।

এনজিও কার্যক্রমের প্রধান দুটি দিক হলো–জীবিকাকেন্দ্রিক ও মানবাধিকারকেন্দ্রিক। জীবিকাকেন্দ্রিক কার্যক্রমে বহুল অনুসৃত একটি ধারার নাম টেকসই জীবিকায়ন (Sustainable Livelihood Approach-SLA)। জীবিকাকেন্দ্রিক ধারা দরিদ্র মানুষদের জীবনোপায় সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য সহায়ক। এ ধারায় মানুষের জীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এসব উপাদানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ ধারার উদ্দেশ্য মানুষকে উন্নয়নের মূল কেন্দ্রে স্থাপন করা। একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে জীবিকার কৌশল ঠিক করে নেয়, যাতে সে বা তারা বিদ্যমান সুযোগের সর্বোত্তম ব্যবহার করে, সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জীবনমান উন্নত করতে পারে। এ ধারায় সম্পদ বলতে শুধু আর্থিক বা ভৌত সম্পদ বোঝায় না, সম্পদ বলতে প্রাকৃতিক, সামাজিক, মানবিক, রাজনৈতিক সম্পদও বোঝায়। কারণ, মানুষের বিকাশের জন্য এ ধরনের সম্পদেও তার সম্পৃক্ততা জরুরি, আর এসব সম্পদে প্রবেশাধিকার একজন মানুষের দুর্দশা লাঘবে সহায়ক।

মানবাধিকারকেন্দ্রিক ধারার (Human Rights Based Approach-HRBA) মূলনীতি হলো ন্যায্যতা ও বৈষম্যহীনতা, অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন, অবিভাজ্যতা ও সর্বজনীনতা। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রসহ অধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য সনদ ও ঘোষণাপত্রে সুরক্ষিত অধিকারের বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে এ ধারাটি গড়ে উঠেছে। এ ধারায় সামষ্টিকভাবে মূলনীতিগুলোর প্রয়োগ ঘটিয়ে অধিকারপ্রাপ্ত (ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী) ও দায়িত্ব পালনকারী (মূলত সকল পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান) উভয়পক্ষকেই নীতি প্রণয়ন ও ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। সামগ্রিকভাবে এ ধারা ক্ষমতায়ন ও স্থায়িত্বশীলতার উপর জোর দেয় যাতে অধিকারপ্রাপ্ত ও দায়িত্ব পালনকারীরা পারস্পরিক উদ্যোগে একটি স্বাধীন এবং কার্যকর কাঠামো গড়ে তুলতে পারে।

বাংলাদেশে এনজিওর বিকাশ

ব্রিটিশ আমলেও এ অঞ্চলে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। স্কুল, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা। তবে এনজিওর বড় ধরনের বিকাশ ঘটে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। ধীরে ধীরে এনজিও উন্নয়নের অনুঘটক হিসেবে শক্তিশালী

www.pathagar.com

অবস্থান তৈরি করে নেয়। পরবর্তীতে এনজিওগুলো বাংলাদেশের দারিদ্র্য হ্রাসে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে (Haider, 2011)।

ষাটের দশকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এসময় কেয়ার, কারিতাস, ক্রিস্টিয়ান অর্গানাইজেশন ফর রিলিফ অ্যান্ড রিহ্যাবিলেটশন ইত্যাদি সংস্থার পাকিস্তান শাখা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সহায়তা ও পুনর্বাসনে কাজ শুরু করে। বিশেষ করে ১৯৭০-এর জলোচ্ছ্বাসের পর আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো এ অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় ও পরে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে নিযুক্ত হয় এনজিওগুলো। কারিতাস ছাড়াও এসব এনজিওর মধ্যে ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিসিডিবি, প্রশিকা, অক্সফাম, কনসার্ন, সেভ দ্য চিলড্রেন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য (Haider, 2011, p. 243)। এসব কাজের মধ্য দিয়ে তৃণমূল মানুষদের সঙ্গে এনজিওকর্মীদের মিথষ্ক্রিয়া ঘটে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়।

কিছুদিন পর ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের প্রয়োজন কমে আসে। এ সময় এনজিওগুলোর সামনে বড় যে চ্যালেঞ্জটি আসে তা হলো কীভাবে তারা তাদের কাজকে যৌক্তিকভাবে পুনর্বিন্যাস করে টিকে থাকবে। এনজিওগুলো উপলব্ধি করে যে, শুধুমাত্র ত্রাণ দিয়ে দরিদ্রদের সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। সাহায্যকে আরও ফলপ্রসূ উপায়ে দরিদ্রদের মাধ্যে পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে নিজেদের কাজকে পুনর্বিন্যাস করতে থাকে সংস্থাগুলো।

১৯৮০ ও ১৯৯০ দশকে বাংলাদেশে প্রচুর এনজিও গড়ে ওঠে। এর প্রধান একটা কারণ হচ্ছে 'সাহায্যের চাপ'। একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরও দুর্দশার মধ্যে পড়ে। বহু দাতা সংস্থা দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, আর তাদের সাহায্য দরিদ্রদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়। কারণ অপচয়ের ঝুঁকি বেশি থাকায় অনেক দাতা সংস্থা সরকারি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাহায্য দিতে ভরসা পাচ্ছিল না। এরকম প্রেক্ষাপটে এনজিওর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় (Haider, 2011, p. 244)।

আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় বিভিন্ন এনজিও বাংলাদেশে কাজ করছে। এনজিওগুলো নিম্নোক্ত প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে–

- ক্ষুদ্রঋণ
- শিক্ষা
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
- স্থানীয় সরকার
- কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
- ত্রাণ, গৃহায়ন
- দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন

www.pathagar.com

- তথ্য ও প্রযুক্তি
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
- নারী ও শিশু অধিকার
- আইনি সহায়তা
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন
- উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড

নিয়ন্ত্রণ

এনজিওগুলো বিভিন্ন আইন বা অধ্যাদেশের আওতায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–১. দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০, ২. দ্য ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২, ৩. ভলান্টারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১, ৪. কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট ১৯২৫, এবং ৫. দ্য কোম্পানি অ্যাক্ট, ১৯১৩। এসব আইনের অধীনে নিবন্ধিত সংস্থাগুলো মূলত ভলান্টারি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১; দ্য ফরেন ডোনেশন (ভলান্টারি অ্যাক্টিভিটিজ) রেগুলেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৮ (১৯৮২ সালে সংশোধিত); এবং দ্য ফরেন ডোনেশন কন্ট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২–এই তিনটি অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি এনজিও নিবন্ধিত হয়েছে সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরে (TIB, 2007)। ক্ষুদ্রঋণে নিয়োজিত এনজিওগুলোকে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অ্যাক্ট ২০০৬-এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিবন্ধন নিতে হয়।

এনজিওগুলোর তদারকি ও সহায়তা করার জন্য ১৯৯০ সালে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো গঠন করা হয়। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এনজিওর মধ্যে কিছু বিদেশি এনজিও এবং কিছু বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিও রয়েছে। সরাসরি বিদেশি অর্থ গ্রহণ করে এমন সংস্থার এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধন নেওয়া বাধ্যতামূলক। আগে এনজিওসমূহের নিবন্ধন, প্রকল্প অনুমোদন এবং বিদেশি তহবিল গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র নিতে হতো (শহীদুল্লাহ, ২০১৩, পৃ. ১৬৫-১৬৬)। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অন্যতম কাজ হলো এনজিও সংক্রান্ত বিষয়ে এনজিওর সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারের সকল দপ্তর ও মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে তথ্য-উপাত্ত এবং পরামর্শ প্রদান করা। এনজিওগুলোর নিবন্ধন ও নবায়ন কার্যক্রম ব্যুরোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এনজিওবিষয়ক ব্যুরো বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এনজিওসমূহের প্রকল্প অনুমোদন করে থাকে। বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুমতি প্রদান করে এই ব্যুরো। এছাড়া বিদেশি বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা নিয়োগ অনুমোদন, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান, এনজিও নিবন্ধন বাতিল করা ইত্যাদি কাজ করে থাকে এ প্রতিষ্ঠান।

সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, এনজিও ব্যুরোতে ২ হাজার ৪৪৭টি এনজিও নিবন্ধিত। এগুলোর মধ্যে দেশীয় সংস্থার সংখ্যা ২ হাজার ২০০টি। বাকি ২৪৭টি বিদেশি সংস্থা। এগুলোর মধ্যে

www.pathagar.com

সর্বাধিক সংখ্যক এনজিও যুক্তরাষ্ট্রের (৭৬টি) ও যুক্তরাজ্যের (৪১টি)। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো—জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস, সুইজ্যারল্যান্ড, সুইডেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি (NGO Affars Bureau, 2015)।

এনজিওর কাজের ক্ষেত্র

এনজিওর কাজের ক্ষেত্র বহুমাত্রিক। কোনো কোনো এনজিও বিশেষায়িত ক্ষেত্রে কাজ করে। আবার কোনো কোনো এনজিও একাধিক বিষয় নিয়ে কাজ করে। ১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশের এনজিওগুলো সমন্বিত কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচির দিকে মনোযোগ দেয়। প্রথম দিকে তাদের কাজের ক্ষেত্র ছিল কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, সমবায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা ইত্যাদি। পরবর্তীতে উন্নয়নের নানা তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে এনজিওর কাজের নানারকম বিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক বিকাশের জায়গাগুলোও গুরুত্ব পায় এনজিওর কাজে (Haider, 2011, p. 244)।

এনজিওগুলো আরেকটি বড় কার্যক্রম হাতে নেয়, তা হলো ক্ষুদ্রঋণ। ক্ষুদ্রঋণকে বলা হয় বাংলাদেশের নিজস্ব উদ্ভাবন যেটি বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় আলাদা মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রামীণ পরিবার এ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে, পৃথিবীর কোথাও দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য আর কোনো একক উদ্যোগ এত বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায়নি (Mahmud, 2004)। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে শুরু হলেও বাংলাদেশের বহু এনজিও এখন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের বহু দেশে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ মডেলটি অনুসৃত হচ্ছে।

এনজিওর কাজের ধারাকে বিভিন্ন পর্বে মোটামুটি এভাবে দেখানো যায় :

১৯৭০-১৯৭৯ : ত্রাণ ও পুনর্বাসন

১৯৮০-১৯৮৯ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন, সুরক্ষামূলক মৌলিক সেবা

১৯৯০-১৯৯৯ : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তৃত সেবা প্রদান, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান

২০০০-২০১০ : সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের (এমডিজি) সঙ্গে মিল রেখে সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করা, সুশাসন ও গণতন্ত্র, মানবাধিকার সুরক্ষা, পরিবেশ সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিপদাপন্নতা মোকাবেলা করা।

কৃষিতে এনজিও

এনজিও কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড় মনোযোগ দারিদ্র্য হ্রাস করা। বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদের বেশিরভাগ ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষিজীবী। স্বাভাবিকভাবেই এনজিওর কাজের একটি প্রধান ক্ষেত্র কৃষি, যার মাধ্যমে পরিবারগুলোর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। পাশাপাশি পরিবারগুলোর কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তাদের আয় বাড়ানোর কৌশলও রয়েছে এরকম উদ্যোগে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদেশি ও দেশি অনেক এনজিও কাজ করে। ভূমিহীন ছিন্নমূল প্রান্তিক কৃষক ছাড়াও বর্গাচাষি অথবা অল্প জমি রয়েছে এরকম কৃষকদের সঙ্গে কাজ করে তারা। আবার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী সংস্থাগুলোর প্রধান দৃষ্টি হচ্ছে উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ড, যার বড় একটা অংশ হচ্ছে কৃষিকেন্দ্রিক। ২০০১ সালে কৃষিতে ৪৬৮টি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থার বিতরণকৃত ঋণের ৩৯ শতাংশ গেছে কৃষি খাতে (সর্বোচ্চ ঋণ ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৪৩.০২%) (Ahmed, 2004)। কৃষির সবচেয়ে বেশি ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রাণিসম্পদ খাতে (১৮.১১ শতাংশ)।

কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক এনজিওদের সংগঠন আইএনজিও ফোরামের তালিকা থেকে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রকল্প রয়েছে এরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংস্থার মধ্যে ছিল–এসিএফ, অ্যাকশন এইড, কেয়ার, কনসার্ন, আইডিই, অক্সফাম, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন, ওয়ার্ল্ড ফিশ ইত্যাদি (INGO Forum Bangladesh, 2011)। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো জাতীয় বা স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে। ফলে জাতীয় বা স্থানীয় সংগঠনের অনেকগুলো কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত।

এনজিও কাজের অন্যতম লক্ষ্য হলো আয় বাড়ানো ও সম্পদ সৃজন। অর্থাৎ যে কৃষকদের অল্প কৃষিজমি, প্রাণিসম্পদ বা জলাভূমি রয়েছে, উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ করে স্বল্প সম্পদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া। এতে উৎপাদন বাড়ে, যা কৃষকদের আয় বাড়ানো ও পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাকে সংহত করে।

কৃষির ক্ষেত্রে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ২০১৪-১৮ সময়ের পাঁচটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে–দারিদ্র্য হ্রাস এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বাড়ানো; বহুমুখী/নিবিড়করণ, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, মানসম্পন্ন উপকরণ ব্যবহার ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানো; বাজার সংযোগ, মূল্য সংযোজন এবং খাদ্য ব্যবস্থার মান ও নিরাপত্তা উন্নত করা; উৎপাদক-সম্প্রসারণ-গবেষণার কার্যকর সংযোগ ঘটিয়ে প্রযুক্তি আবিষ্কার ও গ্রহণযোগ্যতা আরও উন্নত করা; এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বাস্থ্যগত হুমকি এবং জীবনোপায়ের উপর অন্যান্য ঝুঁকির মতো বিপর্যয়গুলোতে কমিউনিটির সহনশীলতা বা প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ানো (FAO, 2014)। কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত এনজিওগুলো এসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিকে কর্মসূচি গ্রহণ করে। যার মধ্যে রয়েছে :

- পুঁজির জোগান (সাধারণত ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে)
- কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, মাছের পোনা, খাবারসহ অন্যান্য যান্ত্রিক উপকরণ) যোগান
- উৎপাদন (চাষ বা পালনপদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, রোগবালাই ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা)
- প্রক্রিয়াজাতকরণ (ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ প্রক্রিয়াজাতকরণ)
- বাজারজাতকরণ (ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা)
- ভূমি সংস্কার
- কৃষি তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা
- গবেষণা

www.pathagar.com

কৃষিকাজে যুক্ত এনজিওগুলোর প্রধান লক্ষ্য পরিবারের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এছাড়া উদ্বৃত্ত ফসল বাজারজাত করার মাধ্যমে আয় বাড়ানোও এসব কাজের অন্যতম লক্ষ্য। স্বল্পব্যয়ী কিন্তু লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক নারী-পুরুষদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়াতে মাছ, মাঠ ফসল, অর্থকরী ফসল চাষ, প্রাণী পালন ইত্যাদির উপর উপকারভোগী নারী-পুরুষদের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কাজ করে এনজিওগুলো। এতে স্থায়িত্বশীল কৃষি উন্নয়নের অনেক উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন–ভালো জাতের মাছের পোনা চেনার উপায়, পুকুর তৈরি, সারি করে ধানের চারা রোপণের উপকারিতা, সেচ সাশ্রয়, উচ্চমূল্যের ফসল চাষ, বনায়ন, গরু-ছাগল-মুরগির টিকা প্রয়োগ, গুটি ইউরিয়া ব্যবহারে সুবিধা, মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি। কৃষিজমির সার্বিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় এ ধরনের কর্মকাণ্ডে।

কৃষি ছাড়াও কৃষকদের সঙ্গে কৃষিবহির্ভূত আয়মূলক বৃত্তি নিয়েও এনজিওর কাজ রয়েছে। প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকদের ভূমির পরিমাণ কম হওয়ায় তাদের সে জমি থেকে তারা সারা বছরের খোরাকি জোগাতে পারে না। বছরের একটা সময় খাদ্যসংকটে পড়ে পরিবারগুলো। তাই এ ধরনের সম্পদ-দরিদ্র পরিবারগুলোর সদস্যদের জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি। তাই তাদের বিভিন্ন আয়মূলক কাজে দক্ষতা বাড়ানো দরকার। হাতের কাজ (সেলাই, সুচিকর্ম, নকশা, কারচুপি), খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ করে নারীদের প্রশিক্ষিত করা এনজিও কাজের অন্যতম ক্ষেত্র।

কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কাজের পাশাপাশি এনজিওগুলো কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গেও কাজ করে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে উপকরণ ব্যবসায়ী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, হাট-বাজার কর্তৃপক্ষ, সরকারি কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি। এছাড়া কৃষকদের অধিকার সুরক্ষায় কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যও কাজ করে সংস্থাগুলো।

শেষ কথা

বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক উপকরণগুলো আজও বহু মানুষের নাগালের বাইরে, তবু জীবনধারণের মানের বিচারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করেছে, বিশেষ করে গত দুই দশকে (দ্রেজ ও সেন, ২০১৫)। দরিদ্র দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ উঠে এসেছে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে। বৈশ্বিক উন্নয়ন আলোচনায় বাংলাদেশের সাফল্যের উদাহরণ টানা হয়। সাক্স (২০০৫) উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে, উন্নয়নের জন্য যদি সুচিন্তিত উদ্যোগ গ্রহণ হয় তাহলে হতশ্রী একটা অবস্থা থেকেও মুক্তি পাওয়ার পথ আছে।

বাংলাদেশের সাফল্যের পেছনে অবশ্যই সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাইভেট সেক্টর, ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব উদ্যোগের অবদানও অনস্বীকার্য। দ্রেজ ও সেন (২০১৫) মনে করেন, বাংলাদেশের সাফল্যের পেছনে বিভিন্ন ধরনের এনজিওর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি পরিবর্তনে সামাজিক জাগরণমূলক কাজগুলোর বড় ভূমিকা রয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এনজিও সামাজিক প্রগতির অন্যতম উপাদান বলে পরিগণিত। এনজিওকে ধরা হয়ে থাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'মাধ্যমিক খাত' যেটা বাজার ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দুর্বলতার জায়গাগুলো পূরণ করছে। উদ্ভাবনী অনেক ধ্যানধারণা ও তাত্ত্বিক কাঠামো নিয়ে এসেছে এনজিও, সফল অনেক উন্নয়ন মডেলের প্রয়োগ ঘটিয়েছে তারা। বাংলাদেশের অর্জনগুলো ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখা এবং সেগুলোকে আরও এগিয়ে নেওয়া বাংলাদেশের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য সুসংগঠিত ও লক্ষ্যকেন্দ্রিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারের সম্পূরক শক্তি হিসেবে এনজিওদের নিবিড় ও ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ থাকলে এসব লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে।

তথ্যসূত্র

দ্রেজ, জে. এবং সেন, এ. (২০১৫). *ভারত উন্নয়ন ও বঞ্চনা*. কোলকাতা : আনন্দ।

শহীদুল্লাহ, মো. (২০১৩). *স্বেচ্ছাসেবীতা ও বাংলাদেশের এনজিও*. ঢাকা: গ্রন্থ কুটির।

Ahmed, S. (2004*), Microcredit and Poverty, New Realities and Strategic Issues*, Attacking Poverty with Microcredit, Edited by Ahmed, S. and Hakim M. A. Dhaka: UPL.

Barker, R. L. (1995), *The Social Work Dictionary, NASW, New York.*

FAO. (2014), *Bangladesh Country Programming Framework: Towards Sustainable Agriculture And Improved Food Security and Nutrition.* FAO Representation in Bangladesh, Dhaka.

Haider, S. K. U (2011*). Genesis and growth of the NGOs: Issues in Bangladesh perspective,* International NGO Journal Vol. 6(11), pp. 240-247, retrieved on 9 Febrauary 2016 from http:// www.academicjournals.org/INGOJ

INGO Forum Bangladesh (2011): An Introduction of Work in 40 Years, INGO Forum, Dhaka TIB.

Mahmud, W. (2004), *Introduction*, Attacking Poverty with Microcredit, Edited by Ahmed, S. and Hakim M. A. UPL, Dhaka.

NGO Affars Bureau. (n.d). Retrieved December 30, 2015 from http://ngoab.portal.gov.bd/

Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: How We Can Make it Happen in Our Lifetime,* London Penguin.

TIB [Transperancy International Bangladesh]. (2007). *Problems of Governance in the NGO Sector: The Way Out*, retrieved on January 5, 2016 from www. ti bangladesh.org/research/ExecSum-NGO-English.pdf

www.pathagar.com

৫. কৃষি ও নারী

ফাহমিদুল হক

কৃষিনির্ভর যে সভ্যতা মানুষ প্রথম প্রবর্তন করে, তাতে প্রধান অবদান ছিল নারীর। কিন্তু একসময় কৃষকের ভূমিকায় আমরা পুরুষকে অধিষ্ঠিত হতে দেখি। তাতে অবশ্য কৃষিকাজ থেকে নারীর পুরোপুরি বিচ্যুতি ঘটেনি। আজও প্রাচীন রীতির সেই জীবনযাপনে যারা অভ্যস্ত, সেরকম কিছু আদিবাসী সমাজে কৃষিতে নারীকে মুখ্য ভূমিকাই পালন করতে দেখা যায়। আবহমান বাংলার গ্রামীণ জীবনে নারী নীরবেই তার শ্রমবিনিয়োগ করে চলেছে। ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ–এই তিনটি স্তরের শেষের দুটিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় বেশি। কিন্তু পুরুষ প্রাধান্যের সমাজে তা তেমন উল্লেখ করা হয় না। পেশাদার শ্রমিক হলে ভিন্ন, কিন্তু গৃহস্থ নারী তার অবদানের জন্য কোনো পারিশ্রমিক পায় না, কৃষক হিসেবে তার ভূমিকাকে স্বীকারই করা হয় না। ধরে নেওয়া হয়, স্ত্রী হিসেবে এ তার কর্তব্য। অথচ কৃষিতে নারীর এই অংশগ্রহণ অনাদিকাল থেকেই চলে এসেছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কারণে নারীদের ঘরের বাইরে আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকায়, নারীর এই অবদান তেমন দৃশ্যমানও হয় না।

তবে লক্ষ করার বিষয়, সময়ের বিবর্তনে নারীর মাঠে গিয়ে কাজ করার হার ইদানীং বেড়েছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত অক্সফামের এক গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে কৃষিখাতে নারীর অবদান শতকরা ৬৬ ভাগ (আহম্মেদ, ২০১৫)। অন্যদিকে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১১ সালের এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, কৃষিখাতে নারীর অবদান শতকরা ৬১ ভাগ হলেও ভূমিতে মালিকানা মাত্র ১৮ ভাগ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যেসব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে তা হলো–ফসল কাটার পর প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফসল সংরক্ষণ, বীজ উৎপাদন, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি ও ফল উৎপাদন, সামাজিক বনায়ন, মাছচাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ।

বর্তমানে আর্থসামাজিক অবস্থার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজনে পরিবর্তন আসছে। পুরুষরা কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে। এতে কৃষিকাজে নারীদের

www.pathagar.com

দায়িত্ব বাড়ছে। এছাড়া কৃষি বাণিজ্যিকীকরণের ফলে পুরুষকে অর্থকরী ফসল উৎপাদনে নিয়োজিত হতে হয়েছে, ফলে জীবনধারণের জন্য নারীকে অধিকমাত্রায় কাজ করতে হচ্ছে। নারীর কাজের বোঝা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। অথচ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ভূমির মালিকানায় নারীকে বঞ্চিত করা হয়। তাই নারীর ভূমির মালিক পরিচয় না থাকায় কৃষিপণ্যের উৎপাদক হিসেবেও তার পরিচয় মিলছে না।

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, যার সিংহভাগ বাস করে গ্রামে। মোট নারী শ্রমশক্তির বেশিরভাগই কৃষিকাজে নিয়োজিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ২০১৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৫ বছরের উপরে জনসংখ্যার ৪৫.১ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত (BBS, 2013)। ওই সময়ে কর্মক্ষম জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি ৬৩ লাখের বেশি, প্রায় সমান সংখ্যক নারী-পুরুষ। এই জরিপ অনুসারে বাংলাদেশের পুরুষ শ্রমশক্তির ৪১.৭ শতাংশ ও নারী শ্রমশক্তির ৫৩.৫ শতাংশ কৃষির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তৈরি পোশাক শিল্পের চাইতেও কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ অনেক বেশি।

কৃষির প্রাধান্য মূলত গ্রামীণ এলাকায়। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকায় কর্মক্ষম নারীদের ৬৯.৫ শতাংশ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। এ হার গ্রামীণ এলাকার কৃষিতে যুক্ত পুরুষদের তুলনায় ২১.৪ শতাংশ বেশি। কর্মক্ষম বয়সের ৪৮.১ পুরুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত (BBS, 2011)।

শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ২০০৫-০৬ সময়ের তুলনায় ২০১০ সালে কৃষিতে পুরুষদের অংশগ্রহণ সামান্য কমেছে (০.০৫%)। কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে প্রবণতাটি উল্টো। এ সময়ে কৃষিকাজে নারীদের সংখ্যা বেড়েছে ৭.৭৫% (BBS, 2011)।

আমাদের সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি পরিমাণে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এর পেছনে রয়েছে নারীর অশিক্ষা, অপুষ্টি, বৈষম্যমূলক মজুরি, অদক্ষতা ও মৃত্যুর উচ্চহার, প্রযুক্তির অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি। জেন্ডার ভ্যালু চেইনে নারীর উপস্থিতি দৃশ্যমান না হওয়ায় এই বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তাদের শ্রমশক্তি সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে নারী-কৃষকের স্বীকৃতি, ক্ষমতায়ন প্রয়োজন যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। নারীর মর্যাদার সঙ্গে এটা সরাসরি যুক্ত, কারণ কৃষিতে নারীর এই শ্রমের যেমন কোনো মূল্য দেওয়া হয় না, তেমনি নেই এর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।

বিশ্বব্যাংক পরিচালিত 'নারী, ব্যবসা এবং আইন ২০১২' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দৈনন্দিন কাজের ৬৬ শতাংশ করেন নারীরা, খাদ্যের ৫০ শতাংশও তারা উৎপাদন করেন। অথচ তারা কর্মের মজুরি পান মাত্র ১০ শতাংশ। এমনকি তাদের মালিকানায় রয়েছে বিশ্বের মাত্র এক শতাংশ সম্পত্তি। বিশ্বের ১৪১টি দেশের উপর গবেষণায় নারীর এ অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

ভুট্টাচাষে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগের উপর এক গবেষণা পরিচালিত হয় উত্তরবঙ্গের বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর জেলা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলায় (Katalyst, 2014)। এতে দেখা গেছে, প্রধানত দুই ধরনের নারী কৃষক ভুট্টাচাষের সঙ্গে যুক্ত–ক.

www.pathagar.com

মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিক ও খ. কৃষক। কৃষকদের মধ্যে আবার তিন ধরন দেখা গেছে— ১. প্রধান ভূমিকা পালনকারী নারী কৃষক ২. স্বামী বা পরিবারের পুরুষ সদস্যকে সহায়তাকারী কৃষক (মজুরিপ্রাপ্ত নয়) ৩. চুক্তিভিত্তিক কৃষক। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, ভুট্টা উৎপাদনে নারী কৃষকের ব্যাপক অবদান রয়েছে। ভুট্টার ভ্যালু চেইনের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে তাদের অবদান পুরুষদের চেয়েও বেশি। উৎপাদনের বিশেষ কিছু পর্যায়ে (যেমন–জমি প্রস্তুতকরণ, বীজ ছিটানো, নিড়ানি দেওয়া, ফসল কাটা, প্রক্রিয়াজাত করা ইত্যাদি) নারীদের/স্ত্রীদের অংশগ্রহণের কারণে ভুট্টা উৎপাদনের খরচ কমে আসে। আবার নারীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ ভুট্টা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে ভূমিকা রাখছে। তবে এই ফলাফলটি একইসঙ্গে কৃষক হিসেবে নারীর স্বীকৃতির ঘাটতির এবং মজুরিহীন শ্রমিক হিসেবে নারীকে শোষণের বিষয়টি তুলে এনেছে।

কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাক বপন প্রক্রিয়ার মধ্যে বীজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বীজ প্রস্তুতি এই কাজগুলো মূলত নারীরাই করেন। যেমন বীজধান নির্বাচনের পর ঝাড়া, শুকানো, মাটির ড্রাম, টিন বা চটের বস্তায় সংরক্ষণ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট ব্যবধানে শুকাতে হয়। বীজ শুকানোর কাজ সঠিকভাবে করতে হয়, এর উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো-বাতাস লাগাতে হয়। তাহলেই ভালো অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতাসম্পন্ন বীজ পাওয়া যায়। একজন অভিজ্ঞ নারীই বীজ সংরক্ষণের এ কাজটি সঠিকভাবে করতে পারেন। আদিবাসী ছাড়াও এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন অঞ্চলে মাঠ ফসল উৎপাদনে চারা রোপণ ও তোলার কাজ নারীরা করেন। শস্য কর্তনোত্তর ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রতিটি কাজে নারীর ভূমিকা স্বীকৃত। এমনকি উদ্ভিদ সংরক্ষণসহ ভেষজ ওষুধ ব্যবহারে নারীরা প্রধান ভূমিকা রাখছেন, যা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। নারীরা জৈব সার বা কম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে জমির স্বাস্থ্য রক্ষা করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছেন। এছাড়া বাংলাদেশের বসতবাড়ির সবজি/ফল উৎপাদন ও পশুসম্পদ যেমন–হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল প্রভৃতি উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপক। পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে নারীদের ভূমিকাই প্রধান এবং সবজি বাগান ও পশুসম্পদ থেকে আয়ের ক্ষেত্রে ২০-৪০ ভাগ অবদান রাখছে, নারীরা (হাসান, ২০১২)।

মাছচাষে জেলে পরিবারের নারীরা মাছ ধরার পর মাছ বাছাই/কাটা, শুকানো ও বাজারজাতকরণের উপযোগী করার দায়িত্ব পালন করেন এবং শুঁটকি তৈরিতে অবদান রাখছেন। বর্তমানে মিঠাপানির মাছ চাষের ক্ষেত্রে নারীরা বাণিজ্যিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৪ সালে মাছচাষে নারীর অংশগ্রহণের উপর এক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে নড়াইল, খুলনা, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও বরিশাল জেলায়। সুইসকন্ট্যাক্ট-ক্যাটালিস্টের গবেষক জুয়েল দাস পরিচালিত এ গবেষণায় দেখা যায় যে মৎস্য চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুত করা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও ওষুধ প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোতে নারীরা অংশগ্রহণ করেন (Katalyst, 2014)। এ ছাড়া পুকুরের চারপাশে গড়ে ওঠা কৃষিকাজেও নারীরা অংশগ্রহণ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, ঐ অঞ্চলের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি নারী মৎস্য

www.pathagar.com

কৃষিতে নারী : কৃষিনীতি ২০১৩

দেশের মোট মানবসম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী। সেজন্য, সরকারি চাকরি ও কৃষি ক্ষেত্রে আরও অধিক সংখ্যক নারী কৃষক এবং কৃষি শ্রম-শক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীর অবদান রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কৃষি সংক্রান্ত অর্থোপার্জন কর্মকাণ্ডে নারীকে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করা এবং মানব-সম্পদ উন্নয়নে সরকারের করণীয় নিম্নরূপ :

নারীর ক্ষমতায়ন

- পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান কর্মকাণ্ড উন্নয়নে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;
- কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে; এবং
- কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

উৎপাদন ও বিপণনে অংশগ্রহণ

- সরকার কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে, বিশেষত কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে;
- কৃষিতে নারীর প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;
- কৃষি প্রযুক্তি প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করা হবে; এবং
- বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যেমন–প্রশিক্ষণ, কৃষক সমাবেশ ও কর্মশালায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আয়ের সুযোগ সৃজন

- কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন বসতবাড়িতে বাগান, ফসল কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারি, মৌমাছি-পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার ঋণ সহায়তা প্রদান করবে;
- সরকার ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে; এবং
- নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

www.pathagar.com

চাষসংশ্লিষ্ট কাজ ও পুকুরের পরিপার্শ্বের সবজিচাষের সঙ্গে যুক্ত। নারীদের এই অংশগ্রহণের কারণে চাষপ্রক্রিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হয়। একারণে নারীদের এই অংশগ্রহণ পুরুষরা ইতিবাচক চোখেই দেখে। তবে প্রয়োজনীয় কৃষিসংক্রান্ত তথ্যের জন্য তারা এখনও স্বামী বা অন্য পুরুষ সদস্যের উপরে নির্ভর করেন। অবশ্য পরিবারের ভেতরের এবং বাইরের আর্থিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

অতীতে কৃষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি ছিল না। ১৯৯৮ সালে কৃষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিল 'অন্ন জোগায় নারী' এ স্লোগানটি। বর্তমানে কৃষিতে নারীর অধিকতর সম্পৃক্ততার উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে কৃষিকাজে নারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিকল্পনায় নীতিমালা ও কৃষিনীতি প্রণয়ন করে প্রথমে ১৯৯৯ সালে। ১৯৯৯ সালের কৃষিনীতিকে পরিমার্জনা ও যুগোপযোগী করে ২০১৩ আরেকটি কৃষিনীতি পাস হয়।

নারীর দক্ষতার বিশেষ ক্ষেত্র

প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষ ও নারী সম্মিলিতভাবে কৃষিতে অবদান রেখে চলেছে। তবে বীজ সংরক্ষণের মতো দুয়েকটি বিষয়ে নারীর রয়েছে বিশেষ প্রচলিত জ্ঞান। পরিবেশবান্ধব কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে নারী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবে :

- জৈব সার প্রস্তুত ও ব্যবহার
- স্থানীয় পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ
- স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার
- পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বীজ আদান-প্রদান
- স্থানীয় বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

নারীর কৃষি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

ভূমিহীন, প্রান্তিক কৃষাণীরা আর্থিক প্রয়োজনে মাঠে ও গৃহে কৃষিকাজে সক্রিয়। তাছাড়া পাহাড়ি নারীরা কৃষি উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশের প্রচলিত প্রথা এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক নিয়মাচার, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণের অভাব কৃষিতে নারীদের প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষরাই নারীর কৃষি কর্মকাণ্ডকে চালিত করে। এখনও কৃষি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে নারী যেসব সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা হলো :

- **নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব :** কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ থাকলেও তার স্বীকৃতি প্রদানে পুরুষের সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। নিজে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করলেও, নিজগৃহে পুরুষ নারীর শ্রমকে 'স্বাভাবিক' বলে মনে করে।
- **জমি/সম্পদের মালিকানার অভাব :** আমাদের দেশের ভূমি ও সম্পদ বণ্টন ও এসংক্রান্ত আইন-কানুন নারীর জন্য অনুকূল নয়। ফলে জমি ও সম্পদে নারীর

www.pathagar.com

মালিকানা বরাবরই কম থাকছে। উপরন্তু জমি ও সম্পদ থেকে নারীকে বঞ্চিত করার সামাজিক চর্চাও লক্ষণীয়।

- **পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব :** কৃষক হিসেবে নারীর স্বীকৃতির অভাবে, সামাজিকভাবে কৃষক হিসেবে নারীকে কম বিবেচনা করা হয়। ফলে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের যাবতীয় প্রশিক্ষণ থেকে নারী বঞ্চিত থেকে যায়।
- **পর্যাপ্ত ঋণের অভাব :** কৃষক হিসেবে নারীর স্বীকৃতির অভাবে পুরুষের তুলনায় নারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে কম ঋণসুবিধা পেয়ে থাকেন।
- **পর্যাপ্ত কৃষি সম্পর্কিত তথ্যের অভাব :** গৃহমুখী হবার কারণে নারীর কৃষি সম্পর্কিত তথ্য পাবার সুযোগ কম থাকে।
- **লাগসই প্রযুক্তির অভাব :** কৃষক হিসেবে নারীর স্বীকৃতির অভাবে, লাগসই প্রযুক্তি তার কাছে দেরিতে পৌঁছে।
- **ফসল বাজারজাত করার জন্য অপর্যাপ্ত বিপণনের ব্যবস্থা :** নারীর উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করার ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধা সামনে এসে দাঁড়ায়। কারণ সমাজ নারীদের ঘরে দেখতে চায়। হাট-বাজারে ফসল বিপণন তার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে।

কৃষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

কৃষি কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই নারীর প্রধান সম্ভাবনা। গ্রামীণ নারীর প্রচলিত জ্ঞান ও অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে কৃষি ব্যবস্থাপনা। হালের কৃষিতে, যেমন—পরিবেশবান্ধব করে তোলার একটা তাগিদ লক্ষ করা যাচ্ছে, তেমনি নারীকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করাও সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পরিবেশবান্ধব কৃষি অনুশীলনের মাধ্যমে দেশীয় কৃষিকে টেকসই উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়ায় নারীকে সহযাত্রী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহার, স্থানীয় পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ কৌশল, স্থানীয় কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার, পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বীজ আদান-প্রদান, স্থানীয়ভাবে বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

তাই কৃষিতে নারীর উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নারীর অবদানের সর্বোত্তম মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান করা অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে :

- কৃষিখাতের সঙ্গে যুক্ত উৎপাদক গ্রামীণ নারীদের কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং কৃষক হিসেবে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। এর অংশ হিসেবে নারী কৃষকের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।
- কৃষিখাতে সকল সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন পর্যায়ে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা।

www.pathagar.com

- জমিতে পরিবারের নারী সদস্যদের অধিকার নিশ্চিত করা। এজন্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যমূলক ধারাগুলো সংশাধন করে জমিতে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
- কৃষিভিত্তিক ব্যবসায় পরিবারের নারী সদস্যদেরও যাতে প্রবেশাধিকার থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া।
- ফসল তোলার পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারি ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সবজি পণ্যভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজে নারীর আগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ও মূলধনী সহায়তা প্রদান করা।
- নারী-পুরুষ উভয়কেই সমান কাজে সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা।
- কৃষিতে নারীর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং চিহ্নিত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা রাখা।
- গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়া।
- নারী কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের উপযোগী নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বাজারে নারীদের জন্য আলাদা স্থান সংরক্ষিত রাখা।
- নারীর জন্য উপযোগী কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবনের নিমিত্তে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবিত যন্ত্র মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যকর ভূমিকা রাখা।
- নারী কৃষিশ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা, এজন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।
- গ্রামীণ নারীদের কাছে কৃষি তথ্য পৌঁছে দেওয়ার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।

তথ্যসূত্র

BBS [Bangladesh Bureau of Statistics]. (2015), *Report on Labour Force Survey 2013*. Dhaka, Retrieved on December 15, 2015, from http://bbs.gov.bd/

Das, J. (2014). *A Report on Study to Identify Role of Women in Farmed Fish (Tilapia, Pangus, Koi & Carp) Value Chain*. Dhaka: Swisscontact.

Katalyst. (2014). *Scoping Study to Explore the Opportunity to Enhance the Female Farmers in Maize Production*. Dhaka: Swisscontact.

আহম্মেদ, আ. নো. ফা. (২০১৫, ১৮ জুলাই). '*কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদান*'। ঢাকা: যায়যায়দিন, পৃ. ১৭।

কৃষি মন্ত্রণালয়. (২০১৩). জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩. ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হাসান, এম. এম. এম. (২০১২). *Campaing for Sustainable Rural Livelyhood*. Retrived February 2, 2016 from http://csrlbd.org/blog/?tag=wfd

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৬. কৃষি বাণিজ্য

মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

কৃষিরপণ্যের চাহিদা মেটাবার একটি উপায় হলো কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু পণ্য উৎপাদিত হলেই মানুষের অভাব পূরণ হয় না। অভাব পূরণ করতে হলে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য ভোক্তার কাছে পৌঁছানো জরুরি। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী উৎপাদক তথা কৃষকের কাছে থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কর্মকাণ্ডকে কৃষিবাণিজ্য বলা হয়। এটি যেমন দেশের অভ্যন্তরে হতে পারে, তেমনি তা এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের হতে পারে। বাণিজ্য যখন দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং যখন এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য কর্ম চলে তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

কোনো ব্যক্তির পক্ষেই নিজের প্রয়োজনীয় সকল কৃষিপণ্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। আবার দেশের কোনো অঞ্চলে প্রয়োজনীয় সকল কৃষিপণ্য উৎপাদন করাও সম্ভব নয়। কখনও আবার এক দেশে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কৃষিপণ্যের উৎপাদনও অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ফলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণ্য এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে থাকে। এভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যের মাধ্যমে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। এভাবে নানা হাত ঘুরে কৃষিপণ্য সকল মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে। এর ফলে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বা নানারকম প্রক্রিয়াজাত হয়ে ভোক্তার কাছে পৌঁছে যায়। এমনকি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে কোনো কোনো পণ্য চলে যায় পৃথিবীর একাধিক দেশেও। আবার কোনো কোনো পণ্যের চাহিদা মেটাবার জন্য কোনো কোনো কৃষিপণ্য বিদেশ থেকে দেশে আনার প্রয়োজন হয়। মোদ্দাকথা কৃষিবাণিজ্যের মাধ্যমেই কৃষিজ পণ্য এদের উৎসস্থল থেকে নানা হাত ঘুরে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কিংবা আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। কৃষিবাণিজ্যের মাধ্যমে একদিকে যেমন কোনো কৃষিপণ্যের অভাব পূরণ হয়, অন্যদিকে এর মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের ঘাটতিও মেটানো হয়, আবার কৃষিজ পণ্য বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে আমাদের দেশে কৃষিজ পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়। আর কৃষিজ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে এক দেশের উৎপাদিত অতিরিক্ত পণ্য অন্য দেশে বিক্রয় করে অর্থ আয় করে থাকে। এর ফলে দেশে সেসব পণ্য উৎপাদনের একটি চাহিদা তৈরি হয়। কৃষিবাণিজ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং কৃষিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে। কৃষিবাণিজ্য দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং মানুষের উৎপাদন কর্মকাণ্ড বেগবান ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়ক হয়।

কৃষিবাজার

সাধারণ অর্থে বাজার বলতে এমন একটি স্থানকে বোঝায় যেখানে দ্রব্যসামগ্রীর নিয়মিত ক্রয় বিক্রয় হয়। অর্থনীতিতে অবশ্য বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে নয় বরং কোনো একটি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত ক্রেতা-বিক্রেতার সমষ্টিকে বোঝায়। কৃষিবাজার বলতে একটি স্থান যেখানে কৃষিজ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে বোঝায়। সাধারণ বাজারের মতো কৃষিবাজারেরও কতগুলো আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে হয় যাকে বাজারের উপাদান বলা হয়। সে উপাদানগুলো হলো—

- বিক্রয়ের জন্য কৃষিজ পণ্যের উৎস বিদ্যমান থাকা
- ক্রেতা-বিক্রেতা বিদ্যমান থাকা
- একটি মূল্যমান রক্ষা করা যার মাধ্যমে মালামাল লেনদেন বা বিনিময় করা হয়
- ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকা
- বাজার এলাকার সীমা নির্ধারিত থাকা।

কৃষিবাজারের প্রকারভেদ

কৃষিবাজারকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। বাজারের কর্মকাণ্ড কোন্ স্থানে সম্পন্ন করা হয়, বাজারের সীমা, বাজার বসার সময়, মালামাল লেনদেনের পরিমাণ, লেনদেনের প্রকৃতি, বাজারে কোন ধরনের মালামাল বেশি বিক্রি করা হয়, বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা, মালামালের প্রকৃতি, বিপণনের স্তর, বাজারের মাধ্যমে কোন্ ধরনের জনসমষ্টির সেবা প্রদান করা হয়, এসব বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বাজারের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। তবে বাজারের এলাকার বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে বাজারকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়–

- স্থানীয় বাজার
- আঞ্চলিক বাজার
- জাতীয় বাজার
- আন্তর্জাতিক বাজার

স্থানীয় বাজার

এক বা একাধিক গ্রামের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কৃষিজ পণ্য বেচাকেনা করা হলো স্থানীয় বাজার। সাধারণত পচনশীল দ্রব্য কৃষকগণ এসব স্থানীয় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে।

www.pathagar.com

তবে নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক কৃষিপণ্যও স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়। যদিও কৃষিজাত বহু পণ্য এসব বাজারে পাওয়া যায় না। স্থানীয় বাজার সপ্তাহের নির্দিষ্ট এক বা একাধিক দিনে বসে। তবে কোনো কোনো স্থানীয় বাজার প্রতিদিনই সকালে বা বিকেলে বসে।

আঞ্চলিক বাজার

কোনো কৃষিপণ্যের জন্য স্থানীয় বাজারের চেয়েও বড় এলাকা থেকে ক্রেতা-বিক্রেতার সমাবেশ ঘটে যে বাজারে তাকে আঞ্চলিক বাজার বলা হয়। দেশের কোনো কোনো এলাকায় কোনো কোনো দানা শস্যের জন্য আঞ্চলিক বাজার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তেমনি সবজি, কোনো কোনো ফল, কিংবা ফুলের জন্য দেশে আঞ্চলিক বাজার রয়েছে, যথা : যশোরের গদাখালি বাজার ফুলের একটি আঞ্চলিক বাজার। এসব আঞ্চলিক বাজার থেকে কৃষিজ পণ্য জাতীয় পর্যায়ের বাজারে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনকালে কৃষিপণ্যভিত্তিক আঞ্চলিক বাজারে কৃষিপণ্য যখন সুলভ হয় তখন তা জমজমাট হয়ে ওঠে।

জাতীয় বাজার

জাতীয় পর্যায়ে যখন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কৃষিপণ্যের ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে তখন তাকে জাতীয় বাজার বলা হয়। সাধারণত যেসব পণ্য সহজে নষ্ট হয় না সেসব পণ্য জাতীয় বাজারে বেচাকেনা করা হয়ে থাকে। চাল, পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চিনি ইত্যাদি পণ্যের জাতীয় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি ঘটায় অধিকাংশ কৃষিপণ্যের সরবরাহ এখন জাতীয় বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষিপণ্য এখন সহজে জাতীয় বাজারে চলে আসে। যথা : বিভিন্ন স্থানীয় বা আঞ্চলিক বাজার থেকে ফুল, চাল ইত্যাদি ঢাকাস্থ জাতীয় বাজারে চলে আসে।

আন্তর্জাতিক বাজার

যেসব কৃষিজ পণ্যের বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে সেসব পণ্য কোনো দেশের পরিমণ্ডলের বাইরে অন্য দেশে ক্রয়-বিক্রয় করাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলা হয়। বাজার এলাকার বিস্তৃতির নিরিখে এ রকম বাজার সবচেয়ে বড়। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যকে মূল্য ও মানের দিক থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে উন্নত মানসম্পন্ন কৃষিজ পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার উপর আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকা নির্ভর করে। সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করায় এ ধরনের বাজার দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

কৃষি বিপণন

কৃষি বিপণন বলতে কৃষিজ পণ্য খামার থেকে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বোঝায়। কৃষি বিপণনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রকম আন্তঃসম্পর্কিত কর্মকাণ্ড হলো–উৎপাদন পরিকল্পনা, উৎপাদন সম্পন্ন করা, উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহ করা, গ্রেডিং,

www.pathagar.com

প্যাকিং, পরিবহণ, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিতরণ, প্রচার এবং বিক্রয়। বিপণনের তিন শ্রেণির কার্যাবলি রয়েছে, যথা : বিনিময় কার্যাবলি, ভৌত কার্যাবলি এবং সহায়তাকারী কার্যাবলি। ক্রয়-বিক্রয় হলো বিনিময় কার্যাবলির অন্তর্গত। মালামাল সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ হলো ভৌত কার্যাবলি। বিপণনের সহায়তাকারী কার্যাবলির মধ্যে রয়েছে গ্রেডিং, অর্থায়ন, ঝুঁকিগ্রহণ, বাজার তথ্য নিশ্চিতকরণ এবং প্রচার ও প্রসার।

কৃষিজ উপাদান নিশ্চিত করার জন্য কৃষি উৎপাদন উপকরণ, যথা–বীজ, সার, কীটনাশক, বালাইনাশক ইত্যাদি কৃষকের নিকট সুলভ করার মধ্য দিয়ে কৃষি বিপণনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। অতঃপর কৃষি বিপণনের অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনস্থল থেকে বিভিন্ন হাতবদলের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ভোক্তার কাছে গিয়ে পৌঁছে। বিপণন একটি অত্যন্ত চলমান পদ্ধতি, এটি প্রতিযোগিতামূলক এবং প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। বিপণন অবশ্যই ভোক্তা উপযোগী হতে হয়। যে বিপণন ব্যবস্থা স্বল্প দামে, অধিক দক্ষতার সঙ্গে মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করে সেটি দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য

কোনো দেশে যেসব কৃষিপণ্যের ঘাটতি থাকে অথবা যেসব কৃষিজ পণ্য কোনো দেশে উৎপন্নই হয় না, সেসব পণ্য অন্য দেশ থেকে আমদানি করে এর ঘাটতি বা অভাব পূরণ করা হয়। আবার যেসব দেশে কোনো পণ্য নিজ দেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন হয়, সেসব পণ্য যেসব দেশে এর চাহিদা রয়েছে সেখানে রপ্তানি করা হয়। অনেক সময় অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য নিজ দেশের চাহিদার অতিরিক্ত না হলেও কোনো কোনো কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করা হয়।

কৃষিপণ্য আমদানির সঙ্গে ভোক্তার বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটানোর বিষয়টি জড়িত। তা ছাড়া আমাদের দেশে যেসব কৃষিজ পণ্যের ঘাটতি রয়েছে অথবা যেসব পণ্যের বৈচিত্র্য আমাদের দেশে কম, সেসব পণ্য আমাদের দেশে অন্য দেশ থেকে আমদানি করা হয়। উদাহরণ হিসেবে ভোজ্য তেলের কথা বলা যায়। আমরা মূলত যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন তেল আমদানি করে থাকি। আমাদের নিজস্ব তৈলবীজ উৎপাদন আমাদের চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র পূরণ করে (Akanda et al., 2012)। সে কারণে বিশাল ঘাটতি পূরণ করা হয় আমদানির মাধ্যমে। তা ছাড়া সারা বছর বাজারে যেসব ফলমূল যেমন–আপেল, কমলা, আঙ্গুর, নাশপাতি, আনার ইত্যাদি পাওয়া যায় তা আমদানির কারণেই সম্ভব হচ্ছে। তদুপরি অনেক কৃষি উপকরণ, যেমন—সার, রাসায়নিক কীটনাশক, আগাছানাশক ইত্যাদিসহ নানা রকম কৃষি যন্ত্রপাতি আমাদের বিদেশ থেকে আমাদানি করতেই হয়।

বাংলাদেশ বিদেশ থেকে বিভিন্ন রকম কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণ আমদানি করে থাকে। কৃষিপণ্যের মধ্যে রয়েছে গম, চাল, মশলা, ফল, তুলা, ভোজ্য তেল, আদা, মরিচ, মসুর ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, চা ও তৈলবীজ। দেশে গমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গমের আমদানি প্রতি বছর বাড়ছে। অন্যদিকে দেশে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় চাল আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। দিন দিন আমাদের কাঁচা তুলা আমদানির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কৃষি উপকরণের মধ্যে রয়েছে কৃষিখামার যন্ত্রপাতি, যেমন—পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, উইডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার।

www.pathagar.com

প্রধান প্রধান কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণ বাবদ আমদানি ব্যয় ২০১২-১৩ সালের তুলনায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৬২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে (Ministry of Finance, 2015)। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাবার মূল কারণ হলো গমের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়া। ২০১২-১৩ অর্থবছরে গম আমদানি বাবদ ব্যয় হয় ৬৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১১৮ মিলিয়ন ডলারে (সারণি ১)। তা ছাড়া তৈলবীজ, তুলা ও ভোজ্য তেল আমদানি ব্যয়ও ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৩১.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং যার মধ্যে গম আমদানির পরিমাণ ছিল ২৭.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। সরকারিভাবে ৯.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছিল। বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২১.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে চাল ছিল ৩.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ছিল ১৭.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

সারণি ১। প্রধান প্রধান কৃষিসংশ্লিষ্ট পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণ	২০০৯-২০১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
চাল	৭৫	৮৩০	২৮৮	৩০	৩৪৭
গম	৭৬১	১০৮১	৬১৩	৬৯৬	১১১৮
তৈলবীজ	১৩০	১০৩	১৭৭	২৪২	৫০৮
তুলা	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪	২০০৫	২৪২৫
ভোজ্য তেল	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪	১৪০২	১৭৬১
সার	৭১৭	১২৪১	১৩৮১	১১৮৮	১০২৬
মোট	৪১৭২	৭০১১	৬১৮৭	৫৫৬৩	৭১৮৫

(Ministry of Finance, 2015)

অন্য দেশে চাহিদা রয়েছে যেসব কৃষিজ পণ্যের, এর কোনো কোনোটা আমাদের দেশে স্বল্প মূল্যে সুলভ বলে আমরা কোনো কোনো কৃষিপণ্য রপ্তানি করে থাকি। আমাদের কৃষিপণ্য রপ্তানির উল্লেখযোগ্য দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, পাট, চা, চামড়া এসব কৃষিজাত দ্রব্য আমাদের চাহিদার তুলনায় বেশি উৎপাদিত হয় বলে এবং অন্য দেশে এগুলোর চাহিদা রয়েছে বলে আমরা এগুলো রপ্তানি করে থাকি। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের বহু লোক চাকরির কারণে বিদেশে অবস্থান করছে। তারা তাদের অভ্যাসগত কারণে দেশের অনেক খাদ্যবস্তু তাদের খাদ্যতালিকায় পেতে চায় বলে অনেক রকম মাছ, শাকসবজি বা ফলমূল প্রবাসী বাঙালির কাছে সহজলভ্য করার জন্য আমাদের এসব পণ্য রপ্তানি করতে হয়।

www.pathagar.com

২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রধান প্রধান মোট কৃষিজ পণ্য রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের তুলনায় ৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি (Ministry of Finance, 2015)। দেশের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৯ ভাগ হলো কৃষিজ পণ্য। বাংলাদেশ থেকে যেসব কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে—পাট, পাটজাত দ্রব্য, চিংড়ি, হিমায়িত মাছ, চামড়া, সবজি, ফল, সি ফুড, চা ও ফুল। দেশের প্রধান কৃষিজ রপ্তানিপণ্য আসলে পাট ও পাটজাত দ্রব্য যা দেশের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ২.৭ ভাগ। এরপরে রয়েছে যথাক্রমে হিমায়িত খাদ্য এবং চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য (সারণি ২)। এ সময় রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চা (৮৫.৫%), চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য (২৬.৫%), হিমায়িত খাদ্য (১৭.৪%) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, কাঁচা পাট (৪৫%), পাটজাত দ্রব্য (১২.৮%) এবং কটন ও কটন দ্রব্য (৭.৫%) রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে (Ministry of Finance, 2015)।

সারণি ২। প্রধান প্রধান কৃষিজ দ্রব্য ও পণ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানিপণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
হিমায়িত পণ্য	৫৯৮	৫৪৪	৬৩৮	২.৫	২.০	২.১	-৪.৩	-৯.১	১৭.৪
চা	৩	২	৪	০.০	০.০	০.০	০.০	-৩৩.৩	৮৫.৫
কৃষিজাত পণ্য	৩০৪	৩৫১	৪০২	১.৩	১.৩	১.৩	১৬	১৫.৪	১৪.৬
কাঁচা পাট	২০৬	২৩০	১২৬	১.১	০.৯	০.৪	-২৫.৫	-১৩.৬	-৪৫.০
কটন ও কটন দ্রব্য	১১৩	১২৫	১১৬	০.৫	০.৫	০.৪	-১৬.৩	১০.৬	-৭.৫
চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৩৩০	৪০০	৫০৬	১.৪	১.৫	১.৭	১০.৭	২১.০	২৬.৫
পাটজাত পণ্য	৭০১	৮০১	৬৯৮	২.৯	৩.০	২.৩	-৭.৫	১৪.২	-১২.৮
মোট	২২৫৫	২৪৫৩	২৪৯০	৯.৭	৯.১	৮.২	-২৬.৯	৫.২	৭৮.৭

(Ministry of Finance, 2015)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা ফলমূল ও শাকসবজির শতকরা ৫০ ভাগ রপ্তানি করা হয় মধ্যপ্রাচ্যের ছয়টি দেশে, শতকরা ৩১ ভাগ রপ্তানি করা হয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাত-আটটি দেশে, দূরপ্রাচ্যে রপ্তানি করা হয় শতকরা ১৩ ভাগ আর বাকি শতকরা ৬ ভাগ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে।

পশু খামারকরণের জন্য আমাদের বহু রকম উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। গো-মহিষাদি এবং মোরগের জন্য ওষুধ, ভেকসিনসহ হাঁস-মুরগির খামারের অন্যতম প্রধান উপকরণ মুরগির বাচ্চা বা লেয়ার মুরগি ও হাঁস-মুরগি ও গো-মহিষাদির খাবারের কিছু উপকরণও বিদেশ থেকে আমাদানি করতে হয়। আমরা প্রতি বছরই অনেক পরিমাণ গুঁড়ো দুধ আমদানি করে থাকি। মাছের ক্ষেত্রে আমাদের মাছ ধরার জালের উপকরণ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি বাণিজ্যের অবদান

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষি এদেশের অর্থনীতির এক বড় নিয়ামক শক্তি। কেবল খাদ্য উপাদান নয় বরং কৃষিতে নিয়োজিত এদেশের শতকরা ৫০ ভাগেরও অধিক জনগোষ্ঠীর ভাগ্য কৃষি বাণিজ্যের সফলতা-ব্যর্থতার উপর সরাসরি নির্ভরশীল। তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষি আমাদের জিডিপির শতকরা ১৬.৫ ভাগ অবদান রেখেছে (Ministry of Finance, 2015)। কৃষিজ উৎপাদন সরাসরি কৃষিজ বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। যতটা দক্ষভাবে কম খরচে কৃষিজ পণ্য ও কৃষি উপকরণ ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, ততটা কৃষি উন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। কৃষি বাণিজ্যের সঙ্গে সে কারণেই কৃষিজ উৎপাদন সরাসরি জড়িত। আমাদের পাট রপ্তানি ব্যাহত হলে পাটের মজুদ বেড়ে যায় বলে পরের বছর পাটচাষিরা পাটের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। তার মানে আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদার সঙ্গে আমাদের কৃষকদের ভাগ্য এবং পাটচাষের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

বাংলাদেশে বাণিজ্যনীতিতে মুখ্য পরিবর্তন সাধন করা হয় ১৯৯০-এর গোড়ার দিক থেকে। সে সময় বিভিন্ন রকম শুল্ক হ্রাস করা, আমদানি শুল্ক বাদ দেওয়া, বাণিজ্য সম্পর্কিত পরিমাণগত বিধিনিষেধ অপসারণ, আমদানি লাইসেন্সিং পদ্ধতি অপসারণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ কৃষি বাণিজ্যে বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ২০০০ সাল থেকে কৃষিজ রপ্তানির ক্ষেত্রে সরাসরি নগদ ভর্তুকি প্রদান করা শুরু হয় যা কৃষিজ এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়। আবার ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সারের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকি প্রদান করায় ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য হ্রাস পাওয়ায় সুষম সার প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উর্বরতা রক্ষার পাশাপাশি ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়।

আগামী দিনেও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলকভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে বাংলাদেশে বাণিজ্য উদারীকরণ করা যেতে পারে। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, উচ্চ ফলনশীল বীজ এবং দানাশস্য, উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল, মৎস্য, সামুদ্রিক খাদ্য, হাঁস-মুরগি এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প উৎপাদন সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিষয়ক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ বাণিজ্যে উদারীকরণ নীতি অবলম্বন করায় মূলত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কৃষি বাণিজ্যের খানিকটা অবসান ঘটতে শুরু করে। ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিক থেকে

www.pathagar.com

এদেশে বেসরকারি খাতে কৃষি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে সার, সেচযন্ত্র এবং বীজ আমদানি করা, বিক্রয় ও বিতরণ করার নীতির পরিবর্তনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র ডিজেল ইঞ্জিন আমদানি করার উপর বিদ্যমান বাধানিষেধ প্রত্যাহার করা হলে দ্রুত এসব ইঞ্জিন দেশে আমদানি করা হয়। গভীর এবং অগভীর নলকূপের উপর থেকে আমদানি শুল্ক বিলুপ্ত করার ফলে সেচ ইঞ্জিনের সহজ প্রাপ্যতার কারণে সেচ ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। সারের পাশাপাশি প্রাইভেট সেক্টর এবং এনজিওগুলোকে দেশে ফসলের বিভিন্ন রকম জিন সম্পদ আমদানি করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এসব সেক্টরের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন বা বীজ আমদানি করে তা স্থানীয় বাজারে বিপণন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বেসরকারিখাতে খাদ্যশস্য আমদানির অনুমতি দেওয়ায় দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ বেড়েছে এবং মূল্যস্থিতি রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি। আর কৃষিবাণিজ্য হচ্ছে উৎপন্ন ও প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেবার একটি উপায়। স্থানীয়ভাবে কৃষিপণ্য লেনদেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে কৃষিজ পণ্য, কৃষি সহায়ক ও কৃষি উৎপাদন উপকরণ আমদানি-রপ্তানির মধ্য দিয়ে দেশের কৃষিবাণিজ্য কর্ম সম্পাদিত হয়। কৃষিবাণিজ্য সম্প্রসারিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং গুণমান সমৃদ্ধ খাদ্য তুলনামূলভাবে কমদামে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়। কৃষিবাণিজ্য আয় বৃদ্ধি করে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। কৃষিবাণিজ্যের সঙ্গে অনেক রকম সেবা খাত জড়িত। বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ এবং পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতেও কৃষি খাত তথা কৃষিবাণিজ্যের অবদান রয়েছে। তবে বহির্বিশ্বে কৃষিজ পণ্য রপ্তানি বাড়াতে হলে কৃষিজ পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ একান্ত আবশ্যক। তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কৃষিপণ্যের মান রক্ষার বিষয়টিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে বৈদেশিক কৃষিবাণিজ্য বৃদ্ধি করতে হলে নির্বাচনমূলকভাবে এবং সতর্কতার সঙ্গে কৃষি বাণিজ্য উদারীকরণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত, পরিবেশ সহনশীল প্রযুক্তি বাণিজ্য, উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ এবং প্রযুক্তিসম্পর্কিত বাণিজ্য যা আমাদের স্থানীয় পরিবেশে সহজে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হবে। তবে আমাদের স্থানীয় বাজারে বাইরের কৃষিপণ্যের আমদানির ক্ষেত্র প্রসারিত করার সময় আমাদের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ ও শিল্প ইউনিটগুলো স্বার্থ এবং আমাদের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের স্বার্থ অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

Akanda, M.A.L, Mian, M.A.K., Rashid, M.H. & Karrim, M.R. (2012). '*Genetic Improvement of Sesame and Minor Oilseeds in Bangladesh'. In M.A. Bakr & H.U. Ahmed (Eds.), Advances in Oilseed Research in Bangladesh*. Gazipur: Oilseed Research Center, Bangladesh Agricultural Research Institute, Gazipur, Bangladesh.

Ministry of Finance. (2015). *Bangladesh Economic Review*. Dhaka: Bangladesh Government Press.

www.pathagar.com

৭. কৃষিতে মেধাস্বত্ব

মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

সম্পদের আভিধানিক অর্থ হলো সম্পত্তি যা ভূমি, মালামাল বা অর্থকে বোঝায়। এসব সম্পদ স্পর্শকর, বস্তুগত বা ভৌত সম্পদ। এদের মালিকানা স্বত্ব রয়েছে। এসব সম্পদের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত আইনে রয়েছে। এসব দৃশ্যমান সম্পদের বাইরেও আর এক প্রকার সম্পদ রয়েছে, যাকে মেধাসম্পদ এবং ইংরেজিতে Intellectual Property বলা হয় (Chawla, 2007)। কোনো বিশেষ একটি ধারণা, একটি নকশা, একটি আবিষ্কার, একটি পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি মেধাসম্পদের অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে একটি ব্যবহার উপযোগী পণ্য বা একটি নান্দনিক ও শিল্পিত অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। এসব সম্পদ সৃষ্টির পেছনে ব্যয় করতে হয় অনেক মেধা, সময় ও অর্থ। ফলে মেধাসম্পদ নকল করে অন্য কেউ যেন উদ্ভাবককে ন্যায্য মুনাফা থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, এর জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ আইনগত অধিকার। মেধাসম্পদ রক্ষার এই আইনগত অধিকার হলো মেধাসম্পদ স্বত্ব বা সংক্ষেপে মেধাস্বত্ব এবং ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Intellectual Property Rights (IPR)।

মেধাস্বত্ব রক্ষার জন্য যেসব আইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চালু রয়েছে সেগুলো হলো—পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট, ট্রেড সিক্রেট, ইউলিটি মডেল, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইত্যাদি।

কৃষিতে ব্যবহৃত মেধাস্বত্ব

আমাদের বহুমাত্রিক চাহিদা মেটাতে রূপান্তরিত হতে হচ্ছে কৃষিকে। আধুনিক কালের কৃষিতে এসে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি। অল্প জমিতে ফলাতে হচ্ছে অধিক ফসল। প্রাকৃতিক মৎস্য চাষের বদলে শুরু হয়েছে ব্যাপকভিত্তিক কৃত্রিম মৎস্যচাষ। বেশ বেড়েছে এদেশে হাঁস-মুরগির খামারও। অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় আমাদের কৃষি এখন অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে। এসব নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রসার আর প্রয়োগ বৃদ্ধি করেছে আমাদের ফসলের ফলন, মৎস্য এবং মাংস ও ডিম উৎপাদনের পরিমাণ। বহু অর্থ ব্যয়, মেধা সংযোগ আর গবেষণার ফলে তৈরি হয় এক একটি প্রযুক্তি। ফলে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পেছনে এই যে বাড়তি মেধা, মনন

www.pathagar.com

আর অর্থ ব্যয় করতে হয় তার একটি সুফল কিন্তু উদ্ভাবক বা উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান পেতে চায়। সে কারণেই কৃষিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য নানা রকম মেধাস্বত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কার্যকর রয়েছে (Singh, 2000)।

কৃষিতে ব্যবহৃত মেধাস্বত্বগুলো হলো–

- ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য
- পেটেন্ট
- প্ল্যান্ট ব্রিডারস্ রাইটস
- ট্রেড সিক্রেট
- ট্রেড মার্ক
- কপিরাইট

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য

কোনো দেশের নানা ভৌগোলিক পরিবেশে সৃষ্ট নানা কৃষিজ ও অকৃষিজ প্রাকৃতিক বা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে প্রস্তুতকৃত এবং ঐ দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা বিশেষ গুণে গুণান্বিত পণ্যকে জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন বা 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য' হিসেবে অভিহিত করা হয়। কোনো দেশের নানা অঞ্চলের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন রুচি আর ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্য ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের স্বত্ব জিআইসংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে রক্ষা করা সম্ভব।

আমাদের দেশেও অঞ্চলভেদে উৎপাদিত কৃষিজ ভৌগোলিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে কিছু ফসল, ফসলের জাত, রয়েছে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য, নানা রকম ফল, সবজি এবং দুগ্ধজাত নানা রকম পণ্য। এদের কোনো কোনোটা প্রাকৃতিকভাবে কোনো কোনো অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করেছে। মানুষ সেটা বাছাই করে নিয়ে লালন করছে দিনের পর দিন। কোনো কোনো ফসল আর কোনো কোনো ফসলের জাত দেশের কোনো কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে সবচেয়ে ভালো জন্মায়। সেসব নির্দিষ্ট অঞ্চলের ফসল আর ফসলের জাতের রয়েছে বিশেষ কিছু গুণ। সে গুণের কারণেই এদের এত সুনাম। ফসলের মধ্যে সিলেটের সাতকরার রয়েছে এক বিশেষ আলাদা বৈশিষ্ট্য। মুন্সিগঞ্জের অমৃত সাগরকলা, শ্রীমঙ্গলের খাসিয়া পান এমনিতর বিশেষ এলাকায় উৎপাদিত কিছু ফসলের উদাহরণ। এসব ফসলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ দেশের মানুষের কাছে এদের অনেক কদর। এমনিতর আরও ফসলের মধ্যে রয়েছে শ্রীমঙ্গলের চা এবং মধুপুরের আনারস। কোনো ফসলের আবার অনেক জাত আবাদের আওতায় থাকলেও কোনো কোনো বিশেষ এলাকায় আবাদকৃত ফসলের বিশেষ বিশেষ জাতের রয়েছে আলাদা কদর। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম, গফরগাঁওয়ের তাল্লা বেগুন, দিনাজপুরের কাটারিভোগ আর ঠাকুরগাঁওয়ের সূর্যপুরি আমের তেমনি আলাদা মর্যাদা ও সুনাম রয়েছে। এরা আমাদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী বাছাই করে নেওয়া নানা রকম ফসল আর ফসলের জাত। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কৃষি ও কৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে আমাদের এসব ফসল আর ফসলের জাত।

www.pathagar.com

এদেশের মানুষের অতি প্রিয় ও এদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকা অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যও আমাদের রয়েছে। এসব পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যশোরের খেজুরের গুড়, কালিয়াকৈরের ধনীর চিঁড়া, কুষ্টিয়ার তিলের খাজা, কুলিয়ারচরের সিদল শুঁটকি, বগুড়ার দই, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, মুক্তাগাছার মণ্ডা, পোড়াবাড়ির চমচম, যশোরের জামতলার রসগোল্লা এমনিতর কত কত কৃষিজ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য। বাংলার কালো ছাগল, চিটাগাংয়ের লাল গরু 'রেড চিটাগাং' আমাদের একেবারে নিজস্ব প্রাণিজ সম্পদ। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আমাদের দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত কালো ছাগলের নিবাস। এর জনপ্রিয় নাম হলো 'ব্ল্যাক বেঙ্গল'। এ ছাগল রোগবালাই সহিষ্ণু আর এর মাংসও অতি উত্তম। অল্প আয়াসে এ ছাগল পালন সম্ভব। চিটাগাংয়ের 'রেড চিটাগাং' এদেশের নিজস্ব গরু। রেড চিটাগাং গাভি দৈনিক ৩-৪ লিটার দুধ দেয়। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অধিক। দেশি ব্রিডগুলোর মধ্যে অনেক কারণেই এরা বিশেষত্বের দাবিদার। এসব কোনো কোনো প্রাণিজ সম্পদও আমাদের মেধা সম্পদ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। এলাকাভিত্তিক গড়ে ওঠা এসব ফসল ও ফসলের জাত, শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, প্রাণিসম্পদ কিংবা দুগ্ধজাত পণ্য আমাদের অহংকারের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এসব কৃষিজ পণ্যের একটি বিশেষ ও আলাদা মূল্য রয়েছে আমাদের কাছে। অঞ্চলের নামের সঙ্গে পণ্যটির নাম মিলে সে এক আলাদা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

অতি মূল্যবান এসব কৃষিজ সম্পদের কোনো কোনোটার উদ্ভাবনের পেছনে রয়েছে এদেশের মানুষের শ্রম ও মেধা। দীর্ঘদিন ধরে কোনো একদল মানুষ বিশেষ মমতায় নির্মাণ করছে কোনো কোনো কৃষিজাত পণ্য। বংশ পরম্পরায় তাদের দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞান ধারণ করেছে নির্দিষ্ট এলাকার মানুষ। নির্মাণ করেছে মানুষের প্রিয় এক একটি পণ্য পরম নিষ্ঠায়। বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক একটি অঞ্চল থেকে এরা চলে যাচ্ছে দেশের নানারকম ভোক্তাদের কাছে। এসব পণ্যের এই যে চাহিদা আর সুনাম সেটি কপট ব্যবসায়ীদের কাছে ধরা পড়েছে সেই কবেই। ফলে দেশের অন্য স্থানে উৎপাদিত এসব পণ্যের গায়েও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার নাম উল্লেখ করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। গুণের দিক থেকে এসব পণ্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত পণ্যের চেয়ে অনেক নিচুমানের। পণ্যের গায়ে প্রদর্শিত লেবেলের মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছে ভোক্তাগণ। আইনের মাধ্যমে এসব ভৌগোলিক পণ্য রক্ষার কোনো সুযোগ এদেশে গড়ে ওঠেনি বলে মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। সুনাম হারাচ্ছে এসব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। সঠিক মূল্যও পাচ্ছে না পেশাদার উৎপাদকগণ। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছি। সে কারণেই আজ এসব সম্পদের স্বত্ব সুরক্ষায় প্রয়োজন যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক পণ্যের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টির জন্যও আইনের মাধ্যমে এদের সুরক্ষা জরুরি। কোনো এলাকার এক একটি নির্দেশক দ্রব্যের আইনগত স্বীকৃতি সে পণ্যটি আনইগতভাবে ওই এলাকার গর্বের প্রতীক হয়ে উঠবে। ভোক্তাগণ তার পরম কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি পরম নিশ্চিন্তে তৃপ্তি সহকারে ভোগ করতে সক্ষম হবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রণীত খসড়া আইন ২০১৩ সালে বাংলাদেশে 'ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন ২০১৩' শিরোনামে সংসদে পাস করা হয়েছে। এ আইনটিকে প্রয়োগ

www.pathagar.com

করার জন্য বিধিবিধান সৃষ্টির কাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব এসব বিধিবিধানের সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে আমাদের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যগুলোকে রক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের কৃষি ও কৃষ্টির সঙ্গে অম্বিষ্ট এবং আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এসব ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পদ রক্ষার জন্য আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে। আমাদের অবহেলায় এসব সম্পদ এদের বৈশিষ্ট্য হারাক এবং অন্য কোনো দেশ এদের মেধাস্বত্ব অর্জন করুক সেটি কিছুতেই আমাদের কাম্য হতে পারে না।

পেটেন্ট

আমাদের দেশে শিল্প কারখানার জন্য উদ্ভাবিত 'প্রসেস' বা 'প্রোডাক্ট' পেটেন্ট করা কোনো নতুন বিষয় নয়। শিল্প কারখানার জন্য উৎপাদিত বিশেষ কৃৎকৌশল, ফর্মুলা বা প্রযুক্তির স্বত্ব রক্ষায় পেটেন্ট করার রেওয়াজ আমাদের দেশে চালু রয়েছে শত বর্ষ ধরে। পেটেন্ট এবং ডিজাইন অ্যাক্ট ১৯১১ অনুযায়ী এদের সুরক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। ২০০৩ সালে এই আইনটিকে সংশোধন করা হয় এবং এটি পেটেন্ট অ্যান্ড ডিজাইন আইন ২০০৩ নামে সংসদে পাস করা হয়। তবে আমাদের বিদ্যমান পেটেন্ট আইনে জীবজ কোনো অংশ পেটেন্ট করার সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। অথচ জীবপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য ১৯৮০ সাল থেকেই পেটেন্ট করার প্রথা চালু হয়েছে আমেরিকাতে (Singh, 2000)। জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত করে এখন কৃষিতে বিশেষ করে ফসলের ক্ষেত্রে নানারকম কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ফসলের জাত তৈরি করা হচ্ছে। এসব ট্রান্সজেনিক ফসলের জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে কীট প্রতিরোধী জাত, রয়েছে আগাছানাশক প্রতিরোধী জাত, ভাইরাস প্রতিরোধী ফসলের জাত। উদ্ভাবিত হয়েছে অধিক গুণমানসম্পন্ন কয়েকটি জিএম জাতও। জিএম জাত উদ্ভাবনকারী বিদেশি প্রাইভেট বীজ কোম্পানিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব ফসল নিয়ে ব্যবসা করতে আগ্রহী। যেসব দেশে যুগোপযোগী পেটেন্ট বা পিবিআর আইন নেই এসব জিএম জাত নিয়ে সেসব দেশে বাণিজ্যে লিপ্ত হতে পারছে না বীজ কোম্পানিগুলো। আর এ ধরনের মেধাস্বত্ব আইনের অভাবে এসব জিএম জাতের সুবিধা ভোগ করা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের দেশের মতো কোনো কোনো দেশ। পেটেন্ট আইনে উদ্ভিদের মেধাস্বত্ব প্রদানের বিধান থাকলে কিন্তু এর মাধ্যমেও ফসলের জাত বা গৃহপালিত পশুর নতুন নতুন ব্রিডের স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রে ফসলের নতুন জাতের মেধাস্বত্বের জন্য পেটেন্ট আইনকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

আমাদের দেশে কৃষির কোনো কোনো উদ্ভাবনের মেধাস্বত্ব পেটেন্ট আইনের মাধ্যমে রক্ষা করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে, কৃষিতে ব্যবহার উপযোগী নানারকম খামার যন্ত্রপাতি যেমন–স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত হার্ভেস্টার, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি নানারকম কৃষি যন্ত্রপাতি পেটেন্টের মাধ্যমে উদ্ভাবকের স্বার্থ রক্ষা করা যায়। তবে আমাদের পেটেন্ট আইনের মাধ্যমে উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ পণ্য বা জীবের জিন পেটেন্ট করার কোনো সুযোগ নেই। জীবের জিন পৃথক করে নিয়ে তা রূপান্তর ঘটিয়ে নিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে এখন তা পেটেন্ট করা হচ্ছে। আমাদের পেটেন্ট আইনে এসব বিষয় সংযুক্ত করা হয়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আওতার মধ্যে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে না বলে।

www.pathagar.com

প্ল্যান্ট ব্রিডারস্ রাইটস

পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে কৃষিতে মেধাস্বত্বের যাত্রা শুরু হয়েছে মূলত ফসলের নতুন নতুন উদ্ভাবিত জাতের স্বত্বাধিকার রক্ষার মধ্য দিয়ে। একটা সময় ছিল যখন পাবলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহেই ফসলের নতুন জাত সৃষ্টির কর্মকাণ্ড চলত। এসব নতুন জাতের বীজ কৃষকের কাছে সরবরাহ করে কাঙ্ক্ষিত ফলন লাভই ছিল এসব গবেষণা কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য। শিল্পোন্নত দেশেগুলোতে ফসলের নতুন জাতের প্রতি কৃষকদের প্রবল আগ্রহের কারণে প্রাইভেট বীজ কোম্পানিগুলো ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দক্ষ গবেষকদের নিয়োগ দিয়ে জাত উদ্ভাবন করতে শুরু করে। দিনে দিনে নতুন জাত উদ্ভাবনের কাজটি প্রাইভেট বীজ কোম্পানির হাতেই চলে যায়। অনেক অর্থ ব্যয় করে উদ্ভাবিত এসব জাতের বীজ বর্ধন এবং এদের বিক্রয়ের একচ্ছত্র অধিকারের দাবি ওঠে প্রাইভেট কোম্পানির কাছ থেকে। তাদের এ দাবির প্রেক্ষিতেই কোনো কোনো দেশে তৈরি হয় ফসলের নতুন জাত সুরক্ষায় মেধাস্বত্ব আইন। এভাবেই আইনের মাধ্যমে অর্থ ব্যয় করে উদ্ভাবিত জাত থেকে আর্থিক মুনাফা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের মেধাস্বত্বকে বলা হয় প্ল্যান্ট ব্রিডারস্ রাইটস্ (Plant Breeder's Rights বা সংক্ষেপে PBR)।

১৮৬৬ সালে উদ্ভিদের মেধাস্বত্ব প্রদানের লক্ষ্যে জার্মানিতে প্রথম পেটেন্ট আইন চালু করা হয় (Singh, 2000)। ১৯৩৮ সালে উদ্ভিদ প্রজননবিদদের অধিকার রক্ষার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকারকে অনুপ্রাণিত করার জন্য গঠিত হয় International Organization for Plant Variety Protection (ASSINEL)। প্ল্যান্ট ব্রিডারস রাইটস প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান, এ সংক্রান্ত আইনে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য ১৯৬১ সালে গঠন করা হয় International Union for Protection of New Plant Varieties যাকে UPOV বলা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে UPOV আইন ১৯৭৮ প্রবর্তন করা হয় এবং এ আইনটি ১৯৯১ সালে সংশোধন করা হয় (Singh, 2000)। পৃথিবীর বহু দেশ UPOV আইনের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে নিজ নিজ দেশের আইনকে যুগোপযোগী করে নিয়েছে।

বাংলাদেশে প্রস্তাবিত এই আইনটিতে কেবল প্রজননবিদদের নয় বরং পাশাপাশি কৃষকের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি মাথায় রেখে উদ্ভিদজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০১৫-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এটি মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হলে সংসদে উত্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হবে। এ আইনটি পাস হলে দেশে বেসরকারিভাবে নতুন জাত উদ্ভাবনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং বিদেশে উদ্ভাবিত নতুন জাত বা জিএমও আমাদের দেশে বাণিজ্যিক আবাদের জন্য প্রবর্তন করা সম্ভব হবে। এই আইনে কোনো ফসলের জাতের মেধাস্বত্ব পেতে হলে চারটি শর্ত পূরণ অত্যাবশ্যক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শর্তগুলো হলো–

- জাতটিকে অবশ্যই নতুন হতে হয়।
- এর কিছু সুনির্দিষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়।
- জাতটির বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যাবলি বংশানুক্রমিকভাবে অবিকৃত থাকতে হয়।
- নতুন জাতটির উদ্ভিদগুলোর সমরূপতা থাকতে হয়।

www.pathagar.com

এই খসড়া আইন অনুযায়ী ফসলভেদে এরকম জাত ১৫-২০ বছরের জন্য জাত উদ্ভাবনকারী বিজ্ঞানী বা প্রতিষ্ঠান জাতটির বাণিজ্যিক উৎপাদন, বিক্রয় বা এর লেনদেনের একচ্ছত্র অধিকারী হবে। এই খসড়া আইনটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রজননবিদদের মেধাস্বত্ব পাওয়া জাতের উপর কৃষকের কিছু বাড়তি অধিকার। কৃষক মেধাস্বত্ব পাওয়া জাতটির বীজ সংরক্ষণ করতে পারবেন, তবে তার সংরক্ষিত বীজ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা অন্য কৃষকের নিকট বিনিময় করতে পারবেন না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য মেধাস্বত্ব প্রাপ্ত জাতটিকে ব্যবহার করা যাবে কোনো রকম অনুমতি ছাড়াই। তবে যেসব বৈশিষ্ট্যের জন্য জাতটি মেধাস্বত্ব পাবে নতুন গবেষণা থেকে উদ্ভাবিত জাতটিতে যদি ঐ সব বৈশিষ্ট্যাবলি স্পষ্ট হয় তাহলে নতুন জাতের মেধাস্বত্ব কিন্তু নতুন উদ্ভাবকের না হয়ে আগের উদ্ভাবকেরই থেকে যাবে। এই হলো অতি সংক্ষেপে খসড়া উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০১৫-এর মূল বিষয়।

ট্রেড সিক্রেট

শিল্প কারখানার নানারকম উদ্ভাবনের জন্য এই মেধাস্বত্ব আইনটির প্রয়োগ হচ্ছে অনেকদিন ধরেই। আমাদের দেশেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই আইনটির প্রয়োগ হচ্ছে কোমল পানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে হরহামেশাই। কোকাকোলা, পেপসি বা স্প্রাইট উৎপাদনের জন্য প্রতিটির এক একটি নিজস্ব ফর্মুলা রয়েছে। এই ফর্মুলাটি কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে এক একটি কোমল পানীয়, তবে ফর্মুলাটি কী তা থেকে যাচ্ছে জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে। অন্য অনেক প্রোডাক্টের মোড়কের গায়ে কিন্তু এর বিভিন্ন উপকরণের বিবরণ দিতেই হয় অথচ কোমল পানীয়ের বিষয়ে তা বাধ্যতামূলক নয়। এই যে ফর্মুলা প্রকাশনা না করার অধিকার সেটিই হলো কোম্পানির মেধাস্বত্ব অধিকার। এরই নাম হলো ট্রেড সিক্রেট। আধুনিক কালের মেধাস্বত্ব আইন অপ্রকাশিত তথ্যের (undisclosed information) অন্তর্ভুক্ত এটি।

কৃষিতেও কোনো কোনো উদ্ভাবনের সকল কথা উৎপাদনকারীকে না দেবার এই অধিকারটি উদ্ভাবকের রয়েছে। জীবপ্রযুক্তিনির্ভর পণ্য বা প্রোডাক্ট তৈরির জন্য যেসব জীবজ পদ্ধতি জড়িত সেসব গোপন রাখার মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা পাওয়া যায় এর মাধ্যমে। কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ করে ফসলের হাইব্রিড জাত সৃষ্টির গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মেধাস্বত্ব অধিকার। ফসলের হাইব্রিড জাত এখন পৃথিবী জুড়েই খুব জনপ্রিয়। সবজি এবং ফল ছাড়াও দানা শস্যের ক্ষেত্রে হাইব্রিড জাত অত্যন্ত সফল। ভুট্টার হাইব্রিড জাত এখন ভুট্টাচাষের সিংহভাগ এলাকা দখল করে ফেলেছে পৃথিবীর বহু দেশে। ধানের হাইব্রিড জাতের আবাদও দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। ফসলের হাইব্রিড জাতের মেধাস্বত্ব কিন্তু সংরক্ষিত হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই। সাধারণত অনেক ফসলেই তিন রকমের লাইন লাগে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদনের জন্য (Singh, 2000)। এই তিনটি লাইনকে 'এ' লাইন, 'বি' লাইন এবং 'আর' লাইন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য মাঠে লাগাতে হয় 'এ' লাইন আর 'আর' লাইন। 'এ' লাইন হলো স্ত্রী লাইন আর 'আর' লাইন হলো পুরুষ লাইন। 'আর' লাইনের পরাগ স্ত্রী লাইনের গর্ভমুণ্ডে সংযোজন করার মাধ্যমে তৈরি হয় হাইব্রিড বীজ। অর্থাৎ হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য কিন্তু মাঠে 'বি' লাইনের প্রয়োজন হচ্ছে

www.pathagar.com

না। 'এ' লাইনের বীজ বর্ধনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে 'বি' লাইন। ফলে হাইব্রিড জাত উৎপাদনকারী সংস্থা বা দেশ বীজ উৎপাদনের জন্য 'এ' লাইন আর 'আর' লাইন উৎসাহী বীজ কোম্পানিকে সরবরাহ করলেই চলছে। 'বি' লাইনটি থেকে যাচ্ছে উদ্ভাবনকারী সংস্থার হাতেই। আর সে কারণেই প্রতি বছর বাধ্যতামূলকভাবে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের জন্য আমাদের কিনে আনতে হচ্ছে উদ্ভাবক সংস্থার কাছ থেকে 'এ' আর 'আর' লাইন। অনেক শ্রম, মেধা আর গবেষণার ফসল হাইব্রিড জাত বিপণন করে এভাবেই মুনাফা নিশ্চিত করছে উদ্ভাবনকারী সংস্থা। উদ্ভাবিত 'বি' লাইনটি বীজ উৎপাদনকারী সংস্থাকে না দিতে পারার মধ্য দিয়ে উদ্ভাবনকারী সংস্থার মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত হচ্ছে। তথ্য প্রকাশ না করার জন্য যে মেধাস্বত্ব এখানে প্রযোজ্য হচ্ছে একেই কিন্তু বলা হচ্ছে 'ট্রেড সিক্রেট'। 'বি' লাইনের তথ্য এবং লাইনটি বীজ উৎপাদকের নিকট সরবরাহ না করার মধ্য দিয়ে মেধাস্বত্ব অধিকারটি রক্ষিত হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় এই মেধাস্বত্ব রক্ষার সুযোগটি আছে বলেই কিন্তু এতটা সহজে আমরা পাচ্ছি নানা দেশ থেকে লাইন এনে হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের সুযোগ।

ট্রেডমার্ক

ট্রেডমার্ক হলো একটি চিহ্ন বা কোনো কোম্পানির লোগো অথবা একটি স্বাক্ষর, যার সাহায্যে একটি ব্যবসার পণ্য বা সেবা অন্য ব্যবসায়ীর পণ্য বা সেবা থেকে আলাদা করা যায়। রেজিস্ট্রিভুক্ত ট্রেডমার্ক দ্বারা একজন ব্যবসায়ী তার পণ্য যেন অন্য কোনো লোক একই নাম বা লোগো ব্যবহার করে সে পণ্যটি বিক্রয় করতে না পারে সেটি হলো ট্রেডমার্ক প্রদানের অন্যতম লক্ষ। কোনো অক্ষর, কোনো শব্দ, কোনো নাম, স্বাক্ষর, লেবেল, কোনো আকৃতি বা বর্ণ ব্যবহার করে ট্রেডমার্ক অর্জন করা যায়। সাধারণত যে কোনো পণ্য নিয়মমাফিক আবেদন করে ট্রেডমার্ক পেতে পারে। কৃষিপণ্যের 'ব্র্যান্ডিং' করার লক্ষ্যে প্রায় সব প্রাইভেট বীজ কোম্পানি নানারকম চিহ্ন ব্যবহার করে তাদের পণ্যের মেধাস্বত্ব অর্জন করতে চায়, যেমন—লাল তীর প্রাইভেট বীজ কোম্পানি তাদের বীজের প্যাকেটে 'লাল তীর' চিহ্ন দিয়ে এর মেধাস্বত্ব রক্ষা করছে।

কপিরাইট

কোনো রচিত বা সম্পাদিত গ্রন্থ, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সৃষ্টি পেটেন্টযোগ্য নয়। এদের কপিরাইট নামক মেধাস্বত্ব আইন দ্বারা সুরক্ষা করা যায়। কৃষি সম্পর্কিত বিশেষ করে জীবপ্রযুক্তিগত সম্পাদিত গ্রন্থ বা অডিও ক্যাসেট বা কোনো গ্রন্থ যেন অন্য কেউ এর ফটোকপি বা অন্য কোনোভাবে এর কপি করে বিক্রি না করতে পারে সে জন্য কপিরাইট মেধাস্বত্ব আইন প্রয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে গ্রন্থ বা সফটওয়্যারের হুবহু আংশিক বা সম্পূর্ণ ফটোকপি করা বা নকল করা রোধ করা যায়। তবে গ্রন্থ পাঠ করে তা থেকে ধারণা গ্রহণ করতে এ আইন কাউকে বাধা দেয় না। কম্পিউটার সফটওয়্যারও কপিরাইট আইনের আওতাভুক্ত। আমাদের দেশে ২০০০ সালে কপিরাইট আইন সংসদে অনুমোদিত হয়েছে তা ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কৃষিতে মেধাস্বত্ব ব্যবস্থাপনা

ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে ১৯১১ সালের ১১ মার্চে প্রণীত হয় The Patent and Design Act, 1911 এবং ১৯৩৩ সালে প্রণীত হয় Patent and Design Rules 1933। ব্রিটিশ ভারতে ট্রেডমার্কবিষয়ক আইন The Trademark Act, 1940 প্রবর্তন করা হয় ১৯৪০ সালের ১১ মার্চ আর এ আইনটি প্রয়োগের জন্য বিধিমালা প্রণীত হয় ১৯৬৩ সালে The Trade Marks Rules 1963 শিরোনামে। আমাদের দেশে কপিরাইট আইন চালু করা হয় ১৯৬২ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষিতে মেধাস্বত্ব প্রদানের জন্য যেসব আইন বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলো হলো—পেটেন্ট ও ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট আইন এবং ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন। কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য উদ্ভাবিত নতুন নতুন খামার যন্ত্রপাতিসহ কৃষি সহায়ক যন্ত্রপাতির জন্য বর্তমানে পেটেন্ট আইনটি কার্যকর রয়েছে। তা ছাড়া কৃষিতে উদ্ভাবিত কোনো কোনো উৎপাদন প্রযুক্তিও এখন পেটেন্ট আইন দ্বারা সুরক্ষা প্রদান করা হয়। এই আইনটিকে ২০০৩ সালে যুগোপযোগী করা হয়েছে। তবে এর মাধ্যমে ফসলের জাতের সুরক্ষা প্রদানের কোনো বিধিবিধান নেই। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইনটি ২০১৩ সালে প্রণীত হলেও এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় বিধিবিধান এখনও তৈরি করা হয়নি। আমাদের এ আইনটিতে কৃষিজাত উৎপন্ন পণ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া থাকলেও ফসলের বিভিন্ন স্থানীয় জাত, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগলের স্থানীয় ব্রিড রক্ষার বিষয়টি খানিকটা অবহেলিত রয়ে গেছে। তা ছাড়া ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা না গেলে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য রক্ষার উদ্যোগ খুব কার্যকর হবার সম্ভাবনা নেই। সাংবাদিকদের এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। ফসলের নতুন নতুন জাত সুরক্ষা করার জন্য আমাদের 'উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ' আইনটিও দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে। এ অইনটির অভাবে প্রাইভেট সংস্থা নতুন নতুন জাত উদ্ভাবনে অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে। তা ছাড়া ফসলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাত সুরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না বলে বিদেশ থেকে নতুন নতুন কোনো কোনো উন্নত জাত দেশে প্রবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমাদের বর্তমানে বিদ্যমান পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন, ট্রেডমার্ক ও কপিরাইট আইনের মাধ্যমে কৃষিতে কোনো কোনো বিষয়ের মেধাস্বত্ব রক্ষায় ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে।

কৃষিতে কোনো আবিষ্কারের জন্য পেটেন্ট করতে হলে বা কোনো প্রোডাক্টের জন্য ট্রেডমার্কস পাওয়ার জন্য পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস ডিপার্টমেন্টের রেজিস্ট্রার বরাবর নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে নির্ধারিত ফি প্রদানকরত আবিষ্কার বা প্রোডাক্ট সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ ও নাম ঠিকানা প্রদান করে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। অতঃপর যথাযথ প্রক্রিয়া শেষ করে আবেদনকারীর আবেদন মতো পেটেন্ট বা ট্রেডমার্কস মেধাস্বত্ব প্রদান করা হয়। কৃষি বা কোনো কৃষি জীবপ্রযুক্তিগত বিষয়ক গ্রন্থ বা সিডি ইত্যাদির কপিরাইট পেতে হলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কপিরাইট অফিসে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্রের ভিত্তিতে কপিরাইট প্রদান করা হয়। ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য বিধি প্রণয়ন সম্পন্ন হলে আমাদের বহু কৃষিজ ঐতিহ্যবাহী পণ্যের মেধাস্বত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে। প্ল্যান্ট ব্রিডারস রাইটস সংক্রান্ত আইনটি সংসদে অনুমোদন লাভ করলে তবে উদ্ভিদ জাত রক্ষায় মেধাস্বত্ব প্রদান করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

www.pathagar.com

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও মেধাস্বত্ব

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে আর্থিক ও অবকাঠামোগত দক্ষতা বেশি থাকায় বিভিন্ন রকম উদ্ভাবন ও আবিষ্কার বেশি হচ্ছে। এসব উদ্ভাবন তারা বাণিজ্যিকভাবে অন্য দেশগুলোত ব্যবসায়িক স্বার্থেই প্রসার ঘটাতে আগ্রহী। অনেক দেশে যুগোপযোগী মেধাস্বত্ব আইন না থাকায় অন্য দেশের উদ্ভাবন যথাযথ আইনে সুরক্ষা পাচ্ছে না বলে উদ্ভাবনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সেসব প্রযুক্তি দিতে অসম্মতি প্রকাশ করছে। বিষয়গুলো উন্নত দেশের নজরে আসায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যের সকল বিষয়ে মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) সকল সদস্যের স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) শিরোনামবিশিষ্ট একটি চুক্তি করে। এ দলিলের মাধ্যমে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্বের বিষয়টি আরও বিস্তৃত করা হয়। দলিলে স্বাক্ষরদাতা দেশগুলোর উপর বিভিন্ন রকম মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়নের এবং বিদ্যমান আইনগুলোর যুগোপযোগী করার বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। বাংলাদেশ এর স্বাক্ষরদাতা একটি দেশ। বাংলাদেশও সেকারণে নানারকম মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং ইতোমধ্যে প্রণীত মেধাস্বত্ব আইন হালনাগাদ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই কোনো কোনো মেধাস্বত্ব আইন রয়েছে যা অন্য দেশের সঙ্গে হুবহু মেলে না। তার চেয়েও বড় কথা এসব মেধাস্বত্ব আইনের যে মূল লক্ষ্য সেটিও অনেক ক্ষেত্রেই এর দ্বারা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেধাস্বত্ব আইন প্রবর্তন, বিধিমালা প্রণয়ন এবং এসব আইন কার্যকর করার জন্য ১৯৭০ সালের ২৬ এপ্রিল World Intellectual Property Organization সংক্ষেপে WIPO স্থাপন করা হয়। এটি ১৯৭৪ সাল থেকে জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়। সকল দেশের মেধাস্বত্ব আইন যুগোপযোগী করা এবং নতুন নতুন মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য WTO জাতিসংঘের এই বিশেষায়িত সংস্থা WIPO-এর সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ট্রিপস চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য দুটি সংস্থার মধ্যে চুক্তিটি ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারি কার্যকর হয়। ট্রিপস চুক্তির মুখবন্ধে এই দুই সংস্থার মধ্যে একটি সহায়ক সম্পর্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে সহযোগিতার তিনটি প্রধান ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়–

- জাতীয় আইন এবং বিধিমালাগুলোর বিজ্ঞপ্তি প্রদান, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অনুবাদ সম্পন্ন করা।
- জাতীয় প্রতীক-প্রতিম বিষয়গুলোর সুরক্ষা প্রদানের জন্য আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

এই চুক্তির বলে WIPO বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেধাস্বত্বের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদানকারী একটি সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়। বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ নীতির কারণে বাণিজ্য প্রসারের প্রেক্ষাপটে WIPO-এর কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনের সংশোধন করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সহায়তাসহ

www.pathagar.com

WIPO বিভিন্ন রকম সহায়তা প্রদান করে থাকে। মেধাস্বত্ববিষয়ক কোনো জটিলতা নিরসনেও WIPO পরমর্শ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

উপসংহার

কৃষি গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আমাদের দেশে এখন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কর্মকাণ্ড চলছে। বেসরকারি উদ্যোক্তা ও গবেষকগণ তাদের গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি অন্য কেউ যেন নকল করে বাজারজাত করতে না পারে সেজন্য তাদের উদ্ভাবনের জন্য মেধাস্বত্ব পেতে সর্বদাই আগ্রহী। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে গতিশীলতা আনার জন্য সকল প্রকার প্রযুক্তির মেধাস্বত্ব প্রদানের আইন ও বিধিবিধান অবশ্যই আমাদের থাকতে হবে। তা ছাড়া অন্য দেশে উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির সুফল যেন আমরা পেতে পারি সে কারণে এসব প্রযুক্তির আইনগত সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টিও বেশ জরুরি। বিজ্ঞানী, গবেষক, উদ্যোক্তা সংস্থা, আইন প্রণেতা, উকিল, সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকেই আজ মেধাস্বত্ব বিষয়ে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকা একান্ত আবশ্যক। যথাসময়ে যথাযথ মেধাস্বত্ববিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন রয়েছে। কেবল আইন প্রণয়নই বড় বথা নয়, আইনের সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজন দক্ষতার সঙ্গে সে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

তথ্যসূত্র

Chawla, H.S. (2002). *Introduction to Biotechnology*. New Delhi, India: Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd.

Singh, B.D. (2000). *Plant Breeding* (6th ed., pp. 832-859). Ludhiana, India: Kalyani Publishers.

www.pathagar.com

৮. কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন

রিয়াজ আহমদ

কৃষির সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং জলবায়ুর পরিবর্তন একে অন্যর উপর প্রভাব রাখে। কৃষিকাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও চর্চা যেমন তার পারিপার্শ্বিক জলবায়ু ও প্রতিবেশকে প্রভাবান্বিত করে তেমনিভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে গোটা কৃষি ব্যবস্থাপনা ও চর্চার ক্ষেত্রেও নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

কৃষিজ উৎপাদন যেহেতু বিশ্বে মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই জলবায়ু পরিবর্তনে এর প্রভাব এবং কৃষির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব–উভয় বিষয়ই আলোচনার দাবি রাখে। বিশেষ করে, আধুনিক কৃষি সাংবাদিকতা চর্চায় জলবায়ু পরিবর্তনের সামগ্রিক বিষয়াবলি অনুধাবন ক্রমশ অধিক জরুরি হয়ে উঠছে। কেননা, প্রাকৃতিকভাবে আমাদের চারপাশের পরিবেশ, প্রতিবেশ, জলবায়ুতে যা কিছু পরিবর্তনই হচ্ছে না কেন, তার চেয়েও বর্তমান বিশ্বে অধিক শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তনসমূহ। এর সঙ্গে কৃষি ও কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার এবং বেঁচে থাকা ও জীবনধারণের অন্যতম শর্ত খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্ক। এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা তখনই পুরোপুরিভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে যখন আমরা কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে সম্যকভাবে এবং সাধারণভাবে কিছু ধারণা লাভ করব। এর শুরুটা হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে আসলে কি বুঝায় সে বিষয়ে কিছুটা আলোকপাতের মধ্য দিয়ে।

জলবায়ু পরিবর্তন কী?

একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের স্বল্প কয়েকদিনের গড় বা ১ থেকে ৭ দিনের গড় ফলকে আবহাওয়া বলা হয়। বায়ুমণ্ডলের উপাদান বলতে বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা, মেঘের পরিমাণ, প্রকারভেদ ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদিকে বোঝায়। আর কোনো স্থানের বা অঞ্চলের দীর্ঘকালের (৩০ বছর বা তারও বেশি

www.pathagar.com

সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়ার পর্যালোচনা করে বায়ুমণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর যে সাধারণ অবস্থা দেখা যায়, তাকে ওই স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে।

বিজ্ঞানীদের মতে, বহুকাল আগে থেকেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পৃথিবীর সকল শক্তির মূলেই রয়েছে সূর্য। সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবনধারণে সাহায্য করে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে (রহমান, ২০০৯)।

খুব অল্প কথায় জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দেওয়া বেশ কঠিন। এটি খুবই বিস্তৃত এবং বহুমাত্রিক একটি বিষয়। তবু কিছু বিষয় উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সার্বিক ধারণা পেতে পারি।

এই মহাজগৎ সৃষ্টি যেমন একটি রহস্য তেমনিভাবে রহস্য ও বৈচিত্র্যময় এর প্রাকৃতিক গঠন, পরিবেশ, আবহাওয়া এবং এসবের ক্রম পরিবর্তন ও রূপবদল। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ অবধি মহাবিশ্বের এবং আমাদের গ্রহ পৃথিবীর ভূতত্ত্বগত কাঠামোর যেমন বহু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন, সম্মিলন, ভাঙন হয়েছে, তেমনিভাবে এর জলবায়ুগত পরিবর্তনও ঘটে চলেছে। মহাকালের হিসেবে মানুষের এক দুটি প্রজন্ম এবং পৃথিবীতে তাদের অবস্থান নেহায়েত চোখের এক নিমেষ মাত্র। তাই এক জীবনে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া জলবায়ুর নানা পরিবর্তন খুব বড় মাপে অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। তবে পরিবর্তন কিন্তু ঘটছে প্রতিনিয়ত এবং অবিরত। সর্বক্ষেত্রে এ ধরনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ঘটতে থাকা জলবায়ু পরিবর্তনকে ক্ষতিকর কিংবা আশঙ্কাজনক ভাবারও কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। সৃষ্টির শুরু হতে পরবর্তী শত-সহস্র কিংবা অযুত বছর ধরে প্রকৃতিগতভাবে পৃথিবী যে অতিউষ্ণ হতে শীতল আবার অতিশীতল হতে উষ্ণ হয়েছে—তা পরবর্তীতে এমন পরিবেশের জন্ম দিয়েছে, যেখানে নানা বৈচিত্র্যময় প্রাণী ও তরুলতার সৃষ্টি ও বেঁচে থাকার ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

এসব প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া এবং অবিরতভাবে ঘটতে থাকা জলবায়ু পরিবর্তনের নানা বৈজ্ঞানিক, ভূতাত্ত্বিক, যৌক্তিক কারণ রয়েছে। সূর্যরশ্মির বিকিরণ, সৌরজগৎ ও ছায়াপথে নানা গ্রহ-নক্ষত্রের চৌম্বকীয় আকর্ষণ ও রাসায়নিক বিকিরণ, পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ টেকটনিক কাঠামোর পরিবর্তন, সমুদ্রের জলরাশির অবস্থান, আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ থেকে শুরু করে আরও অসংখ্য কারণ রয়েছে যেসব দ্বারা প্রকৃতিগতভাবে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে।

কিন্তু আধুনিককালে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝে থাকি এবং বুঝাই তা হচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ নানাবিধ কর্মযজ্ঞ চালিয়ে থাকে। কৃষিপূর্ব যাযাবর জীবন এবং কৃষি-পরবর্তী থিতু জীবন (ঘরবাড়ি তৈরি করে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে দীর্ঘকাল জীবনযাপন অর্থে) এই দুই পর্বেই মানুষের নানা কর্মকাণ্ড এবং জীবনাচরণ পৃথিবীর জলবায়ুর নানারূপ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

www.pathagar.com

দশ হাজার বছর পূর্বে (মতান্তরে, আরও পূর্বে বা পরে) মানুষ যখন কৃষিকর্মের চর্চা শুরু করল তখন পৃথিবীতে মানুষের জীবনাচরণে এক আমূল পরিবর্তন ঘটল। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জমিকর্ষণ ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (ক্ষেত্র ও ফসল ভেদে ৩ মাস, ৬ মাস) ফলের ও ফসলের অপেক্ষায় থাকা অভ্যাস করল এবং গুহা, পর্বত আর জঙ্গলবাসী মানুষ ধীরে ধীরে লোকালয় গড়ে তুলল। এই নতুন জীবনাচরণ তাদের সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে মাটি, পানি, বৃক্ষ, জঙ্গল, আলো, বাতাস, পাহাড়—এসব কিছুর উপর মানুষের অধিক নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা শেখাল।

এরও হাজার বছর পরে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে যে শিল্পবিপ্লবের সূচনা, তার অগ্রভাগে রয়েছে পৃথিবীতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষের পুরোমাত্রায় আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস। জ্বালানির ব্যবহার থেকে শুরু করে কাঠ ও কয়লার ব্যবহার, অধিকহারে মিঠাপানির ব্যবহার—এসবই মানুষ বেশি বেশি হারে করতে শুরু করল অধিক উৎপাদনশীলতা এবং অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাপনের জন্য। এভাবে নির্বিচারে সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ফলে এবং একই সঙ্গে শিল্প ও কৃষি-প্রক্রিয়াজাত কর্মকাণ্ডে পরিবেশদূষণের দিকে পর্যাপ্ত নজর না দেবার ফলে জলবায়ুর উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করল। এসবের প্রধানতম কুফলগুলো হচ্ছে, অধিকতর গ্রিন হাউজ গ্যাস (কার্বনডাইঅক্সাইডসহ ক্ষতিকর গ্যাসসমূহ) নিঃসরণ, পৃথিবীর উষ্ণায়ন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস ও দ্রুত বরফাঞ্চলের গলন-প্রক্রিয়াজনিত কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

কৃষি কেন প্রাসঙ্গিক?

এবার আসা যাক এই প্রসঙ্গে। জলবায়ু পরিবর্তনে কৃষি কেন এত প্রাসঙ্গিক। কৃষিতে এর প্রভাবই বা কী?

আমরা জানি কৃষি উৎপাদন, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, মৎস্য ও পশুপালন ও ব্যবস্থাপনা এবং কৃষিজাত শিল্প নির্মাণ ও পণ্য উৎপাদনে নানা ধরনের ক্ষতিক্ষর গ্যাস ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। বনাঞ্চল উজাড় হওয়া এবং তার ফলে মরুময়তা, বৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হওয়া, গবাদিপশুর গোবর হতে ওজোনস্তর বিনষ্টকারী গ্যাসের নিঃসরণ এসব কিছুরই প্রভাব রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনে।

কিন্তু সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা বিরূপ আবহাওয়ায় প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষিজ উৎপাদন। মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস হতে শুরু করে, অতিবৃষ্টি, খরা, জলদূষণ, সেচের জল ও পশুপালনে জলের অভাব—এসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের।

কৃষিজাত নানা ফল, ফসল, মৎস্য, পশুপালন, বনজ সম্পদ খাত-উপখাতের প্রতিটিতে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কতকগুলো ঋতুচক্র আছে। এসবের সঙ্গে আবহওয়ার (শীত-গ্রীষ্ম, বৃষ্টি, শুষ্কতা, আলো-ছায়া ইত্যাদি) যেমন নিবিড় সম্পর্ক তেমনি মাটি, পানি, পরিবেশ এসবও গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে কাজ করে। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে এসব নিয়ামকের প্রধান চক্র যখন এলোমেলো হয় তখন কৃষিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। উৎপাদনশীলতা কমে যায়।

www.pathagar.com

বহুমাত্রিক প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমাত্রিক প্রভাব পড়ে কৃষিতে। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে অনেক ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বহু এলাকায় কৃষিজমি লবণাক্ততার কবলে পড়ে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের ঋতুচক্রের ব্যত্যয়, বাতাসে কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড় এবং মরুময়তা ও অনাবৃষ্টির কারণেও কমে যায় কৃষির উৎপাদন।

জলবায়ু পরিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট প্রতিফলন হচ্ছে Stress-conditions বৃদ্ধি অর্থাৎ অধিকহারে সাইক্লোন, ঝড়-তুফান, বন্যা, অধিক-হারে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, রাত্রি-দিনের তাপমাত্রার অধিক তারতম্য, অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি ইত্যাদি। এসবের ফলে বিঘ্ন ঘটে কৃষির স্বাভাবিক উৎপাদন (Biswas, 2013)।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঋতুচক্রের প্রচলিত ধারাকে পরিবর্তন করেছে, তেমনি বিভিন্ন মৌসুমে উৎপাদিত ফসলাদির কাঙ্ক্ষিত ফলনের মাত্রার উপর প্রভাব রাখছে। দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার গড় মাপ ও ব্যবধানের মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধিতেও কৃষি উৎপাদনে প্রভাব পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ এবং ফসলের মাঠে, মাটিতে নানা জীববৈচিত্র্য ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া, অণু-পরমাণু পর্যায়ে নানা ধরনের প্রতিবেশগত পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে যা কি না প্রকারান্তরে ফসল ও জলজ ও প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে তারতম্য ঘটায়।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট জলমগ্নতা, বৃষ্টিহীনতা, লবণাক্ততাসহ নানা Stress-conditions কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন উপসর্গ ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কৃষিখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ও ডেনমার্ক কিছু বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেয়। ডেনমার্কের সহযোগিতায় বাংলাদেশ তার কৃষিখাতের নানা উপখাত উন্নয়নে 'কৃষিখাত কর্মসূচি সহায়তা' (Agriculture Sector Programme Support) কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০০ সাল থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী প্রায় এক দশক ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় করা এক প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে বাংলাদেশের কৃষিখাতের উপরে। এতে বলা হয়, কৃষি উৎপাদন নানা চলকের উপর নির্ভর করে; যেমন—তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসে আদ্রতার পরিমাণ, দিনের ব্যাপ্তি ইত্যাদি। এ ছাড়া বন্যা, খরা, মাটি ও পানির লবণাক্ততা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস—এসব প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ কৃষির উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এসব চলকের তারতম্য ঘটে এবং এই কারণে কৃষিখাতে নানা প্রভাব পড়ে। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে ৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে চাল উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগ এবং গম উৎপাদন শতকরা ৬১ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে

www.pathagar.com

(BCAS, 2009)। উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমে যাবার ফলে বোরো ধান আবাদে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বন্যার মতো দুর্যোগে ১৯৮৮ সালে কৃষি উৎপাদন প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিল এবং ২০০৭ সালে এক বিলিয়ন ডলারের ফসলহানি হয়েছিল। তাপমাত্রার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পশুপালনের জন্য ও অনুকূল নয়। বেশি গরমে মানুষের যেমন হাঁসফাঁস অবস্থা হয় তেমনিভাবে পশুসম্পদের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্যও অতিগরম ভালো আবহাওয়া নয়। এতে পশুদের খাদ্য গ্রহণ কমে যায়, শারীরিক ক্লান্তি আসে এবং সার্বিকভাবে পশু সম্পদের বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

খরাজনিত কারণে ও ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাওয়াসহ ফসলে নানা রোগ ও কীটপতঙ্গের উপদ্রব বাড়তে পারে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের উপর (সেচকার্যের জন্য) চাপ বাড়াতে পারে। তাই খরাসহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন, অধিক বৃক্ষায়ন এবং ভূগর্ভস্থের পরিবর্তে ভূ-উপরিভাগস্থ জলের ব্যবহার বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া উচিত। বন্যাজনিত কারণে ফসলহানি, জলাবদ্ধতা ও অবকাঠামো ধ্বংসের আশঙ্কা করা হয়। এ থেকে পরিত্রাণের পথ হিসেবে দ্রুত উৎপাদনশীল (Short-duration) ফসলের জাত উদ্ভাবন, বন্যা-সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন, কমিউনিটিভিত্তিক বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যা-উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন, অতিবর্ষণ, অতিশীত, গরম বৃদ্ধি কিংবা বৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি নানা ধরনের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কৃষির উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা ও আরও বৃদ্ধির উপায় হিসেবে নানা ধরনের Coping mechanism-এর কথা বলা হয়েছে এই প্রতিবেদনে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার প্রকোপ বৃদ্ধি, বিলম্বিত বর্ষা মৌসুম, স্বল্পস্থায়ী শীতকাল, নদীতীরের ভাঙন বৃদ্ধি, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সমস্যার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি একইসঙ্গে এর ফলে কৃষির নানা উপখাতে (যেমন—শস্য, পশুপালন, মৎস্য) এসবের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এবং তা থেকে পরিত্রাণের নানা দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২০১৩ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত Climate Change and Its Impact on Bangladesh শীর্ষক এক প্রতিবেদনেও দেখানো হয়েছে কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলি কৃষি উৎপাদনে প্রভাব রাখে। এতে বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীব্যাপী যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ পড়ছে তার প্রতি ইঙ্গিত করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ ভূ-অঞ্চলই বন্যা-প্রকোপ এলাকা এবং বিশেষ করে দেশের দক্ষিণাঞ্চল ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের বিপদের মুখে রয়েছে (Biswas, 2013)। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল যে লবণাক্ততার শিকার এবং উত্তর ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল যে খরা ও তাপমাত্রা-বৃদ্ধিজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতির সম্মুখীন সেই চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনের যেমন বেশি উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ইত্যাদির ফলে ফসলে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে তেমনি মৎস্য উপখাতের উপরও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে দেশে ২৬০ জাতের মাছের প্রজাতির কথা। এসব মাছের জন্য লোনাপানি ও মিঠাপানির নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যদি এর তারতম্য ঘটে তবে মৎস্য সম্পদের বিকাশে তা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে (Biswas, P-89)।

২০০৯ সালে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ধানের ফুল আসার সময় থেকে বীজ বের হওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় রোপা আমন জাতের ধানের উৎপাদন কমে আসছে। তার পরের বছর ভরা বর্ষায় জয়পুরহাটের কালাই উপজেলায় অনাবৃষ্টিতে আমনধানের বিশাল খেত রোদে পুড়েছে। যেখানে আমনধান রোপণের অন্তত ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত পানি ধরে রাখা নিশ্চিত করতে হয়, নাইলে কুশি বাড়ে না; সেখানে পানির অভাবে জমিতে ফাটল দেখা দিয়েছে।

২০১০ সালে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে। উপকূলীয় অঞ্চল থেকে যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর এবং কুমিল্লা পর্যন্ত উত্তর দিকে বিস্তৃত হয়েছে এই লবণাক্ততা। এর সুস্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে। ১৯৯০ সালে দেশে লবণাক্ত ভূমির পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর, আর ২০০১ সালে তা হয়েছে ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টর। বরিশাল ও পটুয়াখালীতে লবণাক্ততার পরিমাণ ২ পিপিটি (লবণাক্ততা পরিমাপক মাত্রা) থেকে বেড়ে ৭ পিপিটি হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের হালদা নদীর পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৮ পিপিটি। সুন্দরবনের সুন্দরী গাছে ব্যাপক মাত্রায় আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে, যেমন—রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পেয়ে দেখা দিচ্ছে স্থায়ী মরুকরণ।

বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ; তার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন এবং ভূমিধসের মাত্রাবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ২০১০-এর ২৮ মার্চ কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলার সোনাপুর চরে মাত্র ১ মিনিট স্থায়ী একটি শক্তিশালী টর্নেডো ৪০টি ঘর উড়িয়ে নিয়ে ব্রহ্মপুত্রে ফেলে। সাতক্ষীরা ও খুলনার চারটি উপজেলায় ঘূর্ণিঝড় সিডর ও আইলার কথা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা। দিনে দিনে শিলাবৃষ্টি বেড়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে শিলার আকৃতিও বড় হয়েছে। ২০১০-এর ২৭ মার্চ রাতে লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ ও হাতিবান্ধা উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টির সময় পাওয়া শিলা ওজন করে দেখা যায় এর একেকটির ওজন ছিল আধা কেজি করে। এমনকি দেড় কেজিরও শিলা পড়েছে বলে অনেকের দাবি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এর আগে এত বড় শিলার কথা তারা কখনও শোনেননি।

উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, ভোলা ও পটুয়াখালীতে নদীভাঙন বেড়েই চলেছে। সেই তুলনায় যে চর জাগছে তা অপ্রতুল। ভোলার মূল ভূভাগ থেকে ২৪০ বর্গ কিলোমিটার জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। হাতিয়ার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাংশের ২০টি মৌজার বেশিরভাগই নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে। নিঝুমদ্বীপে সরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা বন ধ্বংসের পথে। নদীভাঙন ছাড়াও ঘূর্ণিঝড় আইলায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই কৃত্রিম উপকূলীয় বনটি।

সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নাটোরের হাওর-বাঁওড়, বিল-ঝিলে মাছের প্রজনন মৌসুমে সময়মতো বৃষ্টি না হওয়ায় মাছ ডিম ছাড়তে পারে না। ফলে দেশীয়

www.pathagar.com

নানা প্রজাতির মাছের সংকট দেখা দেয় প্রায়শই। মৎস্যসম্পদ কমে যায়। জেলেরা বেকার হয়ে পড়ে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

কিছু পরিবর্তন প্রাকৃতিক ও অপ্রতিরোধ্য, কিছু পরিবর্তন উপকারী। কিন্তু কিছু পরিবর্তন মনুষ্য সৃষ্ট এবং বৈরী। কিছু পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রগতি। সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে। মানুষ উন্নত ও আধুনিক জীবনাচরণে অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হবার কারণে ওজোনস্তরে অতিবেগুনি রশ্মি সৃষ্টিকারী ক্ষতিকর গ্যাসসমূহের ব্যবহারে বেহিসাবি হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিল্প-বিপ্লব পরবর্তী সময়ে শিল্পবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সারা বিশ্বে মানুষ অনেক বেশি খামখেয়ালি আচরণ করেছে এবং করছে। এমনকি আধুনিক যুগে সোলার-এনার্জি, পারমাণবিক এনার্জি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং এর ব্যবহারপরবর্তী ডাম্পিং ব্যবস্থাপনাও প্রশ্নসাপেক্ষ। পরিবেশ, বিরূপ ও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি সৃষ্টিকারী নানা কর্মকাণ্ড হতে মানুষ এখনও নিবৃত্ত হচ্ছে না। বরং পরিবেশ, প্রতিবেশ ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ডের জন্য অনেক উন্নত (তথাকথিত) দেশ, আপাত প্রগতির বিচারে কম উন্নত দেশগুলোকে অর্থের সূচকে ক্লাইমেট কম্পেনসেশান তহবিল, ঋণ ইত্যাদি অফার করছে। যা বাস্তবিক অর্থে সার্বিক বৈশ্বিক কল্যাণচিন্তায় ও ভবিষ্যৎ বিশ্বমানব প্রজন্মের বিচারে নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা নাপা প্রণয়ন করে। এর পরে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়। ছয়টি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় :

১. খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য
২. সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৩. জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন
৪. গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা
৫. প্রশমন ও স্বল্প কার্বন নিঃসরণ/কার্বন-সাশ্রয়ী উন্নয়ন
৬. সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে ২০১০ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণ/জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই ফান্ড ব্যবহৃত হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সঠিক তদারকির জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছে সরকার। সরকারের নয়জন মন্ত্রী ও তিনজন সচিব এবং সুশীল সমাজের দুজন প্রতিনিধি জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য।

www.pathagar.com

এ ছাড়া মে ২০১০-এ উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে সরকারের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এই ফান্ডের ১০% বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এবং বাকি অংশ সরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। বেসরকারি সংস্থার ফান্ড ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে বাংলাদেশ পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং তত্ত্বাবধান করবে বিশ্বব্যাংক।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় জনসাধারণের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প নামে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় এমন সব অভিযোজন কার্যাবলি বাস্তবায়ন করা হবে যা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খাদ্যনিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে দাতাগোষ্ঠীর অনুদানে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড থেকে এইসব কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন করা হবে। এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবিত লবণাক্ততাপ্রবণ, খরাপ্রবণ এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় অভিযোজন কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করা হবে।

সার্বিক বিচারে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য আরও উদ্ভাবনীমূলকভাবে (innovative) কৃষি-বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। কৃষিবিজ্ঞানীরা তাই নানা চাপ-সহনশীল (Stress-tolerant) ফসলি জাত উদ্ভাবনে অধিক মনোযোগী হয়েছেন এবং কতক ক্ষেত্রে সফলতাও পেয়েছেন। প্রলম্বিত খরা বা দীর্ঘ বর্ষা সহনশীল শস্যের জাতসমূহ যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি তৈরি হয়েছে অতিতাপ সহ্যকারী জাত, অধিক লবণাক্ততা সহনশীল জাত। তবে সর্বোপরি মানুষকে এবং আধুনিক সভ্যতাকে অবশ্যই প্রকৃতি-প্রতিবেশের ভারসাম্য ধ্বংসকারী নানা কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে ফসলের মাটির দূষণ, সেচের জলের দূষণ–এগুলো থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করা অবশ্যই কঠিন হয়ে যাবে।

আধুনিক কৃষিতে এখন ক্রমশ নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। আমরা সে অর্থে এখন একটি Paradigm shift করছি। রসায়নভিত্তিক প্রযুক্তির বিস্তার হতে কৃষি এখন বায়োলজিক্যাল অগ্রগতির দিকে এগুচ্ছে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক নয় বরং বিভিন্ন ফসল ও প্রাণিজ ও মৎস্যজ জাতগুলোকে প্রজননগতভাবে এবং বায়োলজিক্যালি আরও উন্নত ও চ্যালেঞ্জিং Stress condition সহনীয় করে গড়ে তোলা হচ্ছে (Block, 2016)।

এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে কৃষি-জৈবপ্রযুক্তি ও জিনপ্রযুক্তি বিদ্যা। তবে মনে রাখতে হবে সমস্ত প্রযুক্তিরই সীমাবদ্ধতা আছে, কেবল সীমাবদ্ধতা নেই মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির। মানুষ যদি তার আধুনিক বিলাসী ও প্রযুক্তি এবং শিল্পনির্ভর জীবনাচরণের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সঠিক ভারসাম্য বিধান করতে পারে তবে জলবায়ু পরিবর্তনের অনেক বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া হয়তো সম্ভব।

পরিশেষে বলতে হয়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রতিকূলতা গণমাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা, কৃষিতে এর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় নানা অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং

www.pathagar.com

নীতি-প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে, গবেষণা ক্ষেত্রে এজেন্ডা সেটিংয়ে কৃষি সাংবাদিকতা ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য সবার আগে প্রয়োজন এ সম্পর্কিত জ্ঞানে সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যারা গণমাধ্যমে সুচারুরূপে এই কাজগুলো করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

BCAS [Bangladesh Centre for Advanced Studies]. (2009). *Climate Change Adaptation & Disaster Risk Reduction Screening, Management Plan and subsequent Project Proposals of Danida Supported Agricultural Sector Programme Support, Phase II and Water Supply and Sanitation Sector Programme Support, Phase II.* Bangladesh: BCAS.

Biswas, M. (2013), *Climate Change and Its Impact on Bangladesh*, World Town Planning Day 2013. Retrieved on February 2, 2016 from www.bip.org.bd/SharingFiles

রহমান, মু. সা. (২০০৯)। দুর্যোগ কোষ, ঢাকা, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি)।

Block, B. *International Commission Calls for 'Paradigm Shift' in Agriculture.* Retrieved on February 2, 2016 from http://www.worldwatch.org/node/5712

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৯. কৃষিনীতি ও কৃষি সম্পর্কিত আইন

সাজিয়া আফরিন

জলবায়ু পরিবর্তনসহ কৃষিখাত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ যথাযথভাবে মোকাবেলার মাধ্যমে কৃষিকে টেকসই করে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যকে সামনে নিয়েই 'জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৩' প্রণয়নের উদ্যেগ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের কৃষিনীতি সংশোধন ও পরিমার্জন করে খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সংস্থা ছাড়াও আপামর জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধি, কৃষিবিজ্ঞানী, সম্প্রসারণকর্মী, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, এনজিওসহ সকলের মতামত গ্রহণ করে নীতিটি চূড়ান্ত করা হয়। ২০১৩ সালে নীতিটি পাস হয়।

কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় কৃষিনীতি, ২০১৩'-তে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষিখাতের সমস্যা ও সম্ভাবনা, গবেষণা ও উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি উপকরণ যথাযথকরণ, প্রতিকূল জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার, কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, কৃষিতে সমবায়, কৃষি বিপণন, কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষিতে নারী, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা। কৃষি মন্ত্রণালয় প্রণীত এ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ এবং তা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে নীতিতে বিস্তারিত রূপরেখা সংযোজিত হয়েছে।

জাতীয় কৃষিনীতির উদ্দেশ্য

জাতীয় কৃষিনীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ অধিকতর ফসল উৎপাদন এবং কৃষি কার্যক্রম বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এর মাধ্যমে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করাই এর মূল লক্ষ্য। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ অনুযায়ী এ নীতির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন করার কথা বলা রয়েছে এখানে। তাতে করে ক্রমশ বাড়তে থাকা খাদ্যচাহিদা পূরণ করা যাবে। একই সঙ্গে চাষাবাদ প্রযুক্তির টেকসই উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করাও এই নীতির উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করাও এই নীতির উদ্দেশ্য। আর সেসব করা হবে যথাযথ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে।
- বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক কৃষির প্রচলন করা এবং তা অব্যাহত রাখা। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য সেটি খুব জরুরি। কৃষির সঙ্গে বাণিজ্যের সমন্বয় ঘটানোও এই নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।
- বদলে যাওয়া পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এখন সব ক্ষেত্রের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষিও এর বাইরে নয়। যে কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনযোগ্য (Adaptable) কৃষকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম এমন স্বনির্ভর এবং টেকসই কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণও রয়েছে এই কৃষিনীতিতে।
- কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। আমাদের দেশের কৃষকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের মানুষের খাদ্যের যোগান মেটান কিন্তু তাদের ঘরের অভাব মেটে না। কৃষকরা যেন শস্যের ন্যায্যমূল্য পান, সেটি নিশ্চিত করা এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানোও এই নীতির উদ্দেশ্য।
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামতো মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। দেশের মানুষের চাহিদাপূরণ করে এখন আন্তর্জাতিক বাজারের জন্যও উৎপাদন করতে সক্ষম বাংলাদেশের কৃষক। বাইরের সেই বাজারে কোন কোন পণ্যের চাহিদা বেশি, সে বিষয়ে কৃষকদের তথ্য দেওয়া ও রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করা এই নীতির উদ্দেশ্য।
- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা এখনও বাংলাদেশের জন্য বড় একটি চ্যালেঞ্জ। পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলিত। কৃষিনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের হারও বেশি নয়। কৃষিনীতিতে এ বিষয়গুলোতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।
- জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বহুমুখীকরণ এবং অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করাও এ নীতির উদ্দেশ্য। পুষ্টিমানসম্পন্ন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য কৃষিনীতিতে কৃষি বহুমুখীকরণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় কৃষিনীতিতে চিহ্নিত কৃষিখাতের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে।

সক্ষমতা

- ফসল উৎপাদনের জন্য সাধারণত বছরব্যাপী অনুকূল কৃষি জলবায়ু বিরাজমান। পঞ্জিকা অনুযায়ী সব ক্ষেত্রে এখন আর গ্রীষ্ম-বর্ষা আসে না সত্যি, কিন্তু মোটা দাগে বাংলাদেশের জলবায়ু রয়ে গেছে কৃষির জন্য অনুকূল।
- খামার পর্যায়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা-সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিদ্যমান।

www.pathagar.com

- কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত জনবল বিদ্যমান। বাংলাদেশ যেহেতু কৃষিনির্ভর দেশ, সেকারণে এই খাতের বহু বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তাঁরা গবেষণার মাধ্যমে কৃষির উন্নতিতে কাজ করছেন প্রতিনিয়ত।

- প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি বিদ্যমান। মূলত দেশের মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই কৃষকরা উৎপাদন করেন ধান, গম, ডালসহ প্রধান প্রধান শস্য। সেজন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির হাতিয়ারও রয়েছে তাদের কাছে।

- দেশব্যাপী কৃষি উপকরণ সরবরাহ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান। গত কয়েক দশকে পুরো বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নতি হয়েছে। যেকারণে অনেকটাই ঘুচে গেছে গ্রাম-শহরের দূরত্ব। কৃষি উপকরণ সরবরাহের মসৃণ এক নেটওয়ার্কও তৈরি হয়েছে তাই।

- নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী সৃজনশীল কৃষক। বংশ পরম্পরায় কৃষিতে তাদের হাতেখড়ি হতে পারে। তাই বলে সেই মান্ধাতার আমলের পদ্ধতি নিয়ে পড়ে নেই বাংলাদেশের কৃষকরা। বরং নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করেন দুহাতে। আবার নিজেরাও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মেতে ওঠেন সৃজনশীলতায়।

- কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি বিদ্যমান। ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ছোট্ট দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে অনেক সময় মনে করা হয় বোঝা হিসেবে। তবে সেটিই আবার প্রয়োজনের সময় পরিণত হতে পারে জনশক্তিতে। কৃষি কর্মকাণ্ডের বিশাল যে যজ্ঞ, সেটি করার জন্য শ্রমশক্তির কোনো অভাব নেই দেশে।

- বাংলাদেশের কৃষিতে ফসলের ব্যাপক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এটি এদেশের কৃষির আরেক সক্ষমতার জায়গা। ফসলের ব্যাপক বৈচিত্র্য থাকার কারণে সেটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও সহায়ক।

- সেচের পানির প্রাপ্যতা। অনেক নদী শুকিয়ে হয়তো বিশাল বিশাল চর পড়ে গেছে তারপরও সেচের পানির অভাব বাংলাদেশে খুব একটা হয় না। কমে যাওয়ার পরও নদীর সংখ্যা এখনও অনেক। সেখান থেকেই পাওয়া যায় সেচের পানি।

- সহায়তামূলক প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। যেকারণে কৃষকরা অনেক বেশি আস্থা নিয়ে তাদের কাজ করে যেতে পারেন।

- সরকারের বিদ্যমান আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা। উন্নয়নশীল এই দেশের সরকার খুব সচ্ছল নয় কিন্তু যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুন না কেন, কৃষি ক্ষেত্রে তারা বরাবর আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে উদার। কৃষিপ্রধান এই দেশে ভোটের রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে এর বিকল্পও নেই। যেকারণে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় কৃষকদেরই।

- দেশব্যাপী বিস্তৃত কৃষি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলের উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের আধা-বিস্তারিত তথ্য/উপাত্ত ও ব্যবহার উপযোগী নির্দেশিকা বিদ্যমান।

www.pathagar.com

- কৃষকদের রয়েছে চিরাচরিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। চিরায়ত জ্ঞান পেয়েছেন তারা উত্তরাধিকারসূত্রে। আর নিজেরা কাজ করতে করতে শিখেছেন আরও অনেক কিছু।
- সরকারের আরেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে কৃষিভর্তুকি কার্ড ও কৃষক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। ওই ভর্তুকি কার্ড যেমন তাদের প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে, তেমনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও গড়ে তুলতে পারেন কৃষকরা।

দুর্বলতা

- তুলনামূলকভাবে দুর্বল কৃষি বিপণন ব্যবস্থাপনার কারণে ভালো উৎপাদন করেও তার সুবিধা অনেক সময় কৃষকরা পান না।
- পর্যাপ্ত ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতির পরিমাণ অনেক।
- কৃষি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কৃষকের নিজস্ব মূলধন অপ্রতুল, যেকারণে তাদের প্রায়ই ঋণ নিতে হয়। আর তা বেশিরভাগ সময় সুদে হওয়ার কারণে লাভের বড় একটি অংশ সুদ বাবদই দিতে হয় কৃষকদের।
- প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ এখনও সীমিত। এখনও বাংলাদেশের কৃষকরা আর্থিকভাবে ততটা সচ্ছল নন। তাই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সীমিত হওয়ার কারণে তাদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।
- কৃষক সংগঠন (ক্লাব, দল) সক্রিয় নয়। কৃষক সংগঠনের সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক নয়। যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেশিরভাগের কার্যক্রম প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে।
- কৃষকের উপকরণ (পানি, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ব্যবহারের দক্ষতা সীমিত। কেননা বেশিরভাগ কৃষকেরই কোনো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই।
- রপ্তানি বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের প্রযুক্তি অপ্রতুল। কিন্তু বাইরের বাজার ধরতে হলে সে অনুযায়ী পণ্য উৎপান করতে হবে।
- আমাদের দেশে প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তি এখনও অপর্যাপ্ত। বিশেষত আবহাওয়া যখন প্রতিকূল আচরণ করে, তখন প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততার কারণে সেটি সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয় কৃষকদের।
- বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা এবং উন্নয়নে বিনিয়োগ অপর্যাপ্ত। সরকারের দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করা হলেও এক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়ের অংশগ্রহণ এখনও আশাব্যঞ্জক নয়।
- অগ্রসরমান কৃষিবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী এবং অবকাঠামোমূলক অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা। প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের কৃষি। কিন্তু এর সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়েই বাংলাদেশের যত হিমশিম।
- কৃষিতে বহুমুখীকরণের অভাব।
- কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা দুর্বল। ওই উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য যে যথাযথ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, সেটি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় না।

www.pathagar.com

- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। ফলে তথ্য ও গবেষণার আদান-প্রদান হয় না। কৃষিখাত পারে না এর সর্বোচ্চ সুফল ভোগ করতে।
- কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির অপর্যাপ্ত ব্যবহার। আগে চেয়ে ব্যবহার যে বেড়েছে, সেটি স্বীকার না করে উপায় নেই। তবে এখনও সেটি রয়ে গেছে অপর্যাপ্ত।
- কৃষক ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা। কৃষকরা বংশ পরম্পরায় যা শেখেন, এর বাইরেও প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে তো সেটি আরও বেশি করে। তবে এক্ষেত্রে রয়েছে অপ্রতুলতা।
- মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও সেচ) উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। অনেক সময় সেসব কৃষি উপকরণ এক জায়গায় হয়তো অনেক বেশি থাকে, অন্য জায়গায় একেবারে থাকেই না।
- কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। যার ফলে কৃষক অনেক ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। আবার শস্যও অনেক সময় হয়ে যায় নষ্ট।
- কৃষিপণ্যের পরিবহন ব্যবস্থা অপ্রতুল। দেশের পরিবহন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে বটে, তবে কৃষিপণ্যের পরিবহনে অপর্যাপ্ততা দেখা দেয় প্রায়শ।

সুযোগ

- কৃষিতে হস্তান্তরযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিদ্যমান। এটিকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিলে লাভবান হবে পুরো বাংলাদেশ।
- হাইব্রিড প্রযুক্তি প্রসারের সুযোগ বিদ্যমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বেড়েছে, যে কারণে এখন হাইব্রিডের দিকে না ঝুঁকে উপায় নেই।
- কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের সম্ভাবনা বিরাজমান। আগের চেয়ে দেশের কৃষি অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছে। তবু এখনও আরও অনেক সম্ভাবনার দুয়ার এক্ষেত্রে উন্মুক্ত।
- প্রতিকূল কৃষি-পরিবেশ অঞ্চল ব্যবহারের সম্ভাবনা বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় পার্বত্য এলাকার কথা। সেখানে কৃষির বিপ্লব ঘটানো সম্ভব।
- বৈদেশিক বাজার ও বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিদেশের বাজারে উচ্চমূল্যে ফসল রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। এজন্য কৃষকদের শুধু তথ্য ও কৃষি উপকরণ দিয়ে সাহায্য করাটা এবং পণ্য পরিবহনের সুযোগ করে দেওয়াই যথেষ্ট।
- শস্য বহুমুখীকরণ এবং নিবিড়করণের সুযোগ এখানে বিরাজমান।
- কৃষিজাত পণ্যে মূল্য সংযোজনের সুযোগ বিদ্যমান।
- মূল্য সংযোজিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগও বিদ্যমান।
- কৃষিখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। দেশের সিংহভাগ মানুষের জীবন ও জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবু আরও অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়ে গেছে। সম্ভাবনা আছে আয় বৃদ্ধিরও।

www.pathagar.com

শস্যের নানামাত্রিক ব্যবহার ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। যেমন—এখন দেশে স্ট্রবেরি, ভুট্টার মতো ফসল চাষ হচ্ছে ব্যাপকহারে। ফলে আমাদের দেশে কোনো একটি ফসলের ফলন প্রত্যাশিত মাত্রায় না হলে বিকল্প শস্য উৎপাদনের দিকে যাওয়ার সুযোগ থাকে কৃষকদের। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উপর জোর দেওয়ায় সেটির প্রয়োগে তাই সুযোগ বাড়ছে। কৃষিনীতিতে আমদানি যথাসম্ভব কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানোর দিকে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এই নীতিতে উৎসাহিত করা হয়েছে খামার-যান্ত্রিকীকরণ। এর আলোকে নেওয়া হয়েছে যন্ত্রপাতির শুল্ক কমানোর উদ্যোগ। যে কারণে কৃষক এখন সহজেই কৃষিকাজে তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারছে। নীতিতে সার সরবরাহ ও বিতরণকে কৃষকের জন্য সহজ করার কথা বলা হয়েছে। এতে জমির ক্ষেত্রে সারের সুষমতা অনেকটা নিশ্চিত হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আগে হয়তো নির্দিষ্ট একটি-দুটি সারের মূল্য কম ছিল। ফলে ওই সারগুলোই জমিতে বেশি বেশি ব্যবহার করত কৃষক। তাতে দীর্ঘমেয়াদে জমির উর্বরতা কমে যেত। জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হয়েছে এ নীতিতে। যার আলোকে সরকার অনেকগুলো রাসায়নিক সারের মূল্য প্রায় একই পর্যায়ে রেখেছে। ফলে কৃষকের সামনে নির্দিষ্ট একটি-দুটি সার ব্যবহার না করে অনেক ধরনের রাসায়নিক সার ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কম কীটনাশক ব্যবহার ও সমন্বিত বালাই নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি নিশ্চিত করা হলে মাটি ও পরিবেশের মান ভালো থাকবে।

জাতীয় কৃষিনীতিতে একই কাজে নারী কৃষকের সমান মজুরির কথা বলা হয়েছে। মজুরি বৈষম্য দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে সেখানে। নীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে গবেষণার উপর।

মাটির অতিমাত্রায় ব্যবহার এবং মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে নষ্ট হচ্ছে উর্বরাশক্তি। উর্বরতা ধরে রাখার জন্য জৈব সারের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া প্রয়োজন। জৈব সারের ব্যবহার কীভাবে হবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা দরকার ছিল, যেটি এই নীতিতে দেখা যায় না।

কারখানা, বসতবাড়ি, কৃষিজমি সুরক্ষার জন্য কিছু বলা হয়নি এই নীতিতে। অকৃষি খাতে যে উর্বর কৃষিজমি ব্যবহার করা যাবে না—এ বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। এই কৃষিনীতিতে অন্যতম দুর্বলতা এটি।

কৃষির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করার কোনো নির্দেশনা এই নীতিতে নেই। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কোনো অর্থবরাদ্দ বা পরিকল্পনার উল্লেখ নেই এখানে। বাংলাদেশে প্রায় আট হাজার জাতের ধান ছিল। ধীরে ধীরে সংখ্যাটি কমে যাচ্ছে। সব ধরনের ফসলের ক্ষেত্রেই এটি বলা যায়। জিন সংরক্ষণের জন্য যে উদ্যোগ বা বরাদ্দ প্রয়োজন, তার কোনো উল্লেখ এই কৃষিনীতিতে নেই।

আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহপরবর্তী ব্যবস্থা খুব দুর্বল। নীতিতে এ বিষয়ের কিছুটা উল্লেখ থাকলেও তা বাস্তবায়নের জন্য যে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রয়োজন ছিল সেটি এখানে অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে কৃষিকাজে অনেক বেশি ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার করা হয়। ফলে পানির ব্যবহার হচ্ছে অতিমাত্রায়। কিন্তু বর্ষার মৌসুমে সহজেই বৃষ্টির পানি ধরে রেখে ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমানো সম্ভব। কিন্তু এ বিষয়ের দিকে নীতিতে আলোকপাত করা হয়নি।

কৃষিনীতিতে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড (জিএম) শস্যকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য নীতিতে বলা হয়েছে, বায়োসেফটি নিশ্চিত করেই জেনেটিকালি মডিফায়েড শস্যের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। কিন্তু বাস্তবে বায়োসেফটি যথাযথভাবে নিশ্চিত না করেই দেশে বিভিন্ন পক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও জেনেটিকালি মডিফায়েড শস্যকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর ফলে হয়তো ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্যা হতে পারে বলে অনেকের আশঙ্কা।

কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

কৃষিনীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও তদারকির সঙ্গে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জড়িত, যেমন—বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ইত্যাদি। নিচে এদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহের গবেষণা কার্যক্রম সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ছাড়াও সার্বিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অন্যতম কাজ।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন : বাংলাদেশে কৃষি উপকরণ উৎপাদন, সংগ্রহ (ক্রয়), পরিবহন, সংরক্ষণ এবং বিতরণ ব্যবস্থাপনা টেকসই করা এবং অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ যেমন—বীজ, সার সরবরাহ এবং ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকের জন্য সেচের সুযোগ সৃষ্টি করা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাজ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান দানাশস্য, কন্দাল, ডাল, তৈলবীজ, বীজ, ফল, মসলা, ফুল ইত্যাদির উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে। প্রতিষ্ঠানটি মৃত্তিকা এবং শস্য ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই এবং পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা, পানি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা, কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন, খামার পদ্ধতির উন্নয়ন, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং আর্থসামাজিক সংশ্লিষ্ট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা করে থাকে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট : ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত এবং নাইট্রোজেন সারের বিকল্প হিসেবে জীবাণু সার উদ্ভাবন ও বিস্তার করে ইতেমধ্যে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক উপযোগী ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও বিস্তারে কাজ করে যা শুধু উচ্চ উৎপাদনশীল ও লাভজনকই নয়, বরং পরিবেশবান্ধব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার গুণসম্পন্ন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এ সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—ধানের উন্নয়ন ও উৎপাদনসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করা; ধানের বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা স্টেশন ও সাব-স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা; ইন্সটিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের প্রদর্শনী এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্প এলাকা নির্ধারণ; ধান উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির উপর সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও অগ্রসর কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করা ও ধান সম্পর্কিত নীতি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

কৃষিসম্পর্কিত আইন ও নীতি

কৃষিনীতি ছাড়া আরও একাধিক নীতি, কৌশলপত্র ও আইন রয়েছে যা কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এই নীতিগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

ক. জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫ : জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও উদ্ভূত প্রতিকূলতার দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়ার পটভূমিতে 'নয়া কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' যুগোপযোগী করার প্রয়োজন পড়ে। 'নয়া কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ১৯৯৬' অনুযায়ী কৃষি বিকেন্দ্রীকরণ, কৃষক সংগঠনভিত্তিক সম্প্রসারণ সেবা পদ্ধতি প্রবর্তনসহ অন্যান্য নীতি বাস্তবায়নের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। তবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলেও জীবিকানির্ভর কৃষিকে বাণিজ্যিকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও এলাকাবিশেষে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা মোকাবেলায় লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তি অনুসরণ এবং ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। তাই এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে কৃষি মন্ত্রণালয় 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫' প্রণয়ন করে (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

খ. জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩ : সর্বোচ্চ মানের উন্নত বীজ কৃষকের কাছে সহজে এবং দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া এ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য ফসলের উন্নত জাতের বীজ প্রজনন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের উপর এ নীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

গ. বীজ আইন ১৯৯৭ : ১৯৭৭ সালে প্রণীত বীজ অধ্যাদেশকে যুগোপযোগী করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯৯৭ সালে বীজ আইন (সংশোধিত) প্রণয়ন করে। আইনে নিয়ন্ত্রিত ফসল যথা—ধান, গম, পাট, আলু ও আখের বীজ বিক্রির জন্য জাত ও বীজ ডিলারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

ঘ. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০২ : কৃষি মন্ত্রণালয় গৃহীত এ নীতিতে মাটি, পানি, সার, পোকামাকড়ের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে জৈবিক পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের কথা বলা আছে এ নীতিতে (কৃষি মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

www.pathagar.com

ঙ. জাতীয় পাটনীতি ২০০২ : সনাতন পদ্ধতিতে পাটচাষের ফলে আমাদের দেশে একরপ্রতি পাটের উৎপাদনশীলতা কম এবং উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। এছাড়া উচ্চ ফলনশীল ও মানসম্পন্ন পাটবীজের অভাবে কৃষকরা নিম্নমানের পাটবীজ ব্যবহার করে। এ সকল প্রতিবন্ধকতাকে সামনে রেখে পাট মন্ত্রণালয় ২০০২ সালে জাতীয় পাটনীতি প্রণয়ন করে। পাটনীতিতে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন ও কৃষক পর্যায়ে তা সরবরাহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাট ও পাটপণ্য উৎপাদনের কথা বলা হয়েছে (বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ২০০২)।

চ. জাতীয় পশুসম্পদ নীতি ২০০৫ : দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার উপর এ নীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে। ভূমিহীন ও কর্মসংস্থানহীন মানুষের কর্মসস্থান ও পুষ্টি নিশ্চিত করা এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০০৫ সালে এ নীতি প্রণয়ন করেছে (মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, ২০০৫)।

ছ. জাতীয় মৎস্যনীতি ১৯৯৮ : মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও এর বৃদ্ধির পরিপন্থি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এই সেক্টরের আশানুরূপ উন্নয়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ। এই খাতে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিকূলতা, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব ইত্যাদি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৮ সালে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্যসম্পদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় মৎস্যনীতি প্রণয়ন করে (মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮)।

জ. জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি : ভূমি ও পানিসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নির্ভর করে সঠিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার উপর। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিজমির অপরিকল্পিত ব্যবহার রোধ এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ভূমি মন্ত্রণালয় ২০০১ সালে এই নীতি প্রণয়ন করে (ভূমি মন্ত্রণালয়, ২০০১)।

ঝ. জাতীয় পানিনীতি : ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সব ধরনের পানির সুসম ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় ১৯৯৯ সালে এ নীতি প্রণয়ন করে (পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯)।

ঞ. জাতীয় খাদ্যনীতি ২০০৬ : নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ২০০৬ সালে খাদ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় খাদ্যনীতি প্রণয়ন করে। স্থিতিশীল মূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহসহ শস্য- বহির্ভূত পুষ্টিকর খাদ্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, দরিদ্রদের কর্মসংস্থান এবং পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি উন্নয়নের উপর এই নীতিতে জোর দেওয়া হয়েছে (খাদ্য মন্ত্রণালয়, ২০০৬)।

www.pathagar.com

জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩

১.০ ভূমিকা

১.১ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকাণ্ড এবং জীবনীশক্তি। উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাত (ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, শ্রমশক্তির প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থান যোগান এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাঁচামাল সরবরাহ করে। কৃষি সামাজিক কর্মকাণ্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্র যা জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ছাড়া, কৃষি বিভিন্ন ধরনের ভোগ্যপণ্যের বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তাদের বাজারের চাহিদাভিত্তিক মালামালের উৎস। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং এর প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা অপরিহার্য।

১.২ ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন উপখাতসমূহের সমন্বিত রূপ হল কৃষিখাত। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট উপ-খাতসমূহের জন্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে, যেমন পরিবেশ নীতি ১৯৯২, জাতীয় বন নীতি ১৯৯৪, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮, জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা ২০০১, জাতীয় পাট নীতি ২০০২, প্রাণিসম্পদ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৫, National Livestock Development Policy-2007, জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৮ এবং জাতীয় পোল্ট্রি উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮। এ প্রেক্ষিতে ফসল উপ-খাতের সঠিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ নীতিমালার খসড়া প্রণীত হয়েছে। ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ, সার, ক্ষুদ্র সেচ, বিপণন ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এ নীতিমালায় প্রত্যাশামাফিক প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশের কৃষিতে ফসল খাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং সরকারের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচিতে ফসল খাত সর্বাধিক গুরুত্ব পায়, তাই ফসল খাতের উন্নয়নের জন্য প্রণীত দলিল পূর্বের ধারাবাহিকতায় 'জাতীয় কৃষি নীতি' শিরোনামে অভিহিত করা হয়েছে।

১.৩ প্রতি বছর দেশে কৃষিজমির পরিমাণ প্রায় ১% হারে হ্রাস পাচ্ছে এবং মৃত্তিকার অবক্ষয় (যেমন, পুষ্টি উপাদানের ভারসাম্যহীনতা) ও উর্বরতা হ্রাস এবং মৃত্তিকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মাটির গুণাগুণ হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু, পানিসম্পদও সংকুচিত হচ্ছে। ক্রমহ্রাসমান জমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং কৃষিজাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণসহ মূল্য সংযোজন প্রয়োজন।

১.৪ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহের (MDGs) সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসরত জনগোষ্ঠী ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫০ ভাগের নিচে নামিয়ে আনা। এছাড়াও দেশে একটি নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য প্রণীত 'ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫)' এবং 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)'-তে জনগোষ্ঠীর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি, পল্লি অঞ্চলের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অ-কৃষি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১.৫ মোট দেশীয় উৎপাদনের (জিডিপি) উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে কৃষি খাতে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি একইভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা (ফসল, উদ্যান, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ এবং বন) বৃদ্ধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ভোক্তাদের সঙ্গে কৃষকের সরবরাহ চেইন সংযোগের মাধ্যমে কৃষিতে জিডিপির উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। এর ফলে দেশে দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন হবে।

www.pathagar.com

৬.৬ কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে ছোট খামারের ভূমিকাই বেশি। জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে অধিকতর গতিশীল করা এবং টেকসই বাণিজ্যিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন অপরিহার্য। কৃষিতে রয়েছে খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণ, শিল্প কারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব হ্রাস এবং পরিমিত আয়সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির অপার সম্ভাবনা, যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

৬.৭ প্রযুক্তি পরিবর্তনের মাধ্যমে টেকসই কৃষি নিবিড়করণ ও বহুমুখীকরণের জন্য প্রয়োজন কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের সম্মিলিত দক্ষ ও কার্যকর কৃষি প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে যথাযথ মূল্য সংযোজন এবং সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার সহায়তা প্রয়োজন। জ্ঞান-নিবিড় কৃষিকে টিকিয়ে রাখার জন্য উৎপাদনশীলতা, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা, যুগোপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহার, গবেষণা ও পরীক্ষা কাজের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ দক্ষ মানবসম্পদ সরবরাহ বজায় রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কৃষির জন্য প্রয়োজন অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা। বর্তমান সময়ের বহুমাত্রিক জাতীয় এবং অর্থনৈতিক পরিবেশে কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনায় সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

১.৮ উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধি, অস্থিতিশীলতা হ্রাস, সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যশস্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদন, কৃষি বহুমুখীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের চাহিদা পূরণ করা বাংলাদেশ কৃষির অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

৯.৯ বিদ্যমান জাতীয় কৃষি নীতি এপ্রিল, ১৯৯৯-এ গৃহীত হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু উদ্ভূত হয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কৃষিসম্পদ হ্রাস, ক্রমহ্রাসমান জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে কৃষিকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষভাবে সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন। বর্তমান কৃষি-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কৃষি নীতিকে যুগোপযোগী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

২.০ জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্য

জাতীয় কৃষি নীতির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ অধিকতর ফসল উৎপাদন এবং কৃষি কার্যক্রম বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা।

১.১ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ : জাতীয় কৃষি নীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে–

- টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তির টেকসই উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা;
- যথাযথ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক কৃষির প্রচলন করা এবং তা অব্যাহত রাখা;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে অভিযোজনযোগ্য (Adaptable) কৃষকের চাহিদা মিটাতে সক্ষম এমন স্বনির্ভর এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামতো মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা;

www.pathagar.com

- কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
- জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বহুমুখীকরণ এবং অধিক পুষ্টিমানসম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা।

৩.০ কৃষি খাতে সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং আশঙ্কা

একটি বস্তুনিষ্ঠ, কার্যকর এবং ফলপ্রসূ জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং আশঙ্কাসমূহ সঠিকভাবে বিবেচনা করা।

৩.১ সক্ষমতা

- ফসল উৎপাদনের জন্য সাধারণত বছরব্যাপী অনুকূল কৃষি জলবায়ু বিরাজমান;
- খামার পর্যায়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা-সম্প্রসারণ পদ্ধতি বিদ্যমান;
- কৃষি গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত জনবল বিদ্যমান;
- প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি বিদ্যমান;
- দেশব্যাপী কৃষি উপকরণ সরবরাহ নেটওয়ার্ক বিদ্যমান;
- নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী ও সৃজনশীল কৃষক;
- কৃষি কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমশক্তি বিদ্যমান;
- বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান;
- সেচের পানির প্রাপ্যতা;
- বিদ্যমান সহায়তামূলক প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো;
- সরকারের বিদ্যমান আর্থিক সহায়তা/প্রণোদনা ;
- দেশব্যাপী বিস্তৃত কৃষি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন কৃষি অঞ্চলের উপজেলাভিত্তিক ভূমি ও মৃত্তিকা সম্পদের আধা-বিস্তারিত তথ্য/উপাত্ত ও ব্যবহার উপযোগী নির্দেশিকা বিদ্যমান;
- কৃষকদের চিরাচরিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান; এবং
- কৃষি ভর্তুকি কার্ড ও কৃষক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট;

৩.২ দুর্বলতা

- তুলনামূলকভাবে দুর্বল কৃষি বিপণন ব্যবস্থাপনা;
- ফসল কর্তনোত্তর অধিক ক্ষতি;
- কৃষি কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য কৃষকের নিজস্ব মূলধনের অপ্রতুলতা;
- সীমিত প্রাতিষ্ঠানিক কৃষিঋণ;
- কৃষক সংগঠনের (ক্লাব, দল) সক্রিয়তার অভাব;
- উপকরণ (পানি, সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ব্যবহারের সীমিত দক্ষতা;
- রপ্তানি বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য মানসম্মত পণ্য উৎপাদনের অপ্রতুল প্রযুক্তি;
- প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী প্রযুক্তির অপর্যাপ্ততা;
- বেসরকারি পর্যায়ে গবেষণা এবং উন্নয়নে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ;
- অগ্রসরমাণ কৃষিবিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানী এবং অবকাঠামোমূলক অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা;

www.pathagar.com

- কৃষিতে বহুমুখীকরণের অভাব;
- কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে দুর্বল ব্যবস্থাপনা;
- সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;
- কৃষি ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির অপর্যাপ্ত ব্যবহার;
- কৃষক ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা;
- মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও সেচ) উৎপাদন ও সরবরাহের অপর্যাপ্ততা;
- কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের অপর্যাপ্ততা; এবং
- কৃষিপণ্যের পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা।

৩.৩ সুযোগ

- হস্তান্তরযোগ্য আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিদ্যমান;
- হাইব্রিড প্রযুক্তি প্রসারের সুযোগ বিদ্যমান;
- কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে বিরাজমান সম্ভাবনা;
- পার্বত্য এলাকাসহ প্রতিকূল কৃষি-পরিবেশ অঞ্চল ব্যবহারের বিদ্যমান সম্ভাবনা;
- বৈদেশিক বাজার ও বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিদেশের বাজারে উচ্চমূল্য ফসল রপ্তানির সুযোগ বিদ্যমান;
- শস্য বহুমুখীকরণ এবং নিবিড়করণের বিরাজমান সুযোগ;
- কৃষিজাত পণ্যে মূল্য সংযোজনের বিদ্যমান সুযোগ;
- মূল্য সংযোজিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ;
- কৃষিখাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির সুযোগ বিদ্যমান;
- ফলন পার্থক্য হ্রাসের সুযোগ বিরাজমান; এবং
- ব্যক্তিখাত ও বাণিজ্যিক কৃষির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সম্ভাবনা বিরাজমান।

৩.৪ আশঙ্কা

- পরিবেশগত সংকটাপন্নতা (জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঝড়, লবণাক্ততা, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং নদীভাঙন) বিরাজমান;
- ক্রমাবনতিশীল মাটির স্বাস্থ্য;
- ক্রমহ্রাসমান চাষযোগ্য জমি এবং পানি সম্পদ;
- অকৃষি কাজে কৃষিজমি ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি;
- কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তার ফলে কৃষিকাজে কৃষকের নিরুৎসাহ;
- বিলুপ্তমান কৃষি জীববৈচিত্র্য;
- কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার;
- কৃষি পরিবেশের অবক্ষয়; এবং
- কৃষি খাতে বিশেষ করে কৃষি গবেষণায় অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ।

www.pathagar.com

৪.০ গবেষণা এবং উন্নয়ন

কৃষি গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই কৃষি উন্নয়নের জন্য একটি সুসমন্বিত গবেষণা পরিকল্পনা অপরিহার্য। গবেষণার মাধ্যমে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনা সম্ভব যার ফলে কৃষি সরবরাহ-কেন্দ্রিক এর পরিবর্তে চাহিদা-ভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন উৎপাদন মাত্রার চেয়ে উৎপাদন দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। এছাড়াও এর জন্য প্রয়োজন সমতা, কর্মসংস্থান, সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণ, পুষ্টি, খাদ্যের গুণগতমান, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি নতুন ধারণার ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় রেখে খাদ্য নিরাপত্তা প্রচেষ্টা চলমান রাখা। এ জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক জবাবদিহিতার পাশাপাশি কার্যকর অন্তর্বীক্ষণ, অগ্রাধিকার পুনঃনির্ধারণ এবং সুদৃঢ়করণের দাবি রাখে। এসব বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রধান কৌশলসমূহ নিম্নরূপ :

৪.১ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পদ্ধতি

- গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমে সমন্বয়, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নিরূপণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ক্রমাগত শক্তিশালীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- কৃষি গবেষণায় উদ্ভাবন, উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিজ্ঞানীদের অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রণোদনা ও প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার প্রদান করা হবে;
- গবেষণা কর্মকাণ্ডের খরচ নির্বাহের জন্য বিজ্ঞানীদের পর্যাপ্ত তহবিল প্রদান এবং প্রকল্পভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা হবে;
- গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বহিরাঙ্গন গবেষণা কর্মকাণ্ডের জন্য বিদ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে; এবং
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের মাধ্যমে একটি গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়ন যার ফলে প্রতি একক গবেষণা উপকরণ বিনিয়োগের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সামাজিক সুফল এবং মূল্য সংযোজন অর্জিত হবে।

৪.২ গবেষণা পরিকল্পনা ও অর্থায়ন

- গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে 'নিম্ন থেকে শীর্ষস্তর ভিত্তিক' পদ্ধতি অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে;
- সরকারি, বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করা হবে; এবং
- গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সময়মতো ও চাহিদামাফিক অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে।

৪.৩ গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র

- গবেষণা কার্যক্রমের বিষয় হবে কৃষি নিবিড়করণ, বহুমুখীকরণ এবং সমন্বিত খামার কার্যক্রম;
- বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, স্বল্পমেয়াদি ও স্বল্প উপকরণ-নির্ভর জাত এবং চাষাবাদ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;
- ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, উচ্চমূল্যসম্পন্ন ফসল, মূল্য সংযোজন, কৃষি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্য;
- বিকাশমান বিষয় যেমন–জীব প্রযুক্তি, কৌলিতাত্ত্বিক (Genetic) গবেষণা, হাইব্রিড, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব যেমন–বন্যা, খরা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রতিকূলতা, চর, উঁচু/পাহাড়ি অঞ্চল ও গভীর পানির ফসল ব্যবস্থাপনা, টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা এবং জৈব-চাষাবাদবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা;

www.pathagar.com

- উৎপাদনশীলতা এবং টেকসই উৎপাদনের লক্ষ্যে বৃষ্টি-নির্ভর ফসলের গবেষণা;
- খামার ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট সমস্যাসমূহ সমাধানে গবেষণা কার্যক্রম;
- জলবায়ু পরিবর্তনসহ আবহাওয়া ও ফসলের উৎপাদন বিষয়ক পূর্বাভাস সম্পর্কিত গবেষণা;
- কৃষির যান্ত্রিকীকরণ এবং লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন;
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও জৈব বালাইনাশক উদ্ভাবন ও উন্নয়ন;
- আন্তঃসীমা (Trans-boundary) অতিক্রম করে যে সকল রোগবালাইয়ের সংক্রমণ ঘটে সে সকল বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ। তা ছাড়া, এক বা একাধিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনমান উন্নয়ন, পারিবারিক খাদ্যনিরাপত্তা ও খামার-বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা;
- কৃষি নীতি ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অভিন্ন ধারায় গবেষণা; এবং
- বিভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলের জন্য পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনা।

৪.৪ প্রযুক্তি হস্তান্তর

- কৃষক ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি পরিমার্জন, যাচাই এবং হস্তান্তর বিষয়ের উপর সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান গুরুত্ব প্রদান করবে; এবং
- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বহিরাঙ্গন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে বিজ্ঞানীদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৪.৫ সেবা প্রদানে সমতা

- কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গবেষণা সুবিধাভোগীদের কাছে সুফল পৌঁছানোর লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং
- প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে অসমতা দূরীকরণে সরকার উদ্যোগ নেবে।

৪.৬ তথ্যবিদ্যা

- গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি বিশদ তথ্যভাণ্ডার তৈরি করবে; এবং
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এবং অন্যান্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিশেষায়িত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কৃষি গবেষণাসংক্রান্ত একটি কার্যকর ই-নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে।

৪.৭ অংশীদারিত্বমূলক সহযোগিতা বৃদ্ধি

- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করবে;
- জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে; এবং
- সরকার গবেষণা এবং সম্প্রসারণের মধ্যকার সংযোগকে শক্তিশালীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

৪.৮ মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ

- কৃষিতে নতুন উদ্ভাবনের জন্য মেধাস্বত্ব অর্জনে সহায়তা করা হবে।

৫.০ কৃষি সম্প্রসারণ

কৃষি সম্প্রসারণ বাংলাদেশের কৃষি প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। খামারের উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রযুক্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকার কৃষি সম্প্রসারণকে সেবা প্রদানকারী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে যা বর্ধিত কৃষি উৎপাদনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে কৃষককে উপযুক্ত কারিগরি ও খামার ব্যবস্থাপনাবিষয়ক তথ্য ও পরামর্শ প্রদানসহ নতুন প্রযুক্তি, উন্নত খামার পদ্ধতি এবং কলাকৌশল বিষয়ে সহায়তা প্রদান করবে। টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার তাগিদে কৃষি সম্প্রসারণ সেবাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা অব্যাহতভাবে অনুভূত হচ্ছে এবং সে প্রেক্ষাপটে গবেষণা ও সম্প্রসারণ পরস্পরের সঙ্গে এবং খামার পর্যায়ে উৎপাদন বিষয়ে প্রয়োজনে কৃষকদের সঙ্গে পারস্পরিক মতবিনিময়সহ সমস্যা সমাধানে কার্যকর সহায়তা দান করতে পারে এমন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে গৃহীতব্য বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

৫.১ সম্প্রসারণের পরিধি

- সরকার কৃষির বহুবিধ লক্ষ্য ও নির্ধারিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারি, বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সম্প্রসারণ উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করবে;
- সকল শ্রেণির কৃষক যথা–ভূমিহীন, প্রান্তিক, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং বড় কৃষক বিশেষ করে নারী ও যুবসমাজকে সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে; এবং
- কৃষকদের দোরগোড়ায় দক্ষ ও সমন্বিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করবে।

৫.২ সম্প্রসারণ পদ্ধতি

- একক কিংবা দলীয়ভাবে কৃষকের সমস্যা এবং চাহিদা সম্প্রসারণ কর্মীর নিকট তুলে ধরতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। চাহিদামাফিক সেবা প্রদান জোরদার করার ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মী তথ্য প্রাপ্তি এবং পরামর্শ প্রদানের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখবে;
- সরকার শীর্ষ থেকে নিম্নস্তরভিত্তিক কাঠামো ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে নিম্ন থেকে শীর্ষস্তর ভিত্তিক অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়া/সম্পর্ক তৈরি করবে যাতে কৃষক, গবেষক এবং সম্প্রসারণ কর্মী একসঙ্গে কাজ করতে পারে।
- সরকার প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, জ্ঞান এবং বিরাজমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে গড়ে ওঠা স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি প্রদান করবে;
- অভিযোজনগত গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা, সম্প্রসারণবিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম চালু করা হবে; এবং
- অঞ্চলভিত্তিক কৃষি জলবায়ু উপযোগী শস্য বিন্যাসের ভিত্তিতে চাষাবাদকে সরকার উৎসাহিত করবে।

৫.৩ যোগাযোগ মাধ্যম

- কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বিস্তারে সনাতন, আধুনিক গণমাধ্যম ও তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে;
- কৃষি তথ্য এবং প্রযুক্তি প্রসারে সক্ষম করার লক্ষ্যে 'কৃষি তথ্য সার্ভিস'কে জনবল এবং আধুনিক সুবিধাদি সরবরাহের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হবে;

www.pathagar.com

- মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাহায্যে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিস্তার শক্তিশালীকরণের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য বেসরকারি টিভি ও রেডিও চ্যানেলগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হবে; এবং
- কমিউনিটি রেডিও, ওয়েব রেডিও এবং মোবাইল যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারকে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উৎসাহিত করা হবে।

৫.৪ অংশীদারিত্ব

- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার অংশীদারিত্বমূলক সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা হবে;
- কৃষিপণ্য উৎপাদনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হবে;
- ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের সহায়তায় সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে; এবং
- সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের জন্য সরকার স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সমধর্মী এজেন্সিসমূহের মাধ্যমে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৫.৫ কৃষির উৎপাদনশীলতা

- খাদ্যনিরাপত্তা ও জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান খাদ্যশস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে এবং জোরদার করা হবে। উপরন্তু, কৃষকের আয় এবং কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;
- ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;
- খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শস্য বহুমুখীকরণে উদ্যোগ নেওয়া হবে;
- সরকার সম্প্রসারণ ও উপকরণ সেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে কৃষি উপকরণ (বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি) সরবরাহ, প্রাপ্যতা ও বিতরণ পরিবীক্ষণ করবে এবং সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে কঠোর পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে;
- নির্বাচিত কিছু শস্যের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;
- উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, মধ্যম পর্যায়ের কৃষক এবং বর্গাচাষিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; এবং
- কৃষিঋণ সহজপ্রাপ্য করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা হবে।

৫.৬ গুণগত মান নিশ্চয়তা

- সরকার দেশীয় বাজার ও রপ্তানির জন্য ফসলের উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে "Good Agricultural Practices (GAP)"-কে উৎসাহিত করবে;
- উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনকালে জীবাণু এবং রোগ-বালাই মুক্তকরণের (Sanitary & Phytosanitary Measure) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং
- আমদানি ও রপ্তানি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সঙ্গনিরোধ সেবা শক্তিশালী করা হবে।

www.pathagar.com

৫.৭ প্রতিকূল কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের জন্য কর্মসূচি

- পাহাড়ি, খরাপ্রবণ, বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, হাওর-বাঁওড়, জলাবদ্ধ এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

৫.৮ আপদকালীন অবস্থা মোকাবেলা

- যেকোনো আপদ এবং আপদকালীন পরবর্তী সময়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোগী ব্যক্তিকে সম্পৃক্ত করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তাসহ স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে;
- ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করবে;
- উপকূল, হাওর, বিল এবং চর অঞ্চলসমূহের ফসল রক্ষার জন্য অন্যান্য উৎপাদন উপখাতসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
- শস্য বীমা চালুর বিষয় বিবেচনা করা হবে; এবং
- যেকোনো দুর্যোগের অব্যবহিত পরে পুনর্বাসন কর্মসূচি শুরু করার জন্য 'কৃষি দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল' গঠনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৫.৯ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ

- সরকার নিরাপদ এবং টেকসই ভবিষ্যতের জন্য আধুনিক পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো তৈরি উৎসাহিত করবে;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই ভূমি ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বিত শস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন/উৎসাহিত করা হবে; এবং
- কৃষিজমি অকৃষিকাজে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.১০ তথ্যভাণ্ডার

- কৃষিখাতে উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কৃষিসংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ দেশে বিদ্যমান সম্পদ, উপকরণ, প্রযুক্তি, উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল তথ্যের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও হালনাগাদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবে;
- সরকার ব্যবহার-বান্ধব কৃষক ও কৃষি প্রযুক্তির সমন্বিত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করবে; এবং
- তথ্যের বিস্তার এবং সুবিধাভোগীদের সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডার ব্যবহারের বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৬.০ বীজ ও চারা-কলম

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। ভালো বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছুসংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ভালো বীজ, মূলত হাইব্রিড ধান, ভুট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানসম্পন্ন বীজের কিছু অংশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

৬.১ ফসল জাতের প্রজনন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

- দেশীয় প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে উদ্ভিদ প্রজনন কর্মসূচি গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে, তা ছাড়া সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ফসলের জাত উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে মৌল/ভিত্তি বীজ উৎপাদন ও আমদানি করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি/কোম্পানি এবং অন্যান্য সংস্থাসমূহকে উৎসাহিত করা হবে।
- বীজ উৎপাদন ও ব্যবসায় নিযুক্ত ব্যক্তি, কোম্পানি অথবা সংস্থাকে বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান করা হবে;
- প্রজনন হতে বিপণন পর্যন্ত বীজ খাতের মান উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বীজের সুষম উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে; এবং
- সরকারের পূর্বানুমোদনসাপেক্ষে বীজ উন্নয়ন, নিবন্ধন এবং বিপণনসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে যে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট হতে পারবে।

৬.২ বীজ পরিবর্ধন ও বিতরণ

- সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও কৃষকদের প্রজনন বীজ এবং ভিত্তি বীজ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হবে;
- সরকার জরুরি কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার জন্য বীজের আপদকালীন মজুদ বজায় রাখবে; এবং
- বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, মাননিয়ন্ত্রণ এবং বিপণন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠায় সরকারি ও বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.৩ সরকারি ও বেসরকারি বীজ শিল্প খাতে সহায়তা

- সরকারি ও বেসরকারি খাত কর্তৃক উন্নতমানের বীজ উৎপাদনে চুক্তিবদ্ধ কৃষকদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা হবে; এবং
- কৃষকের মাঠ পর্যায়ে নতুন জাত এবং নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগে কৃষকদের সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাত প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৬.৪ বীজের মান-নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

- মানসম্পন্ন বীজের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ প্রত্যয়ন এবং বীজ বিধিমালা কার্যকর করার কাজ জোরদার করা হবে; এবং
- বীজ আমদানি ও রপ্তানিসহ বীজ উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত বীজ ব্যবস্থার সকল ধাপে গুণগত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৭.০ সার

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সার একটি অপরিহার্য কৃষি উপকরণ। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনার প্রসার ও নিবিড় চাষাবাদের কারণে সারের চাহিদা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি লাভ করছে। এ বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সময়মতো সার সরবরাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। রাসায়নিক সারের অসম ব্যবহারে ভূমির অবক্ষয় ও অতিরিক্ত পরিমাণে উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান আহরণের ফলে একদিকে মৃত্তিকা উর্বরতার অবনতি ঘটছে এবং অন্যদিকে ফসলের ফলন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, মৃত্তিকা উর্বরতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সুষম সার ব্যবহারের প্রতি কৃষকদেরকে উৎসাহিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। সার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করবে।

www.pathagar.com

৭.১ সংগ্রহ ও বিতরণ

- সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়েই সার ক্রয়, সংগ্রহ ও বিতরণ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে; এবং
- আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সারের আপদকালীন মজুদ বজায় রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.২ গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

- সরকার কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে;
- মৃত্তিকা, উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকর যে কোনো প্রকার সারের উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, বিতরণ এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে; এবং
- সরকার সারের গুণগত মান যাচাই করার জন্য বিশ্লেষণের সুযোগ-সুবিধা শক্তিশালী করবে।

৭.৩ জৈব ও সুষম সার প্রবর্ধন/উৎসাহিতকরণ

- সরকার কৃষক পর্যায়ে জৈব সার, কম্পোস্ট এবং জীবাণু সারের ব্যবহার উৎসাহিত করবে;
- মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদানের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত শস্য বিন্যাস অনুসরণের জন্য সচেতনতা তৈরি করা হবে;
- সুষম, সাশ্রয়ী এবং জৈবসার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে; এবং
- গুটি ইউরিয়া সারের উৎপাদন ও ব্যবহার কার্যক্রম জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৪ সার পরিবীক্ষণ

- সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সারের সরবরাহ, গুদামজাতকরণ, মূল্য এবং গুণগত মান পরিবীক্ষণ করবে।

৮.০ ক্ষুদ্র সেচ

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচকে কৃষি উপকরণসমূহের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে দেশের একটি ব্যাপক এলাকা শুকনো মৌসুমে সেচের পানি পাচ্ছে না। অধিকন্তু, উজানের দেশ কর্তৃক পানি ব্যবস্থাপনার ফলে এ অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে পারে। অতএব, ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সু-পরিকল্পিত সেচব্যবস্থা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ খরচ হ্রাসের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। এজন্য জাতীয় কৃষি নীতি পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। সরকার ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর পাশাপাশি ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বিস্তৃত আকারে উপস্থাপনের জন্য সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। যদিও ক্ষুদ্র সেচের বিরাট অংশই বেসরকারি মালিকানাধীন, তবুও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের যাতে স্বল্প খরচে টেকসই সেচ সুবিধা প্রদান সম্প্রসারিত হয়। দক্ষ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

৮.১ সেচ দক্ষতা ও পানির উৎপাদনশীলতা

- বিদ্যমান পানিসম্পদের পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের কার্যকারিতা এবং পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সেচ দক্ষতা নিরূপণ করা হবে এবং আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো হবে;

www.pathagar.com

- প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ ও প্রতিকূল এলাকা যেমন–চর, পাহাড়ি অঞ্চল, বরেন্দ্র অঞ্চল, খরাপ্রবণ, হাওর এবং লবণাক্ত অঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলে সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক সেচ, নিষ্কাশন এবং পানি প্রয়োগ পদ্ধতিসমূহের প্রচলন করা হবে;
- নলকূপসমূহের মধ্যকার দূরত্ব এমনভাবে নির্বাচন করা হবে যাতে ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপদ উত্তোলন, লবণাক্ততা প্রতিরোধ ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়; এবং
- সেচ কাজের জন্য ভূ-উপরিস্থ পানিসম্পদ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং এজন্য লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হবে।

৮.২ পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ

- পরিমিত সেচ এবং পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সেচের পানির পরিমাণ ও গুণগত মান উভয় বিষয়ে জরিপ ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বর্তমান কার্যক্রম শক্তিশালী করা হবে;
- ভূ-গর্ভস্থ পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ভূ-গর্ভস্থ পানি তথ্য সম্বলিত মানচিত্র ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কার্য-পদ্ধতি তৈরি করবে ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করবে। পানিস্তরের ওঠানামা ক্ষুদ্র সেচের উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা পরিবীক্ষণ করা হবে; এবং
- ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তর ওঠানামা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও ভূ-গর্ভ হয়ে লবণপানির অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত প্রস্তুতকৃত ডাটা ব্যাংক নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে এবং তা বিশ্লেষণ করে নিয়মিত পূর্বাভাস প্রদান করা হবে।

৮.৩ সংরক্ষণ ও ব্যবহার

- সরকার বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতার মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে খাল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের পুনঃখনন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করবে;
- পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সরকার পানি সংকটাপন্ন স্থানসমূহে Suction mode পাম্পের পরিবর্তে Force mode পাম্প ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে;
- সেচের পানির বহুবিধ ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে;
- জলাশয়, জলাধার ও অন্যান্য পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ কার্যক্রমকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে; এবং
- সরকার জলাবদ্ধ কৃষিজমি পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮.৪ সেচের জন্য শক্তি

- সেচ-কার্যে প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস ব্যবহারের জন্য সংস্থাসমূহের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতার মাধ্যমে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
- বিদ্যুৎ এবং ডিজেলের সাহায্যে পরিচালিত সেচ-কার্যের ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে; এবং
- সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য শক্তিকে সেচ কাজে ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে।

৯.০ কৃষির যান্ত্রিকীকরণ

লাভজনক ও প্রতিযোগিতামূলক কৃষির জন্য যান্ত্রিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রাণিশক্তি প্রাপ্যতা হ্রাসের ফলে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যান্ত্রিকীকরণ ব্যতীত বহুবিধ শস্যবিন্যাস বজায় রাখা সম্ভব নয়, কেননা এর সঙ্গে দ্রুত জমি তৈরি, চারা রোপণ, আগাছা দমন, ফসল কর্তন,

www.pathagar.com

প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি জড়িত। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিশেষত ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, আগাছা দমন এবং ফসল মাড়াই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধারার আরও প্রসার ঘটাতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়। প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণসহ ফসল কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড কৃষি যান্ত্রিকীকরণের আওতায় আনা প্রয়োজন।

৯.১ কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন

- আর্থ-সামাজিক, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেতিপূর্ণ কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদন ও প্রস্তুতকরণকে সরকার উৎসাহিত করবে; এবং
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত উৎপাদন কারখানা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উপযুক্ত সহায়তা করা হবে।

৯.২ সহায়তা ও প্রণোদনা

- আমদানি শুল্ক রেয়াতের সুযোগসহ কৃষি যন্ত্রপাতির পরীক্ষা প্রক্রিয়া এবং মান নির্ধারণে প্রচলিত সুবিধা অব্যাহত থাকবে যাতে এসব যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে;
- স্থানীয় উৎপাদকদেরকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য এবং দেশীয় যন্ত্রপাতির মূল্য আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মূল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কাঁচামালের আমদানির শুল্ক যুক্তিসঙ্গগত পর্যায়ে রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উৎপাদক ও ব্যবহারকারী উভয়কেই যথাযথ ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;
- সরকার বিশেষ বিশেষ কৃষি যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এসব যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী, উৎপাদক এবং কৃষক পর্যায়ে উদ্দীপনামূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রবর্ধন করবে;
- কৃষি ভর্তুকি ও উপকরণ সহায়তা কৃষি কার্ড ও কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে; এবং
- সরকার কৃষক দলভিত্তিক চাষাবাদ ও বিপণনকে উৎসাহিত করবে।

১০.০ কৃষিতে সমবায়

ক্রমহ্রাসমাণ চাষযোগ্য জমি এবং কৃষকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১০.১ সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন

- প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উৎপাদনকারী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্ব-প্রণোদিত সমবায় বা দলভিত্তিক কৃষি উৎপাদনকে সরকার উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে;
- স্ব-স্ব ভূমির মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে সমবায়ভিত্তিক আধুনিক কৃষি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সরকার সহায়তা প্রদান করবে;
- সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন উপকরণ যেমন–বীজ, সার, বালাইনাশক, জ্বালানি, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সংগ্রহে উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদান; এবং
- স্ব-স্ব ভূমির মালিকানা অক্ষুণ্ন রেখে সমবায়ভিত্তিক স্বেচ্ছা প্রণোদিত যৌথ চাষাবাদে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

www.pathagar.com

১০.২ সমবায়ভিত্তিক বিপণন

- প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষি উৎপাদনকারী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার সমবায় বা দলভিত্তিক বিপণনকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করবে;
- সমবায়ভিত্তিক আধুনিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন; এবং
- সমবায়ভিত্তিক উৎপাদিত কৃষিপণ্য উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশাধিকারে সহায়তা প্রদান করা হবে।

১১.০ কৃষি বিপণন

কৃষি বিপণন পদ্ধতি খামার পণ্য এবং খাদ্য ও কৃষিপণ্যের ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। যেহেতু কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত করা প্রয়োজন, তাই বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা আনয়নের জন্য একটি শক্তিশালী বাজার অবকাঠামো তৈরি করা আবশ্যক। দক্ষ কৃষি বিপণন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের দরকষাকষি করার শক্তি বৃদ্ধিসহ তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি করতে সরকার সহায়তা করবে।

১১.১ বিপণন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

- সরকার গ্রাম্য-বাজার স্থাপন ও পাইকারি বাজারে কৃষিপণ্য বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন হতে ভোক্তা পর্যায়ে কৃষিপণ্যের নির্ঝঞ্ঝাট সরবরাহে সহায়তা করবে;
- উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে কার্যকর মূল্য শৃংখল (Value Chain) তৈরির প্রচেষ্টা নেওয়া হবে;
- সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে;
- কৃষি বিপণন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ এবং পুনর্গঠন করা হবে;
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ এবং গুদামজাতকরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনমাফিক গুদাম এবং হিমাগার সুবিধাদি স্থাপনে সরকারি উদ্যোগসহ বেসরকারি বিনিয়োগকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে; এবং
- কৃষিপণ্যের গুণগতমান পরীক্ষা ও প্রমিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ল্যাবরেটরি ও পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বভিত্তিক বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

১১.২ বাজার তথ্য ও সম্প্রসারণ সেবা

- কৃষক, উৎপাদক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের কৃষিপণ্য এবং কৃষি উপকরণসমূহের বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচারকে সরকার উৎসাহ প্রদান করবে;
- সরকার কৃষক ও উদ্যোক্তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সংযোজনে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান কার্যক্রম প্রবর্ধন করবে;
- সঠিক মূল্য ও মানসম্পন্ন কৃষিপণ্যের বাজার সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগসমূহকে উৎসাহিত করা হবে;
- উৎপাদন এবং উৎপাদন-পরবর্তী সময়ে নিরাপদ খাদ্যের বিষয় সরকার উৎসাহিত করবে; এবং
- কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং, গ্রেডিং ও লেবেলিংয়ের কার্যক্রম উৎসাহিত করা হবে।

১১.৩ এগ্রোপ্রোসেসিং

- সরকার কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করবে;
- কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন চেইন (ভ্যালু চেইন) উন্নয়নে কাজ করা হবে; এবং
- সরকার কৃষিপণ্যভিত্তিক শিল্পে বিশেষ প্রনোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

১১.৪ রপ্তানি ও বাজার উন্নয়ন

- সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি অধ্যুষিত জনগোষ্ঠী এবং মূলধারার বাজারে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীকে উৎসাহিত করবে;
- সরকার কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং বহির্বিশ্বে নতুন ও সম্ভাবনাময় বাজারের সন্ধান করবে;
- পরিবেশবান্ধব কৃষি/জৈব কৃষিজাত পণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে; এবং
- রপ্তানি বাজার উন্নয়ন ও এ সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং তথ্য আহরণ ও বিতরণে ই-অবকাঠামোর বিকাশ উৎসাহিত করা হবে।

১১.৫ বাজার বিধিমালা ও সহায়তাকরণ

- বাজার কর্মকাণ্ড পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাজার সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা শক্তিশালী এবং হালনাগাদ করা হবে;
- কার্যকর বাজার পরিচালনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং সমন্বয়কে সরকার উৎসাহিত করবে; এবং
- খাদ্যে স্বয়ম্ভর জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ়করণ এবং খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চয়তায় কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাদের সামর্থ্যের মধ্যে কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ এবং কৃষি বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করার লক্ষ্যে সরকার কৃষি মূল্য কমিশন গঠন করবে।

১১.৬ বেসরকারি খাতে কৃষিবাণিজ্য সম্ভাবনা

- সরকার ব্যক্তি উদ্যোক্তা এবং কৃষকদের কৃষিবাণিজ্য কার্যক্রম গ্রহণে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে; এবং
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

১২.০ কৃষিতে নারী

দেশের মোট মানবসম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী। সেজন্য, সরকারি চাকরি ও কৃষি ক্ষেত্রে আরও অধিক সংখ্যক নারী কৃষক এবং কৃষি শ্রমশক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কৃষি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীর অবদান রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কৃষি সংক্রান্ত অর্থোপার্জন কর্মকাণ্ডে নারীকে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের করণীয় নিম্নরূপ :

১২.১ নারীর ক্ষমতায়ন

- পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান কর্মকাণ্ড উন্নয়নে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে;
- কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে; এবং
- কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

www.pathagar.com

১২.২ উৎপাদন ও বিপণনে অংশগ্রহণ

- সরকার কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে, বিশেষত : কৃষি প্রক্রিয়াকরণ এবং কৃষি-ব্যবসা কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে যাতে তারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে;
- কৃষিতে নারীর প্রযুক্তিগত ক্ষমতায়নকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে;
- কৃষিপ্রযুক্তি প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণকে সহজতর করা হবে; এবং
- বিভিন্ন প্রকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড যেমন প্রশিক্ষণ, কৃষক সমাবেশ ও কর্মশালায় নারীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১২.৩ আয়ের সুযোগ সৃজন

- কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, যেমন বসতবাড়িতে বাগান, ফসল কর্তনোত্তর কর্মকাণ্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, নার্সারি, মৌমাছি-পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার ঋণ সহায়তা প্রদান করবে;
- সরকার ক্ষুদ্র আকারের কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ ও সংরক্ষণে মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে; এবং
- নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

১৩.০ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

কৃষিজমিসহ প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপর ফসল উৎপাদন নির্ভরশীল বিবেচনায় সরকার এক্ষেত্রে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

- সরকার কৃষিজমির ক্রমহ্রাসমান ধারাকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি বিবেচনায় এনে কৃষিজমি অকৃষিকাজে ব্যবহার বন্ধের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে;
- সরকার জলাবদ্ধ কৃষিজমি পুনরুদ্ধারসহ সাগরতীরবর্তী এলাকায় ভূমি উদ্ধারের মাধ্যমে কৃষিজমি বাড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে;
- মৃত্তিকা, পানি, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল এবং বায়ুমণ্ডলের জীবনরক্ষা ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও কার্যকর ব্যবহারের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; এবং
- সরকার কৌলিসম্পদ (Genetic Resources) সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে।

১৪.০ মানবসম্পদ উন্নয়ন

কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবে কৃষকদের শস্য উৎপাদন ক্ষমতা এবং জনগণের চাহিদার মধ্যকার ব্যবধান দূর করা এবং তাদের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন দক্ষ কৃষিশ্রমিক ও শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের বিশাল ভান্ডার। কার্যকর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত মানবসম্পদ পরিকল্পনা এবং পেশাগত উন্নয়ন প্রয়োজন। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ ও কর্মের জন্য পুরস্কৃত করার পদ্ধতিসহ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্যাকেজভিত্তিক কর্মসূচি উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব। দেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা যারা উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় প্রযুক্তি উদ্ভাবন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন অর্জনে সক্ষম। সরকার কৃষিকাজে নিয়োজিত গবেষক, সম্প্রসারণবিদ ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ডে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

১৪.১ প্রশিক্ষণের আওতা

- কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে; এবং
- জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি ও অন্যান্য কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

১৪.২ গবেষণা খাতে প্রশিক্ষণ

- গবেষণা খাতের বর্তমান মানবসম্পদকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনমাফিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে;
- বিজ্ঞানের অগ্রসরমান ক্ষেত্র, প্রযুক্তি এবং কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে;
- গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মানবসম্পদ ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হবে; এবং
- কৃষি গবেষণা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রশিক্ষণের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

১৪.৩ কৃষি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

- কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে ডিপ্লোমা পর্যায়ে শিক্ষা জোরদার করা হবে; এবং
- কার্যকর প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রযুক্তি প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে। পেশাগত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং ন্যায়-নীতি বোধ সমুন্নত রাখার কৌশল হিসেবে কৃষক এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৪.৪ বীজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বীজের বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৪.৫ সার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- সুষম সার ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; এবং
- সার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা, বিজ্ঞানী, সার ব্যবসায়ী, বিতরণকারী এবং উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১৪.৬ সেচ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ

- সেচযন্ত্র পরিচালনা, মেরামত এবং এসব যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তা ও বেকার তরুণদেরকে উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে; এবং
- কৃষক ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্য খামার পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ শক্তিশালী করা হবে যাতে তা জ্ঞান-পার্থক্য ও ফলন-পার্থক্য কমাতে সহায়ক হয়।

১৪.৭ যান্ত্রিকীকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- মাঠ পর্যায়ে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী, যেমন চালক, কৃষক, যুবসমাজ, উৎপাদনকারীদের কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

www.pathagar.com

১৪.৮ সুযোগ সুবিধা ও কর্মসূচি প্রণয়ন

- স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের জন্য কৃষিভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা হবে;
- সরকার কৃষিতে চাহিদাভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহের জন্য গবেষণা এবং সম্প্রসারণ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত সুযোগ সৃষ্টি ও শক্তিশালী করবে; এবং
- প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধাদি এমনভাবে শক্তিশালী করা হবে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক মানের হবে।

১৪.৯ প্রণোদনা

- শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সম্প্রসারণ, শস্য উৎপাদন ও কৃষি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উৎকর্ষ সাধনকে প্রবর্ধন এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পুরস্কার প্রদানকে প্রাতিষ্ঠানিক করা হবে; এবং
- কৃষিবিজ্ঞান, সম্প্রসারণ এবং গবেষণা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে Visiting scientist, Sabbaticals এবং National fellows পদ প্রবর্তন করা হবে;

১৪.১০ অংশীদারিত্ব

- কৃষি ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভিত্তি সমৃদ্ধ করা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশসমূহের কৃষিকেন্দ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় সরকার উৎসাহ প্রদান করবে; এবং
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শক্তিশালী সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পরিক ধ্যানধারণা বিনিময় ও প্রয়োগ সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে।

১৫.০ কৃষি খাতে শ্রম

- কৃষি শ্রমিক কল্যাণকে উন্নয়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হবে;
- আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে ঝুঁকিপূর্ণ কৃষিকাজে (যেমন–বালাইনাশক প্রয়োগ, ভারি, ধারালো ও ঘূর্ণায়মান কৃষি যন্ত্রপাতি চালানো) শিশুশ্রম ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হবে।

১৬.০ অ-কৃষি কার্যক্রম

- দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত কৃষকদের অ-খামার খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে; এবং
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত কৃষকদের জন্য অকৃষি খাতে অর্থোপার্জন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৭.০ বাংলা ভাষার প্রাধান্য

এ নীতি কার্যকর করার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ নীতির ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করতে পারবে। বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠে কোনো বিভ্রান্তি/অসামঞ্জস্য দেখা দিলে বাংলায় প্রণীত নীতি গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে।

১৮.০ উপসংহার

গবেষক, ব্যবহারকারী এবং বিশেষজ্ঞদের প্রায়োগিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে উপরে বর্ণিত নীতিসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় কৃষি নীতির সঠিক বাস্তবায়ন ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বেগবান করবে, যার ফলশ্রুতিতে সময়ের পরিবর্তনে সামগ্রিকভাবে কৃষি একটি গতিশীল খাতে পরিণত হবে যা দেশের

www.pathagar.com

অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আশা করা যায়। জাতীয় কৃষি নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষক, গবেষক, বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণবিদ, কৃষি ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদ সকলে তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল অবদান রাখবেন বলে আশা করা যায় এবং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সার্ক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে।

তথ্যসূত্র

কৃষি মন্ত্রণালয়. (২০১৩). *জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩*. ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়. (২০১৫). *জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৫*. ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়. (১৯৯৩). *জাতীয় বীজ নীতি ১৯৯৩*. ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়. (১৯৯৭). *বীজ আইন ১৯৯৭*. ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়. (২০০২). *সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০২*. ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়. (২০০২). *জাতীয় পাট নীতি ২০০২*. ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়. (২০০৫). *জাতীয় পশুসম্পদ নীতি ২০০৫*. ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়. (১৯৯৮). *জাতীয় মৎস্যনীতি ১৯৯৮*. ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়. (২০০১). *জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি*. ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়. (১৯৯৯). *জাতীয় পানি নীতি*. ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়. (২০০৬). *জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬*. ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আলম, মী. সা. (২০১৫), *কৃষি ও গণমাধ্যম নির্দেশিকা*. ঢাকা : ক্যাটালিস্ট ও সমষ্টি

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অংশ

সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১০. কৃষি সংবাদ : প্রবণতা, উৎস ও ধরন

অজয় দাশগুপ্ত, মীর মাসরুর জামান, মীর সাহিদুল আলম ও রিয়াজ আহমদ

ইউরোপীয় প্রযুক্তি বিকাশের ধারায় আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে আমাদের প্রাচ্য অঞ্চলে সাংবাদিকতার একটি ধারা প্রচলিত ছিল। তখন এই অঞ্চল কৃষিপ্রধানই ছিল এবং জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃষির প্রতিচ্ছবি কতটা প্রতিফলিত হতো তা গবেষণার দাবি রাখে।

ইংরেজ আমলে ১৮৮৭ সালে প্রচণ্ড খরায় ভারতীয় উপমহাদেশে ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন তার মার্কিন ধনকুবের শ্বশুরের বন্ধু আরেক ধনকুবের হেনরি ফিপসের দেওয়া ২০ হাজার পাউন্ড দিয়ে বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলায় গড়ে তোলেন ইম্পেরিয়াল অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট। সেখান থেকে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় দ্য অ্যাগ্রিকালচারাল জার্নাল অব ইন্ডিয়া। প্রসার ঘটে কৃষি যোগাযোগের। তার আগে ১৮৬৩-৮৫ সময়কালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক গ্রামবার্তা। ইতিহাস বলে, গ্রামবার্তার পাতায় পাতায় অন্যান্য অনেক খবরের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অনেক কৃষিসংবাদ। তাই বলা যায়, আমাদের কৃষি সাংবাদিকতার ইতিহাস অনেক পুরোনো। কৃষির সংবাদ, কৃষকের সংবাদ বরাবরই প্রকাশ হয়েছে গণমাধ্যমে। কালের পরিক্রমায় বদলেছে তার রূপ, প্রকাশভঙ্গি, উপস্থাপনা আর ব্যাপ্তি। তবে মূলধারার সাংবাদিকতায় কৃষির গুরুত্ব, উপজীব্যতা এখনও কতটা স্থান করে নিতে পেরেছে সে নিয়ে তর্ক হতে পারে।

তবে আধুনিক বাংলাদেশে বিশেষ করে '৯০-উত্তর গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার সময়ে এসে মূলধারার সাংবাদিকতায় যে আঙ্গিক এবং আধেয়গত পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাতে বিবিধ বিষয়ে বিশেষায়িত সাংবাদিকতার একেকটা আলাদা জায়গা (space) তৈরি হয়েছে। অতিমাত্রায় রাজনৈতিক বিষয়নির্ভর খবর থেকে প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলো একটা সময়ে এসে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের প্রকৃত সংবাদমূল্য উপলব্ধি করতে শেখে। তারই

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতায় খুব ন্যায়সঙ্গতভাবেই অর্থনীতির একটি অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে কৃষি ও কৃষকের কথা, কৃষিজমির কথা ধীরে ধীরে সংবাদের নিয়মিত উপজীব্য হয়ে উঠল।

তাই নব প্রজন্মের কৃষি সাংবাদিকদের এখন খুব সাদামাটা কৃষি রিপোর্টিংয়ের প্রথাগত চর্চা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আরও বিশেষায়িতভাবে কৃষি-অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে হবে। এবং সেই চ্যালেঞ্জটাই নিচ্ছেন এখন অনেকে। তবে তার জন্য নিজেদের তৈরি করা দরকার সবার আগে। সেই তৈরি হওয়ার কাজে প্রধানত দরকার কৃষিকে জানা, কৃষি তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকা আর কৃষি সংবাদের উপস্থাপনা কৌশল রপ্ত করা ও সংবাদসূত্রগুলোকে চিহ্নিত করা এবং নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করা।

কৃষি সংবাদের উপাদান ও সংবাদমূল্য নির্ধারণী বিষয়সমূহ

প্রথাগতভাবে সাংবাদিকতায় যেসব চিরায়ত সংবাদ-উপাদান মূল্যায়ন করা হয় যেমন—সময়ানুবর্তিতা, নৈকট্য, গুরুত্ব, মানবিক আবেদন, জনস্বার্থ/আগ্রহ ইত্যাদি তার সবই কৃষি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তবে, কৃষি সাংবাদিকতা যেহেতু একটি বিশেষায়িত সাংবাদিকতা এবং এর যেহেতু স্বতন্ত্র বিষয়বৈশিষ্ট্য ও অভীষ্ট পাঠক/শ্রোতা/দর্শক গ্রুপ রয়েছে তাই এ ধারার সাংবাদিকতারও কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকাটাই স্বাভাবিক।

কৃষি সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচন ও সংবাদমূল্যের গুরুত্ব বিচারে নানাভাবে বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব। যেমন—একভাবে দেখলে বিষয়গুলোকে ২টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

১. মাঠ পর্যায়ে প্রামাণ্য প্রতিবেদন
২. নীতিসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন।

আবার অন্যভাবে দেখলে এভাবেও ভাগ করা যায়—

১. কৃষিপণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন।
২. কৃষকের উপর প্রতিবেদন।
৩. কৃষি বাজেট বিশ্লেষণী প্রতিবেদন।
৪. কৃষিবাজার ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ইত্যাদি।

কৃষি সাংবাদিকতায় সময়োপযোগিতার (timeliness) গুরুত্ব বেশি। যেহেতু কৃষিপণ্য উৎপাদিত হয় মৌসুমভিত্তিক, তাই একেক মৌসুমে একেকটি বিষয়ে প্রতিবেদন অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। আবার বাজেট প্রণয়নপূর্ব সময়ে যদি কৃষিনীতি নির্ধারণী বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা যায় এবং প্রতিবেদন তৈরি করা যায়, তবে তাও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন বিভিন্ন খাত নিয়ে হতে পারে। যদিও প্রায়শই কৃষি সাংবাদিকতাকে আমরা ধাননির্ভর বা বড়জোর শস্যপণ্য (cereal products) নির্ভর রিপোর্টিংয়ে সীমিত করে ফেলার প্রবণতা লক্ষ করি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন—ফসল খাতের পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ ও মৎস্যখাত নিয়েও প্রতিবেদন হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

সাংবাদিকের দায়িত্ব ও গুণাবলি

প্রথমেই বলতে হয় বিশেষায়িত একটি ক্ষেত্রের সাংবাদিকতার চর্চা করা হলে, তা সে কৃষি হোক বা শিল্প, স্বাস্থ্য বা জ্বালানি—যে খাতই হোক না কেন, সেই বিষয়ের উপর জ্ঞান রাখাটা জরুরি। তাই কৃষিবিষয়ক সাংবাদিকতা করতে চান বা করছেন এমন সাংবাদিককে অবশ্যই বিষয় হিসেবে কৃষিতে আগ্রহী হতে হবে এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলেও মৌলিক কিছু জ্ঞান রাখতে হবে (বিভিন্ন কৃষিবিষয়ক ইস্যুগুলো এই বইয়ের প্রথম অংশে আলোচনা করা হয়েছে)।

কৃষি বিষয়ে আগ্রহী সাংবাদিকরা কৃষির বৈশ্বিক ও দেশীয় এবং আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হবেন এবং একইসঙ্গে ক্রমপরিবর্তনশীল কৃষিতথ্য সম্পর্কে আপডেট থাকবেন। কৃষির সঙ্গে দেশের অর্থনীতি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষিজাত শিল্প, খাদ্যনিরাপত্তা ও জনসংখ্যা এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবসহ নানা বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় কৃষি সাংবাদিককে এসব বিষয়েও জ্ঞানের চর্চা করতে হবে। কৃষি সাংবাদিকের তাই দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে কৃষি সাংবাদিকতার জন্য দক্ষ করে তোলা এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী কৃষিসংশ্লিষ্ট মাঠ প্রতিবেদন থেকে শুরু করে নীতি পর্যালোচনা সব বিষয়েই প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশের মধ্য দিয়ে পাঠকের চাহিদা পূরণ করা।

কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদনগুলো সচিত্র হলেই অধিক মনোগ্রাহী ও প্রামাণ্য হয়। এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের দায়িত্ব হচ্ছে তিনি যে বিষয়ে প্রতিবেদন রচনা করার পরিকল্পনা করবেন তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট/প্রযোজ্য ছবির বিষয়ে চিত্রসাংবাদিককে অবহিত করা। সঠিকভাবে এবং সময়োপযোগীভাবে কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করা বা সংবাদপত্রের জন্য নিবন্ধ, সম্পাদকীয় রচনা কিংবা বেতারে কথিকা তৈরি বা টেলিভিশনে টকশোতে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি, যাই করা হোক না কেন, একজন কৃষি সাংবাদিককে যেমন মাঠের খবর রাখতে হবে, তেমনি কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সার, বীজ ব্যবস্থাপনা, ভর্তুকি রীতি এমনকি বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) পর্যায়েও যেসব সংলাপ, বৈঠক হয় তার খোঁজখবর রাখতে হবে।

যেহেতু বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান সময়ে একটা উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের বিষয় এবং এর কারণে সারা বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্যনিরাপত্তায় ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা রয়েছে, তাই একজন কৃষি সাংবাদিকের দায়িত্ব হবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশেষ করে বাংলাদেশের কৃষিখাতে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আশঙ্কা-সম্ভাবনার চিত্রগুলো তুলে ধরা।

বাংলাদেশে তো বটেই বিশ্বজুড়েই এখন জনসংখ্যাধিক্য এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিষয়গুলো প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব ফেলছে খাদ্যনিরাপত্তায়। তার উপর যুক্ত হয়েছে কৃষিজমি থেকে জৈব জ্বালানি তৈরির জন্য উন্নত বিশ্বের এক অসম প্রতিযোগিতা, যেখানে কৃষিজমি অন্য খাতে ব্যবহৃত হবার ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান কৃষিজমির পরিমাণ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাই এই বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের মতামতসহ প্রতিবেদন তুলে ধরা এখন কৃষি সাংবাদিকদের একটা বড় দায়িত্ব।

www.pathagar.com

কৃষি সাংবাদিকতার সূত্র

সাংবাদিকতায় সূত্র হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়। একজন সাংবাদিক, সে কৃষি বিষয়ে হোক কিংবা রকেট সায়েন্স বিষয়ে হোক, যে বিষয়েই প্রতিবেদন তৈরি করুন না কেন, তার সব তথ্য তিনি নিজেই জানেন এবং সেই জানা থেকে লিখেছেন এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। বরং সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে তিনি প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য তথ্যগুলো জেনে, এবং তারপর তা যৌক্তিকভাবে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের বোধগম্য করে প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করেন।

কৃষি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিকের প্রধান তিন সূত্র হচ্ছে :

১. কৃষক
২. ফসলের মাঠ
৩. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে অনেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন কৃষির সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। তারাই হচ্ছেন একজন কৃষি সাংবাদিকের নির্ভরযোগ্য সূত্র।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থা :

- ইউনিয়ন/মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তা।
- উপজেলা পর্যায়ের কৃষি কার্যালয়।
- জেলা ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভাগীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকতার কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (DAE) সদর দপ্তর, ঢাকার খামারবাড়ি।
- কৃষি তথ্য সার্ভিস (AIS)।
- কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ গবেষণা ও উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (CERDI)।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (BARC)।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BARI)।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (BRRI)।
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (BINA)।
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট (BJRI)।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট (BSRI)।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট (BTRI)।
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি (SCA) ও সিড বোর্ড।
- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (SRDI)।
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড (CDB)
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (DAM)
- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (BIRTAN)
- হর্টিকালচার এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (HORTEX FOUNDATION)

www.pathagar.com

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (DLS)
- বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (BLRI)
- মৎস্য অধিদপ্তর (DoF)
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI)
- বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC)

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও অধীন সংস্থা:

- খাদ্য অধিদপ্তর এই মন্ত্রণালয়ের একমাত্র সংস্থা

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা

- পরিবেশ অধিদপ্তর।
- বন অধিদপ্তর।
- বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (BFRI)।
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (BCCT) ইত্যাদি।
- বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ইত্যাদি।
- বেসরকারি দেশি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ, যাদের কৃষিসংশ্লিষ্ট কর্মসূচি রয়েছে, যেমন—ব্র্যাক, প্রশিকা, গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন, আরডিআরএস, অক্সফাম, ওয়ার্ল্ড ফিশ, প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন ও সুইসকন্ট্যাক্ট ইত্যাদি।
- কৃষি উপকরণ, বীজ বিপণন, কৃষিজাত শিল্প উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি।

এছাড়াও কৃষি নিয়ে গবেষণা করেন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও কৃষি সাংবাদিকের তথ্যসূত্র হতে পারে, যেমন—

- বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিটিউট (BIDS), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA), উন্নয়ন বিকল্প নীতি গবেষণা (উবিনীগ), উন্নয়ন অন্বেষণ, বাংলাদেশ ফোরাম ফর ইনফরমেশন ডেসিমিনিশান অন অ্যাগ্রিকালচার (FIDA) ইত্যাদি।

অনেক ক্ষেত্রে কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কৃষিসংশ্লিষ্ট সংগঠনের তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণালব্ধ বক্তব্যও কাজে লাগে। তাই এসবও সূত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন–

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (FAO)
- জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

www.pathagar.com

- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)
- আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (IRRI)
- আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইন্সটিটিউট (IFPRI)

কৃষি সাংবাদিকতার বিষয় নির্বাচন

কৃষিসংক্রান্ত যেকোনো কিছুই কৃষি সাংবাদিকতার বিষয় হতে পারে। যেমন–কৃষিপণ্যের উৎপাদনের পরিমাণ, পোকার আক্রমণ, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা, কৃষিপণ্যের আমদানি-রপ্তানি, কৃষিপণ্যের পরিবহন ও বাজারজাতসহ যে কোনো বিষয়ে সমাজের একটি বড় অংশের আগ্রহ রয়েছে বা যে বিষয়ের প্রভাব একটি বড় জনগোষ্ঠীর উপর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাই এসব বিষয় সংবাদ হতে পারে।

নিচে একটি প্রকাশিত কৃষি সংবাদের উদাহরণ দেওয়া হলো

বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার কৃষিপণ্য নষ্ট হচ্ছে

সংরক্ষণ ও পরিবহন ত্রুটি

কৃষিতে আধুনিক কলাকৌশল ও সুষ্ঠু কৃষি বিপণন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ ও পরিবহনের অভাবে প্রতিবছর ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কৃষিপণ্য অপচয় হচ্ছে। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনার অভাবে অপচয় হওয়া বিপুল এই কৃষিপণ্যের মূল্য আনুমানিক ৪ হাজার কোটি টাকা।

গতকাল রাজধানীর এফবিসিসিআই ভবনে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো-বেইজড প্রোডাক্টস প্রডিউসার অ্যান্ড মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত 'কৃষি ও কৃষি খাতের আধুনিকায়ন, অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং রফতানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন।

সেমিনারে পরিবহনে চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানো, সুশাসনের অভাবের জন্য গণতন্ত্রকে দায়ী করেন বাণিজ্যমন্ত্রী জি এম কাদের। তিনি জনসাধারণের এ ক্ষতিকে 'গণতন্ত্রের মূল্য' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। মন্ত্রী রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করে বলেন, ভোটের রাজনীতির কারণেই দুর্বৃত্তদের সামাল দেওয়া যায় না। রাজনৈতিক দলের লাঠিয়ালরাই চাঁদাবাজি ও সিন্ডিকেট করে।... সেমিনারে বক্তারা আরও বলেন, কৃষিজমি সংরক্ষণ, কৃষিতে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তারা বলেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতিবছর খাদ্যশস্যের চাহিদা বাড়ছে অর্থাৎ বছরে প্রায় আরও ০.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন। অন্যদিকে দেশে মাত্র শতকরা চার ভাগ চাষযোগ্য ভূমি অনাবাদি রয়েছে। ফলে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলে অদূর ভবিষ্যতে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে সেমিনারে বক্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।... এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন, কৃষক অনেক সময় ন্যায্যমূল্য পায় না। আবার শহরের মানুষ অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য কিনতে বাধ্য হয়। মধ্যস্বত্বভোগী, চাঁদাবাজি, পরিবহন খরচ, পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, ব্যাংকের উচ্চ সুদের কারণে উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ের মূল্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য তৈরি হয়। পচন রোধে শাকসবজির হিমাগার ও হিমাগার পরিবহন ব্যবস্থা করা যায় কি না তা গবেষণা করে দেখা দরকার।

নিজস্ব প্রতিবেদক, সকালের খবর, ১৮ এপ্রিল ২০১২

এটি একটি সেমিনার রিপোর্ট যেখানে একটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। একটি ভালো রিপোর্টের জন্য একাধিক তথ্যের উৎস ব্যবহার করা উচিত।

www.pathagar.com

এক সময়ে বাংলাদেশে প্রধান ধানের মৌসুম ছিল আমন। কিন্তু নব্বইয়ের দশক থেকে বোরোই প্রধান ধানের মৌসুম। বোরো ধানচাষের জন্য উচ্চফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার হয়। একইসঙ্গে চাই সেচের পানি ও কীটনাশক ওষুধ। এক সময় 'ইরি' নামে পরিচিত কয়েক ধরনের ধান চাষ হতো, যা উচ্চফলনশীল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এরপর নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশের বাজারে এসেছে 'হাইব্রিড' জাতের বীজ, যার ফলন আরও বেশি। এ বীজের সরবরাহ আসে কৃষক নয়, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। প্রথমদিকে ব্যবসায়ীরা আমদানি করে চাহিদা মেটাত। ক্রমে দেশেও তার উৎপাদন শুরু হয়। কৃষকের হাত থেকে এভাবে 'বীজের উৎস ব্যবসায়ীদের কাছে চলে যাওয়া' যথার্থ কি না, সেটা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতের ভিন্নতা লক্ষণীয়। 'অপরিচিত' এবং দেশের পরিবেশের সঙ্গে 'বেমানান' বীজ ব্যবহার করতে দেওয়া কতটা সঙ্গত, সে প্রশ্নও রয়েছে। শুধু ধান নয়, আরও অনেক ধরনের শস্যে হাইব্রিড জাতের চাষ হয়। সবজি উৎপাদনে এর ব্যবহার বেড়ে চলেছে। সাংবাদিকদের কাছে এসবই খবর। তাদের এখন বিজ্ঞানের খবর রাখতে হয়, পরিবেশ সম্পর্কে জানতে হয়। নতুন কী জাত এল চিন, ফিলিপাইন কিংবা জাপানে, সেখবর প্রথমে দেশের ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারক এবং পরে কৃষকদের জানাতে হয়।

বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করে তুলতে গবাদি পশুর ব্যবহার ছিল। কোথাও কৃষক অর্থের কারণে লাঙল টানার জন্য বলদের ব্যবস্থা করতে না পেরে 'নিজের সন্তানদের দিয়ে বলদের কাজ করালে' সেটা হতো চাঞ্চল্যকর সংবাদ। পরে এসেছে কলের লাঙল অর্থাৎ ট্রাক্টর। এ যন্ত্র কৃষি মজুরদের জন্য সর্বনাশা–এমন খবর এক সময় গুরুত্ব পেত। কৃষিতে ধনবাদী প্রথার প্রচলনের অভিযোগ উঠত। কিন্তু একসময় প্রতিষ্ঠিত হলো–ট্রাক্টরের বিকল্প নেই। সেচের জন্য যন্ত্র চাই–সেটাও এভাবে সবাই মেনে নিয়েছে। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকেই দেখা যায়, বোরো-আমন কাটার সময়ে পর্যাপ্ত শ্রমিক মিলছে না। কিংবা মিললেও তারা এত উচ্চহারে মজুরি বা ধানের ভাগ চাইছে, যা জমির মালিকের জন্য ধান চাষে লোকসানের কারণ হতে পারে। এরচেয়েও বড় সমস্যা–ধান পাকলে স্বল্প সময়ের মধ্যে কেটে মাড়াই-শুকানো-মজুদের কাজ করতে হয়। এজন্য যন্ত্রের ব্যবহার হলে ধান কাটা মজুরদের মৌসুমে কাজ পেতে সমস্যা হতে পারে। তাদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা কমে যেতে পারে। গণমাধ্যমের জন্য এসব ইস্যু হচ্ছে আকর্ষণীয়। এমন প্রেক্ষাপট সাংবাদিকদের বিবেচনায় রাখতে হবে। তাদের নতুন বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে হবে।

একইভাবে বিপণন-বাজারজাত করার বিষয়টিও গণমাধ্যমের বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন বোরো, আমন ও মৌসুমের ধান তোলার সময় শুধু কৃষক বা ধানকাটা মজুর নয়, ধান-চালের ক্রেতা থেকে ব্যাংকার ও মহাজন অনেকেই যুক্ত থাকেন। ফসল ভালো হলে কিংবা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হলে অথবা বন্যা-খরায় মার খেলে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা। গণমাধ্যম এসবের কোনোটাই উপেক্ষা করতে পারে না। ধানের ফলন ভালো হলে প্রান্তিক বাজারে দাম কমে যেতে পারে। সংবাদপত্রে-টেলিভিশনে এ ধরনের খবর প্রাচারিত হলে সরকার বাজারে হস্তক্ষেপ করার কথা ভাবতে পারে। অর্থাৎ খাদ্য মন্ত্রণালয় বাজার থেকে কিছু ধান বা চাল কিনে নেবে। কিংবা বেসরকারি খাতের ক্রেতা অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা যাতে হাত গুটিয়ে বসে না থাকে সেজন্য সহায়ক

www.pathagar.com

পরিবেশ সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হতে পারে। এজন্য ব্যাংকের সহায়তা দরকার হয়, উপযুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থাও অপরিহার্য। খাদ্য মজুদের জন্য গুদামের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আবার আলু এবং আরও কয়েক ধরনের শস্য সংরক্ষণে দরকার হয় হিমাগার বা কোল্ড স্টোরেজ। কৃষির সঙ্গে কৃষিভিত্তিক শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধান থেকে চাল উৎপাদন করতে শত শত বছর ধরে ঢেঁকির ব্যবহার হয়েছে। এর সঙ্গে কর্মসংস্থানও জড়িত ছিল। ধান ভানার মেশিন চালু হলে বেকারত্ব বাড়বে, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের সর্বনাশ হবে এবং গ্রামীণ লাখ লাখ পরিবারে হাহাকার পড়ে যাবে—এমন সংবাদ এক সময়ে প্রকাশিত হতো। পাঠকরাও তা পছন্দ করত। এ ধরনের খবরে বাস্তবতার পাশাপাশি আবেগমিশ্রিত হলে পাঠকহৃদয় ছুঁয়ে যেত।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রে কৃষিপণ্যসংক্রান্ত প্রতিবেদনে ভোক্তাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। বাজার নিয়ন্ত্রণে অর্থাৎ দাম কম রাখার চেষ্টা হবে তাদের স্বার্থে। মাছ-মাংস-ডিম প্রভৃতি পণ্যের ক্ষুদ্র উৎপাদকদের পক্ষে গণমাধ্যম তেমন সোচ্চার হয়নি। তবে এ ধারায় পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থে ভারসাম্য আনা অর্থনীতির স্বার্থেই জরুরি–এ মত এখন অনেকেই স্বীকার করছেন। যেহেতু পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে সরবরাহের মতো কৃষিপণ্য উৎপাদক কম এবং সে তুলনায় ভোক্তা বা ক্রেতা সংখ্যা অনেক বেশি, সে কারণে সংবাদপত্র ও বেতার-টেলিভিশনের প্রতিবেদনে শেষোক্তদের স্বার্থ বেশি প্রধান্য পেয়ে থাকে। বিশেষ করে শহরের মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর (যারা সংবাদপত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠক এবং টেলিভিশনের মূল শ্রোতা-দর্শক) প্রত্যাশা ও সংবেদশীলতা বিবেচনায় রাখতেই হয়। যেকোনো বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এমন একটি অংশ থাকে যাদের ব্যবসায়ী বা ট্রেডার্স বলা হয়। মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবেও অনেকে এদের চিহ্নিত করে থাকেন। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য তারা সস্তায় কেনে এবং শহরে বেশি দামে বিক্রি করে–এমন প্রতিবেদন সংবাদপত্র এবং বেতার-টিভিতে নিয়মিত থাকে। এধরনের প্রতিবেদন উৎপাদকের স্বার্থ রক্ষার সহায়ক হয়। তারা বাজার থেকে ন্যায্য দাম পাওয়ার বিষয়ে সচেতন হয়।

আম জনপ্রিয় ফল। একইসঙ্গে আম অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল। পেয়ারা, আনারস, কাঁঠাল, কলা—এসবও কেবল কৃষিখাতের বিষয় থাকেনি। চা-বাগান কৃষির সঙ্গে বরাবরই যুক্ত। এ দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাত করার জন্য শিল্পের যাত্রা অবশ্য চা-চাষের শুরু থেকেই ছিল। চায়ের সঙ্গে এ শিল্পের শ্রমিকদের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় কর্মরত এ শিল্পের শ্রমিকরা সংগঠিত এবং তারা সর্বদা গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে থাকে।

কৃষিতে নারীর ভূমিকাও গণমাধ্যমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বহুকাল ধরেই কৃষিতে নারীর শ্রম অপরিহার্য ও লাভজনক হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পারিবারিক পরিমণ্ডলে যেমন তারা শ্রম দেয়, তেমনি শ্রমবাজারেও বাড়ছে তাদের উপস্থিতি। তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হয়—গণমাধ্যম এ অভিযোগ নিয়ে সর্বদা সোচ্চার এবং তাতে প্রতিকারের সম্ভাবনা বাড়ে। জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেটের ধারণাতেও কৃষি-নারী বিবেচনা পায়। নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রশ্ন রয়েছে। তাদের জন্য করুণা হিসেবে কিছু বরাদ্দ রাখা নয়; বরং অধিকারের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসায় গণমাধ্যম সক্রিয়।

কৃষিখাতে ব্যাংকঋণ বাড়ছে। সরকারি ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি দেশীয় বেসরকারি এবং বিদেশি ব্যাংক এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে। এ শতাব্দীর প্রথম দিকেও যা ছিল শূন্যের কোঠায়।

www.pathagar.com

এ পরিবর্তনের পেছনে সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের নিরন্তর চেষ্টা ছিল। ভূমিহীন বর্গাচাষিও এসেছে ব্যাংকঋণের আওতায়। খাদ্যশস্য ও পাটের মতো দ্রব্য উৎপাদনের পাশাপাশি মসলা—আদা, পিঁয়াজ, রসুন, হলুদের জন্য নামমাত্র সুদে ব্যাংকঋণ চালু আছে। কৃষিতে ব্যাংকঋণের ইস্যুটি সাংবাদিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অনেক প্রতিষ্ঠান আন্তরিকভাবেই এ কার্যক্রম চালিয়ে যায়, আবার অনিয়মও বিদ্যমান। বাংলাদেশ ব্যাংক ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আন্তরিক চেষ্টায় কৃষকদের মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বল্পসময়ের মধ্যে এ সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যায় (সায়েম, ১৪২২)। শুরু থেকেই এ বিষয়টি গণমাধ্যমের নজরে এসেছে। এসব অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত কৃষকরা এর ধারাবাহিকতায় আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুফল নিতে উদ্যোগী হতে পারে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা থাকা চাই।

গ্রামীণ অর্থনীতি বদলে যাচ্ছে—সেটা সাংবাদিকদের নজর এড়ায় না। এ জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্তদের জন্য বাজার সুবিধা সম্প্রসারিত হচ্ছে, সে খবর গণমাধ্যম পৌঁছে দেয়। কৃষি ও কৃষকও বদলে যাচ্ছে। শস্যের ফলন, বাজারদরসহ নানা ধরনের খবর কৃষকের কাছে দ্রুত পৌঁছাতে প্রযুক্তিও সহায়তা দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের খবরও তারা জানতে পারছে। ভারতে কিংবা ব্রাজিলে কোনো শস্যের বাম্পার ফলন কিংবা ফলন কম হওয়া তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারছে গণমাধ্যমের কারণেই। জলবায়ু পরিবর্তনও তাদের জন্য কেবল কপাল-লিখন হয়ে নেই। তারা করণীয় জানতে পারছে এবং অন্যদের করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে নিজেদের ভূমিকাও জেনে নিচ্ছে।

এদেশের দরিদ্র কৃষকরা কেবল করুণার পাত্র নয়—তারা ন্যায্য অধিকারের দাবিদার, বাংলাদেশের গণমাধ্যম এ বিষয়টি সফলতার সঙ্গেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে আরও করণীয় রয়েছে এবং কৃষি সাংবাদিকতায় যুক্তদের জন্য এ এক বড় কর্মক্ষেত্র।

তথ্যসূত্র

সায়েম, মো. আ. (১৪২২). *কৃষি কথা*. ঢাকা : কৃষি তথ্য সার্ভিস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১১. বিভিন্ন ধরনের কৃষি প্রতিবেদন

মীর মাসরুর জামান ও রিয়াজ আহমদ

সংবাদ সংগ্রহ ও লেখার ধরনের উপর ভিত্তি করে তিন ধরনের কৃষি প্রতিবেদন লেখা হয়ে থাকে। যেমন : সাদামাটা প্রতিবেদন, গভীর প্রতিবেদন ও ফিচার বা মানবিক আবেদনসম্পন্ন প্রতিবেদন।

সাদামাটা প্রতিবেদন বা হার্ড রিপোর্ট

সাদামাটা প্রতিবেদন বলতে সাধারণভাবে আমরা যেকোনো বিষয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে উপস্থাপিত প্রতিবেদনকে বুঝে থাকি। এ ধরনের প্রতিবেদনে কে, কী, কোথায়, কখন, কেন ও কীভাবে—এসব প্রশ্নের উত্তর থাকে বটে, তবে তা কখনও দিনের ঘটনার অতিরিক্ত কিছু নয়। এসব ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা গভীরভাবে অনুসন্ধানের সুযোগ থাকে না। তবে যতটুকু তথ্য তুলে ধরা হয় তা যেন সত্য ও সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয় সেটাই হচ্ছে শুদ্ধভাবে সাদামাটা প্রতিবেদন বা সংবাদ তৈরির চ্যালেঞ্জ।

কৃষি বিষয়ে সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরির প্রয়োজনীয়তা ও অবকাশ প্রচুর। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই সুযোগ আরও অবারিত। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান অর্থনীতির দেশ। তাই প্রতিদিন না হলেও সপ্তাহের একাধিক দিনে কৃষিবিষয়ক নানা সভা ও সেমিনার যেমন অনুষ্ঠিত হয় তেমনি থাকে নানা সংবাদ সম্মেলন এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষিখাতের নানা খবরাখবর। এসব বিষয়েই সাদামাটা কৃষি প্রতিবেদন তৈরি সম্ভব।

অন্য দশটা বিষয়ে সাদামাটা সংবাদ পরিবেশনে যেমন কতগুলো সংবাদমূল্যের দিক বিবেচনা করা হয়, তেমনি কৃষি সংবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কৃষির যে দিকটা নিয়ে আজ যে সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে, খেয়াল রাখতে হবে আজকের প্রেক্ষাপটে তা কতটা প্রাসঙ্গিক, কতটা সময়োপযোগী, তা মানুষের (দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের) আগ্রহের জায়গা কতটা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, তা কতটা তথ্যবহুল এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে সমসাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

বিষয়ের গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদন আকর্ষণীয় নাও হতে পারে যদি তা সঠিকভাবে লেখা বা উপস্থাপন না করা হয়। সঠিকভাবে ও আকর্ষণীয় করে কৃষি সংবাদ পরিবেশনের অন্যতম শর্ত হচ্ছে, বিষয়ের উপর প্রতিবেদকের নিজের সম্যক ধারণা লাভ। এ ক্ষেত্রে তিনি যা করবেন—

- বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, সংশ্লিষ্ট বইপত্র পাঠ।
- প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ।
- সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে ভালোভাবে বিষয় সম্পর্কে জেনে নেওয়া।
- রেফারেন্স ব্যবহার করা।

যদি প্রতিবেদক কৃষি বিষয়ে কোনো সংবাদ সম্মেলনে যোগ দিয়ে সে বিষয়ে একটি সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরি করতে চান তবে তাকে—

- মনোযোগ দিয়ে সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্যগুলো শুনতে হবে।
- সম্মেলনের পূর্বেই বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
- সংবাদ সম্মেলনে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করে আয়োজকদের কাছ থেকে জবাব জেনে নিতে হবে। সৌজন্য বজায় রেখে ভদ্রতার সঙ্গে প্রশ্ন করতে হবে।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংবাদ সম্মেলনের পরেও কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে তা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য জেনে কিংবা কৃষিবিষয়ক সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মীদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্তের সত্যাসত্য নিরূপণ খুবই জরুরি। কেননা—

- সরকারি খাত থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রায়শই আপডেট করা থাকে না, তাই অনেক সময় সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করা হলে পুরনো তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের ঝুঁকি থেকে যায়। অসঙ্গগতি থাকতে পারে কিংবা সরকারি তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে সেগুলোর বৈসাদৃশ্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎসের নাম উল্লেখ করে দুটি উৎসের তথ্য-উপাত্তই ব্যবহার করা যেতে পারে।

- মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য কখনও কখনও খুব মিসলিডিং বা বিভ্রান্তিমূলক হতে পারে। কারণ কৃষি উৎপাদনের বিষয়টি সবসময়ই একটি ভূ-আঞ্চলিক তারতম্যের বিষয় অর্থাৎ এক এলাকার ক্ষেত্রে যে ফসলহানির খবর সত্য, পার্শ্ববর্তী এলাকার ক্ষেত্রে তা সত্য না-ও হতে পারে। তাই কৃষিতথ্য ব্যবহারে গড় করার বা সাধারণীকরণ করার প্রবণতা বিপজ্জনক। তাই মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করতে হবে যথেষ্ট হুঁশিয়ারি ও সাবধানতার সঙ্গে।

কৃষি বিষয়ে সাদামাটা প্রতিবেদন তৈরিতে প্রতিবেদকের নিজের প্রস্তুতি, তথ্য সংগ্রহের সাধনা, সাবধানতা ইত্যাদি যেমন জরুরি তেমনি জরুরি সঠিক কাঠামোতে ফেলে প্রতিবেদনটি পরিবেশন করা। যথাযথ কাঠামোতে প্রতিবেদনটি তৈরি হচ্ছে কি না তা বোঝার জন্য

www.pathagar.com

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া দরকার—

- সংগৃহীত সব তথ্য-উপাত্ত ও বিভিন্ন পক্ষ যেমন বিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকের বক্তব্য যথাযথভাবে সংগৃহীত হয়েছে কি না তা যাচাই করা।
- গুরুত্ব ও বর্ণনার ক্রম অনুযায়ী কোনো তথ্য, বক্তব্য কোন্‌টি প্রথমে ও কোন্‌টি পরে সাজাতে হবে তা মূল্যায়ন করা।
- নিজেকে পাঠক, শ্রোতা, দর্শকের ভূমিকায় কল্পনা করে চিন্তা করা এই প্রতিবেদন থেকে পাঠক/শ্রোতা/দর্শক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কী কী জানতে চাইবে, কোন্‌টা আগে জানতে চাইবে সে বিষয়ে সচেতন থাকা।
- সাধারণভাবে সংবাদপত্রে সাদামাটা সংবাদ প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে অনুসৃত উল্টো পিরামিড কাঠামো মেনে চলা।

উল্টো পিরামিড কাঠামো

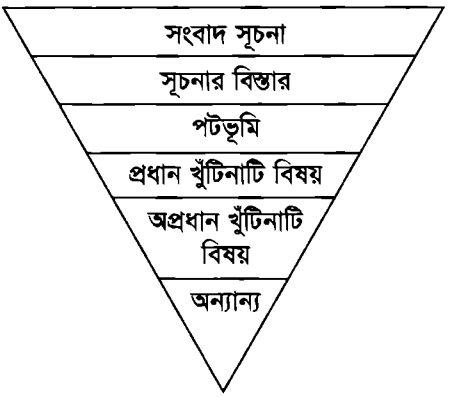

গভীর প্রতিবেদন বা ডেপ্‌থ্‌ রিপোর্ট

গভীর প্রতিবেদন বা ডেপ্‌থ্‌ রিপোর্টিং বলতে আমরা বুঝি কোনো বিষয়ে সাদামাটা বিবরণের অতিরিক্ত কিছু, যেখানে বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার উপর আরও বেশি আলোকপাত করা হয়, পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের সুবিধার্থে কিছুটা বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকে।

এক কথায় বললে, ডেপ্‌থ্‌ রিপোটিং হলো ঘটনার পেছনের ঘটনাকে, তথ্যের পেছনের তথ্যকে, উপরিতলের নিচে লুকানো মর্মার্থকে খুঁজে বের করবার প্রতিবেদন (রিয়াজ, ১৯৯৪)।

গভীর প্রতিবেদন সাধারণত দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। এই দুই ধরনের প্রতিদেনকেই সংজ্ঞায়িত করা দুরূহ। সাধারণভাবে, অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত তথ্য নিয়ে যে প্রতিবেদন তা-ই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। আর

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক প্রদিবেদন হলো সেই ধরনের প্রতিবেদন যা তথ্য বা ঘটনাকে পাঠকের জন্য বোধগম্য করে ব্যাংখ্যা করে এবং তার তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলে।

আর জুডিথ ব্লক ও কে মিলার (১৯৭৮)-এর মতে, Investigative Reporting হচ্ছে, 'Avenger of the wronged, illuminator of the corrupt. Exposer of the past, analyst of the present, harbinger of the future. Conscience of those governing, consciousness of the governed.'

অপরাপর নানা বিষয়ের মতো কৃষি বিষয়েও গভীর প্রতিবেদন তৈরির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কৃষি বিষয়ে আগ্রহী পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের ঔৎসুক্য নিবারণে সাদামাটা প্রতিবেদনের বাইরেও কৃষি সাংবাদিকরা গভীর প্রতিবেদন তৈরির প্রয়াস চালাতে পারেন। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে—

১. প্রাত্যহিক সাদামাটা কৃষি-প্রতিবেদনের সঙ্গে মূল্য সংযোজন করে এমনকিছু বিষয় বিশ্লেষণের অবতারণা করা।

২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভালোভাবে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া ও বিষয়ের উপর গবেষণা করা।

৩. বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাহুল্যের অবতারণা না করা বা একই কথার পুনরাবৃত্তি না করা।

৪. গভীর প্রতিবেদন যেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিসন্দর্ভে পরিণত না হয় সেদিকে নজর রাখা। মনে রাখতে হবে, গভীর প্রতিবেদনও এক ধরনের রিপোর্টিং এবং কোনোভাবেই তা প্রবন্ধ, নিবন্ধ বা গবেষণাপত্র নয়। অর্থাৎ রিপোর্টিংয়ের চরিত্র বজায় থাকতে হবে।

কৃষি বিষয়ে গভীর প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে ভালোভাবে তথ্য সংগ্রহ, যাচাইবাছাই ও বিচারবিশ্লেষণ খুবই জরুরি। যে বিষয়ের গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে সে বিষয়ে প্রতিবেদকের নিজের ধারণা ও আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রথমে স্বচ্ছ করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, একজন দ্বিধান্বিত প্রতিবেদক কখনও কৃষিবিষয়ে কোনো গভীর প্রতিবেদন উপহার দিতে পারবেন না, যা তার পাঠক/শ্রোতা/দর্শকরা সহজে বুঝে নিতে সক্ষম হবে। আর নিজের সেই প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজন মাঠ থেকে সঠিক তথ্য জেনে আসা, কৃষি কর্মকর্তা, কৃষিবিদ, নীতি-নির্ধারকের পাশাপাশি কৃষিজীবী অর্থাৎ মাঠের কৃষকের সঙ্গে কথা বলা, তাদের ধারণা, বক্তব্য ও মতামতের সঠিক প্রতিফলন ঘটানো।

কৃষি বিষয়ে গভীর প্রতিবেদন রচনায় কাঠামোগত ক্ষেত্রে নমনীয়তার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ সাদামাটা প্রতিবেদনে যেমন নির্দিষ্ট উল্টো পিরামিড ছক মেনে চলতে হয়, এ ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটতে পারে। তবে তা অবশ্যই হতে হবে সংবাদ উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের স্বার্থে এবং সেই কাঠামোর ভাঙাগড়া হতে হবে যুক্তিগ্রাহ্য। কাঠামোকে কিছুটা পরিবর্তন করা হলেও সর্বক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে যে–

১. তথ্যের গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী পরিবেশিত হচ্ছে কি না।

২. যৌক্তিক ক্রম মেনে চলা হচ্ছে কি না।

৩. উপযুক্ত ক্ষেত্রে পটভূমি, তথ্য-উপাত্ত সঠিক স্থানে উপস্থাপন করা হচ্ছে কি না।

www.pathagar.com

৪. পুনরাবৃত্তি ও অতিদীর্ঘ রচনা থেকে নিবৃত্ত থাকতে হবে।

৫. সাদামাটা প্রতিবেদনের তুলনায় পৃথক কিছু এবং অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন হয় এমনকিছু থাকতে হবে যাতে প্রতিবেদন থেকে পাঠকের আগ্রহের নিবৃত্তি ঘটে।

ফিচার বা মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

কৃষি বিষয়ে সাদামাটা ও গভীর প্রতিবেদনের বাইরেও উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করে নানারকম চমকপ্রদ ফিচার বা মানবিক আবেদনময় প্রতিবেদন রচনা করা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। যথা—

১. উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন।

২. সঠিকভাবে নিরূপণ করা যে কোনো ইস্যু নিয়ে একটি ফিচার তৈরি সম্ভব। আবার কোনো ইস্যু একটি মানবিক আবেদনময় প্রতিবেদনের দাবি রাখে।

৩. এসব লেখনীতে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা জরুরি।

৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে উপযুক্ত আলোকচিত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। একটি চমকপ্রদ আলোকচিত্র একটি কৃষিবিষয়ক ফিচারকে সার্থক করে তুলতে পারে।

৫. লেখনী কাঠামোতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আনা যেতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রে গল্প বলার ঢংয়ে শুরু করাটাও মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

৬. পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের আগ্রহের জায়গাটা কোথায় তা মাথায় রাখতে হবে।

৭. মনে রাখতে হবে, ফিচার বা মানবিক আবেদনধর্মী রচনাতে কেবলই গল্প আর বর্ণনার মুন্সিয়ানা থাকলে চলবে না, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তও থাকতে হবে।

যেহেতু এ ধরনের লেখনীর জন্য বিষয় নির্বাচন খুবই জরুরি তাই আমরা এখানে কিছু কিছু বিষয়ের অবতারণা করতে পারি, যা উদাহরণ হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে। যেমন–

১. কৃষিক্ষেত্রে নতুন কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার।

২. বাংলাদেশি কৃষিবিজ্ঞানী/কৃষকের অভূতপূর্ব কোনো সাফল্যগাথা।

৩. মাঠ পর্যায়ে কোনো অভিনব কৃষিবিপ্লবের কথা।

৪. একই জমিতে একাধিক ফসল এবং পাশাপাশি মাছ, হাঁস ইত্যাদি পালনে সাফল্য।

৫. কৃষিঋণের সাফল্য কিংবা কোনো ক্ষেত্রে বিপর্যয়।

৬. কৃষিতে বায়োটেকনোলজির ব্যবহার : সম্ভাবনা ও শঙ্কা।

৭. দেশীয় কৃষিপ্রযুক্তি ও জাত সংরক্ষণের কোনো অনন্য উদাহরণ।

৮. কৃষি গবেষণাখাতের সাফল্য বা দৈন্য।

৯. কৃষি বিনিয়োগে সরকারি-বেসরকারি খাতের অবদান।

১০. নতুন প্রজন্মের কৃষি-শিল্প উদ্যোক্তাদের সাফল্য ইত্যাদি।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে ফিচার বা মানবিক আবেদনধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রেও নানা বিবেচনা মাথায় রাখা চাই। যেমন—একটি দৈনিকে প্রথম বা শেষের পাতার জন্য তৈরি করা হলে সে লেখার কাঠামো কলেবর সম্পর্কে এক ধরনের সচেতনতা থাকা দরকার। আবার পৃথক ফিচার পাতা বা বিশেষ সাময়িকীর জন্য লেখা হলে আরেক ধরনের বিবেচনাবোধ কাজ করবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে হয়তো অধিক ছবি ও দীর্ঘ লেখা উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে ফিচার বা মানবিক আবেদনধর্মী লেখনীর ক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার প্রতিবেদন যেন অতি দীর্ঘ না হয়। আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের যুগে এবং কর্মব্যস্ত জীবনধারায় মানুষ দীর্ঘ রচনায় আগ্রহী হয় কম। যদি পাঠককে লেখার আকার দিয়ে ভড়কে দেওয়া হয়, তবে প্রতিবেদন যতই ক্ষুরধার বা বুদ্ধিদীপ্ত হোক তা সম্ভাব্য পাঠক হারাবে।

তথ্যসূত্র

রীয়াজ, আ. (১৯৯৪). *অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক*. ঢাকা: বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিউকেশন।

Bloch, J. and Miller, K. (1995). *Investigative and Indepth Reporting*. New York: Hasting House.

www.pathagar.com

১২. কৃষি বিষয়ে সম্প্রচার প্রতিবেদন

আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া, মীর মাসরুর জামান, মীর সাহিদুল আলম, রিয়াজ আহমদ ও মো. রেজাউল হক

টেলিভিশন ও রেডিওতে সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হয় প্রায় প্রতি ঘণ্টায় বা দিনে অন্তত কয়েকবার। প্রতিবেলায় রেডিও-টিভি বুলেটিনে সাদামাটা প্রতিবেদনের দরকার হয়। এ ধরনের প্রতিবেদন করতে প্রতিবেদক সময় পান কম, তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন লেখা এবং সম্পাদনা করতে হয় দ্রুত। কেননা, প্রতিদিন ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার সাধারণ বর্ণনা থাকে এসব প্রতিবেদনে। আর প্রতিদিনের সংবাদ বুলেটিনে এ ধরনের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট অনেক বেশি থাকে। যেমন—কৃষি উৎপাদন নিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলন, কৃষিবিষয়ক কোনো সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম থেকে প্রতিবেদন ইত্যাদি। এসব প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট সংবাদ সম্মেলন বা সেমিনারে বক্তারা যা বলেন তা-ই মূলত তুলে ধরা হয়। টেলিভিশনে সেই কর্মসূচি বা ঘটনার ছবিও দেখানো হয়। অনুষ্ঠানটিকে বোঝাতে এর পরিচিতি বা ব্যানারসহ মাস্টার শট এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তাদের ক্লোজ ও দুই বা কয়েকজনের মিড শট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। রেডিওতেও প্রচার করা হয় ওই অনুষ্ঠানেরই ধারণ করা শব্দ। আবার হয়তো কোথাও পানির অভাবে কৃষিতে সেচকাজে বিঘ্ন ঘটছে কিংবা পোকার আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, এসব ঘটনার তাৎক্ষণিক বা উপরিতলের তথ্যভিত্তিক বিবরণ নিয়েও সাদামাটা প্রতিবেদন হয়। এ ধরনের প্রতিবেদনে ছয়টি প্রাথমিক প্রশ্ন—কী, কে, কখন, কোথায়, কেন এবং কীভাবে—এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েই এ ধরনের প্রতিবেদনের সূচনা লিখতে হয়। তথ্য সাজাতে হয় যৌক্তিক বিবেচনাকে মাথায় রেখে। তবে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর গভীর প্রতিবেদন করা যেতে পারে। ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ এবং প্রচুর তথ্য জোগাড় করে, ঘটনার ভেতরের ঘটনা তদন্ত করে একটু সময় নিয়ে এ ধরনের প্রতিবেদন করতে হয়।

এ ধরনের প্রতিবেদনে অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও বলে। সব প্রতিবেদনেই কিছু না কিছু অনুসন্ধান থাকলেও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

www.pathagar.com

দাবি করে রিপোর্টারের বিষয়কেন্দ্রিক যত্নপূর্ণ ও কৌশলী অনুসন্ধান (Weinberg, 1995)। এ ধরনের রিপোর্টের জন্য তাই দরকার সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ, পর্যাপ্ত সময়, রিপোর্টারের সত্য অনুসন্ধানের দৃঢ় অঙ্গীকার এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরণ অর্থাৎ ক্যামেরা, রেকর্ডার, গাড়ি ইত্যাদির জোগান। একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে দীর্ঘসময় লেগে থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। সংখ্যায় কম হলেও বাংলাদেশে টেলিভিশন এবং রেডিওতে কৃষি নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ইদানীং দেখা ও শোনা যাচ্ছে।

ধরা যাক, দেশে নতুন জাতের কিছু বীজ আমদানি করা হয়েছে, বাংলাদেশের মাটি ও পানির জন্য সেই বীজ উপযুক্ত কি না, এর পরীক্ষাগারের গবেষণাটা কৃষিবিজ্ঞানীরা করবেন, আর কৃষকরা এর প্রভাবটা বুঝবেন হাতে কলমে কাজ করে। সরকারি কর্মকর্তারা হয়তো জোর করে এই বীজটি কৃষকের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন, বাধ্য করছেন তাদের ওই বিশেষ বীজটি ব্যবহার করতে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদক খুঁজে বের করতে পারেন এর পেছনের কারণ। হয়তো বীজ কোম্পানিটি সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছে, কিংবা মোটা অংকের কমিশন পেয়েছেন নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের কর্মকর্তারা। যেমন, বাংলাদেশে হাইব্রিড জাতের টমেটোবীজ লাগিয়ে অনেক কৃষক ফসল পাননি, কেন এমন হলো? এটি কি বীজের কারণে, বীজ-সংরক্ষণে অনিয়মের কারণে, প্যাকেজিংয়ের সমস্যা, ত্রুটিপূর্ণ বীজ আমদানির কারণে অথবা এর পেছনে আর কী কারণ থাকতে পারে? এটি খুঁজে বের করবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

এ ধরনের প্রতিবেদন করতে গেলে টেলিভিশনের জন্য ছবি এবং রেডিওর জন্য শব্দ ধারণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা, সাদামাটা রিপোর্টিংয়ের মতো এর সবকিছু প্রকাশ্য নয়। বরং অনেক কিছুই গোপন বা লুকনো থাকে। কাজেই সেসব ছবি বা শব্দ পাওয়া অনেক সময় প্রায় অসম্ভব। এ ধরনের রিপোর্টের বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অনেক সময়ই ক্যামেরা কিংবা রেকর্ডারের সামনে আসতে চান না। যার বা যাদের নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকে, তারা যেমন, যারা অভিযোগ করেন, তারাও তেমনি নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা কিংবা সংকোচের কারণে ক্যামেরা বা রেকর্ডারের সামনে দাঁড়ান না।

এ অবস্থায় ভালো একটি প্রতিবেদন দাঁড় করাতে এবং প্রামাণ্যভাবে তা উপস্থাপন করতে প্রতিবেদককে নানা কৌশল নিতে হয়। সাংবাদিকতার নীতিমালা ঠিক রেখে সে সব কৌশলের মধ্যে রয়েছে—বিকল্প সূত্রের সন্ধান করা, বক্তব্য রেকর্ডে সমস্যা থাকলে টেলিভিশনের জন্য সংগ্রহ করা ডকুমেন্টের গ্রাফিক্স ব্যবহার, নিরাপত্তার আশঙ্কায় থাকা সূত্রের ছবি অস্পষ্টভাবে উপস্থাপন ইত্যাদি। রেডিওতে এ চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য রিপোর্টারের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করার কৌশল নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রতিবেদনটির আকর্ষণ কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সেই ঝুঁকি কমাতে সংশিষ্ট ন্যাচারাল সাউন্ড যতটা সম্ভব ব্যবহার করতে হবে।

সংবাদপত্রের মতো টিভি বা রেডিও প্রতিবেদককেও ভালো রিপোর্ট করতে হলে রিপোর্টের বিষয়বস্তু নিয়ে খানিকটা গবেষণা করে নিতে হয়। এই গবেষণা দীর্ঘ বা জটিল কোনো বিষয় নয়। বরং মনোযোগ দিয়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করা, অনুমাননির্ভর তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা, ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক চিহ্নিত করে, সেই ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ করাই গবেষণা।

www.pathagar.com

অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে ছবি ও শব্দ ব্যবহারের গুরুত্ব অনেক। কেননা, এসব মাধ্যমে প্রতিবেদন হয় ছবি ও শব্দনির্ভর। রেডিওতে কথা ও শব্দ দিয়ে আর টিভিতে গল্প বলতে হয় ছবি বা শট দিয়ে। রেডিওতে ধান কাটা নিয়ে প্রতিবেদন করতে গিয়ে যদি প্রাসঙ্গিকভাবে কাঁচির ঘ্যাশঘ্যাশ শব্দ কিংবা সেচ নিয়ে প্রতিবেদন করতে গিয়ে গভীর নলকূপ থেকে পানি বেরিয়ে আসার কলকল শব্দ রেকর্ড করে শ্রোতাদের শোনানো যায় তাহলে সেটি প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা যেমন বাড়াবে, তেমনি এর উপস্থাপনাও হবে সুন্দর ও বাস্তবসম্মত।

আর টেলিভিশনে ছবিই অর্ধেক কথা বলে দেয়। রিপোর্টের শুরুর ছবি বা শটটি হতে হবে আকর্ষণীয়, অনেকসময় শুরুর দৃশ্যটিই দর্শককে উদ্বুদ্ধ করে পুরো প্রতিবেদনটি দেখার জন্য। ছবি ব্যবহারে ধারাবাহিকতা থাকতে হবে, যাতে ছবি দিয়েই প্রতিবেদনটি বোঝা যায়। 'ডেড শট' অর্থাৎ স্টিল ফটোগ্রাফি ধরনের শট ব্যবহার না করা ভালো, যে ছবিতে 'অ্যাকশন' আছে, গতি আছে সে ধরনের ছবি ব্যবহার করুন। যেহেতু টেলিভিশন একটি চলমান মাধ্যম, কাজেই স্টিল ফটোগ্রাফি এড়িয়ে চলা ভালো। একান্ত ফুটেজ না পাওয়া গেলে স্টিল ফটোগ্রাফির কথা ভাবা যেতে পারে।

সহজ করে বলা বা লেখা কঠিন হলেও একজন সংবাদকর্মীকে এই কাজটিই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে করতে হয়। সে কারণে ভাষার উপর দখল থাকা জরুরি। সকল শ্রেণির পাঠক-শ্রোতার কথা মাথায় রেখেই সাধারণত গণমাধ্যমের অনুষ্ঠান বা খবর তৈরি করা হয়। তবে কৃষিবিষয়ক কোনো অনুষ্ঠান বা সংবাদের অভীষ্ট শ্রোতা-দর্শক যেহেতু কৃষকসমাজ, কাজেই তাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষাদীক্ষার কথা বিবেচনা করে ভাষার ব্যবহার করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে প্রমিত বাংলার পরিবর্তে এক্ষেত্রে কৃষকের মুখের ভাষা ব্যবহার করা দূষণীয় হবে না। বিশেষ করে কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা কৃষকের সঙ্গে কথা বলার সময় গ্রামীণ ভাষা, সম্ভব হলে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা ভালো। এতে কৃষক সহজ হতে পারে এবং মনের কথা খুলে বলতে পারে।

সংবাদমাধ্যমে কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করা হয়, যার কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই। যেমন–বাম্পার ফলন। এটি একটি চটকদার শব্দ। বাম্পার ফলন বলতে আসলে কী বোঝায়? এর পরিমাপই-বা কী? সাধারণ পাঠক-শ্রোতার কাছে এর কোনো বোধগম্যতা তৈরি হয় না। বাম্পার ফলন বলতে আসলে বোঝানো হয় কোনো একটি ফসলের সর্বোচ্চ ফলন। এর একটি পরিমাপও আছে। যেমন–বোরো, আমন ও আউশধানের গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে সাড়ে তিন মেট্রিক টন করে হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে উৎপাদন যদি চার বা পাঁচ মেট্রিক টন হয় তবে বলা যায় ব্যাপক বা সর্বোচ্চ ফলন হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এরকম ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের উচিত হবে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে বিষয়টি বলা। যে কোনো ফসলের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট কৃষি কর্মকর্তা বা কৃষকের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য বা পরিসংখ্যান জেনে সেভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এর ফলে পরবর্তী সংবাদ বা ফলো-আপ প্রতিবেদন তৈরি করার সময় সহজেই হিসাব করে বলা সম্ভব হবে প্রকৃত ফলন কী পরিমাণ হয়েছে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের জন্য ছবি/ফুটেজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। প্রতিবেদনের বিবরণ এবং ছবির মধ্যে মিল না থাকলে দর্শক-শ্রোতার

www.pathagar.com

মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে এবং প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। যেমন—প্রতিবেদনে বলা হলো ইউরিয়া সারের সংকট দেখা দিয়েছে, অথচ ছবি দেখানো হলো টিএসপি সার বা অন্য কোনো সারের। তখন দর্শক-শ্রোতা কী বুঝবে?

অল্প শব্দে বা নির্দিষ্ট পরিসরে প্রতিবেদন লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কম কথায় কত বেশি তথ্য দেওয়া যায় সেদিকে একজন প্রতিবেদকের বিশেষ নজর রাখতে হয়। একজন কৃষক বা কৃষিসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্যসংগ্রহ করতে গেলে তিনি হয়তো অনেক কথা বলবেন। তবে তার মধ্য থেকে কোন্‌টি সংবাদযোগ্য বিষয়, সেটি খুঁজে বের করতে হবে। দেখতে হবে তাদের বক্তব্যে নতুন কিছু আছে কি না, পাঠকরা যা জানতে আগ্রহী তেমন কিছু আছে কি না, সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে এমন কিছু আছে কি না। তবে প্রতিবেদনের বিষয়, গুরুত্ব এবং তথ্যের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করে প্রতিবেদনের দৈর্ঘ্য। প্রতিবেদন অযথাই টেনে লম্বা করা যাবে না।

কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদনে অনেক ধরনের পরিভাষা (Jargon) ব্যবহার করতে হতে পারে যা অনেক পাঠক-শ্রোতার কাছে পরিচিত নয়। যেমন—নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবন, নতুন প্রযুক্তি, সার-কীটনাশক ব্যবহারপদ্ধতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়েই কিছু না কিছু পরিভাষা রয়েছে, যা কেবল কৃষিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই ভালো বোঝেন বা জানেন। কাজেই কোনো পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদককে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো প্রযুক্তি ও পরিভাষাকে সহজ ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করতে হবে, যাতে তা সকল শ্রেণির পাঠক-শ্রোতা বুঝতে পারেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরল এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। যেমন–'এলসিসি ব্যবহার করে ইউরিয়া সার প্রয়োগে উপকৃত হয়েছে বকুলতলার কৃষকরা।' এক্ষেত্রে এলসিসি (লিফ কালার চার্ট) কী তা অনেক পাঠক-শ্রোতার জানা নাও থাকতে পারে। এলসিসি যে পাতার রং মেপে সাশ্রয়ীভাবে সার ব্যবহার করার পদ্ধতি তা বলতে হবে।

সম্প্রচার মাধ্যমের স্ক্রিপ্ট

ভালো রেডিও এবং টিভি স্ক্রিপ্ট লেখার ক্ষেত্রে অনেক বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। এগুলি হলো–

- মনে রাখতে হবে এটি কানে শোনার জন্য লেখা হচ্ছে। প্রতিবেদকের বলা কথাটি একজন দর্শকের কানে কেমন লাগছে তা ভাবতে হবে। পত্রিকার লেখা একজন পাঠক তার ইচ্ছামতো বারবার দেখতে ও পড়তে পারেন। কিন্তু রেডিও এবং টেলিভিশনে যে সময়কার সংবাদ সেসময় একবারই শোনা যায়, তাই শোনার সময় একটি শব্দ যদি না বোঝা যায় তাহলে রিপোর্টের পুরো অর্থই পাল্টে যেতে পারে। তাই এমনভাবে লিখতে হবে যাতে দর্শক সহজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে। মুদ্রণ সাংবাদিকতায় পাঠোপযোগিতা (Readability) আর ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতায় শ্রবণোপযোগিতার (Listenability) কথা বিবেচনা করতে হয়।
- বাক্য গঠন হতে হবে নির্ভুল ও যথার্থ, পরিষ্কার ও স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য। বিবিসিসহ মানসম্পন্ন টেলিভিশনের চর্চা অনুযায়ী একটি প্যাকেজ প্রতিবেদনের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ দেড় থেকে দুই মিনিটের মধ্যে হয়।

www.pathagar.com

- ভালো স্ক্রিপ্ট হবে সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত কিন্তু তাতে থাকবে প্রয়োজনীয় তথ্য। রেডিও ও টিভির সংবাদ বুলেটিনে সময় কম থাকে। সেদিকটা বিবেচনা করে এবং প্রাপ্ত ফুটেজের উপর ভিত্তি করে স্ক্রিপ্ট লেখা হয়।
- সবচে ভালো হয়, যেভাবে কথা বলেন সেভাবে লিখতে পারলে। আনুষ্ঠানিক বা আলংকারিক ভাষা প্রয়োগ এড়িয়ে চলতে পারলে ভালো। তাই বলে আবার কথ্য ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা যাবে না। জাতীয় গণমাধ্যমের জন্য প্রমিত বাংলা ব্যবহার করতে হয়। তবে কমিউনিটি মিডিয়ার জন্য প্রয়োজনে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ কমিউনিটি মিডিয়া, যেমন কমিউনিটি রেডিওর প্রচার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
- স্ক্রিপ্টে একই শব্দ বারবার ব্যবহার না করাই ভালো। এতে একঘেয়েমি দূর হয় এবং ভাষায় বৈচিত্র্য আসে ও শুনতে ভালো লাগে।

  রেডিও-টিভিতে সংবাদ বিবরণী প্রচারের সময় সর্বনামের সুচিন্তিত প্রয়োগ করতে হয়। এখানে 'তিনি' 'তাঁরা' বা 'সে' প্রভৃতি সর্বনামের যথেচ্ছ ব্যবহার চলে না। কারণ এমন হতে পারে কোনো সংবাদ বিবরণীর মাঝপথে কোনো শ্রোতা খবর শুনতে বসতে পারেন। অতএব সেই শ্রোতার জন্য ব্যক্তির নামটি প্রয়োজন।
- লম্বা শব্দ ও লম্বা বাক্য এড়িয়ে চলা বাঞ্ছনীয়। জিহ্বায় জড়িয়ে যায়, উচ্চারণে সমস্যা হয় এমন সব শব্দ ব্যবহার করা উচিত না। লম্বা বাক্য ব্যবহার না করে বাক্য ভেঙে ব্যবহার করলে এবং উচ্চারণ করা কঠিন এমন শব্দ পরিহার করলে সংবাদ পাঠকের জন্য পড়তে সুবিধা হয়, কথা জড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। দর্শক-শ্রোতাও সহজে বুঝতে পারে। যেমন–'দুরুচ্চার্য শব্দ' ব্যবহার না করে 'সহজে উচ্চারণ কার যায় এমন শব্দ' এভাবে লিখলে সহজে পড়া যায় এবং পাঠকের বুঝতে সুবিধা হয়। একটি বাক্যে ১৭ শব্দের বেশি থাকা উচিত নয়। বেশি শব্দের বাক্য সংবাদ পাঠকের চোখের উপর চাপ ফেলে এবং শ্রোতাও শুনতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতে পারে। চেষ্টা করা উচিত ১৩-১৪ শব্দের মধ্যে একটি বাক্য শেষ করার। যদি রিপোর্টে পরিসংখ্যান ব্যবহার করতে হয় তাহলে গ্রাফিক্স আকারে পরিবেশন করা উচিত। গ্রাফিক্সে স্নিগ্ধ ও সুন্দর রং এবং সহজ গ্রাফ ব্যবহার করা যেতে পারে। আজকাল পরিসংখ্যান বর্ণনা করতে অ্যানিমেটেড গ্রাফিক্সও করা হয়।
- স্ক্রিপ্টে ব্যক্তির বা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় বাক্য লম্বা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- সাধারণত সম্প্রচার কপিতে ব্যক্তির পদবি নামের আগে দেওয়া হয় শোনার সুবিধার জন্য। কখনও কখনও নাম ও পদবি আলাদা আলাদাভাবেও ব্যবহার করা যায়।
- ব্যক্তির নাম লেখার ক্ষেত্রে লম্বা নাম পরিহার করে যে নামে তিনি পরিচিত সেটা ব্যবহার করা উচিত। এতে স্ক্রিপ্টে শব্দ সংখ্যা কমে আসবে ও শুনতে সুবিধা হবে।
- নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বিদেশি নাম ও শব্দ পরিহার করা উচিত কারণ বিদেশি নাম ও শব্দ উচ্চারণ করা কঠিন। আর একান্ত যদি ব্যবহার করতেই হয় তবে সংশ্লিষ্ট কারও কাছ থেকে উচ্চারণ জেনে নিতে হবে।

www.pathagar.com

- প্রয়োজন ব্যতীত স্ক্রিপ্টে বয়স, ধর্ম, গোত্র ও বৈবাহিক অবস্থা উল্লেখ করা উচিত নয়; কারণ এগুলো ব্যক্তিগত তথ্য। একান্ততা (Privacy) সংরক্ষণের বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত।
- সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে ০-৯ পর্যন্ত বানান করে আর ১০ ও ১০-এর বেশি হলে বানান করে এবং অনেক বড় সংখ্যা হলে সংখ্যা-বানান এই ফরম্যাটে লেখা যেতে পারে। যেমন– '১০ লক্ষ'; অন্যথায় পড়তে সমস্যা হতে পারে বা লেখার সময় কোনো ডিজিট বাদ পড়ার আশঙ্কা থাকে।
- স্ক্রিপ্টে গুণবাচক শব্দ কম ব্যবহার করা উচিত। এ ধরনের শব্দের বেশি ব্যবহার প্রতিবেদনটিকে পক্ষপাতমূলক শোনাতে পারে।
- স্ক্রিপ্টে সবসময় বর্তমান কালের বাক্য রচনা করা হয় যাতে সংবাদের তাৎক্ষণিকতা বজায় থাকে।
- সময়বাচক প্রকাশ যেমন–'আজ' স্ক্রিপ্টে লেখা জরুরি নয় কারণ সম্প্রচার সংবাদের ক্ষেত্রে এটি অনুসিত যে আজকের সংবাদ বুলেটিনে গত দিনের বা পুরোনো সংবাদ ব্যবহৃত হয় না। পুরোনো ঘটনার নতুন দিক নিয়ে সংবাদ হয়।
- লোকেশান (Location) বা অবস্থান বুঝানোর ক্ষেত্রে অবস্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়ার দরকার হয় না। শব্দ সংখ্যা কমানোর জন্য যেটুকু বললে দর্শক-শ্রোতা স্থানটি চিনতে পারে সেটুকুই বলা উচিত।
- সম্প্রচার সংবাদে কোটেশন বা সরাসরি উক্তি পরিহার করে বক্তব্য প্রতিবেদকের নিজের ভাষায় পরিবেশিত হয়। যদি নিতান্তই সরাসরি উক্তি ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে প্রথমে উক্তিটি দিয়ে তারপর উল্লেখ করতে হয় যে এটি বক্তার হুবহু বক্তব্য।
- লেখা শেষে ভয়েস রেকর্ড করার আগে উচ্চস্বরে প্রতিবেদনটি পড়ে নিলে ভালো। রিপোর্ট শুনতে কেমন লাগছে তা দেখা উচিত। যদি প্রতিবেদকের কাছে শুনতে ভালো না লাগে তাহলে শ্রোতা-দর্শকেরও ভালো লাগবে না। প্রয়োজনে স্ক্রিপ্টে পরিবর্তন আনা উচিত।
- ভালো স্ক্রিপ্ট লিখতে হলে প্র্যাকটিস বা অনুশীলনের বিকল্প নেই। বারবার অনুশীলন করে নিজের ভুলগুলো যেমন ধরা যায়, তেমনি সহজ করে দ্রুত লেখা অভ্যাস করা যায়।

যেকোনো সংবাদ লেখার আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন—

- কেন আমি এই প্রতিবেদনটি করছি?
- কেন দর্শক এই প্রতিবেদনটি দেখবে অথবা শুনবে?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজের মনে নাড়াচাড়া করলে স্ক্রিপ্টটি আকর্ষণীয় করার উপায়গুলো পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

স্ক্রিপ্ট লেখার কাঠামো

টেলিভিশন ও রেডিওর সংবাদ লেখার জন্য সাধারণত চার ধরনের কাঠামো ব্যবহৃত হয়। যেমন—

১. উল্টো পিরামিড (Inverted Pyramid) কাঠামো
২. আওয়ার গ্লাস (Hourglass) কাঠামো
৩. হীরক (Diamond) কাঠামো
৪. ক্রিসমাস ট্রি (X-mas tree) কাঠামো

উল্টো পিরামিড কাঠামো

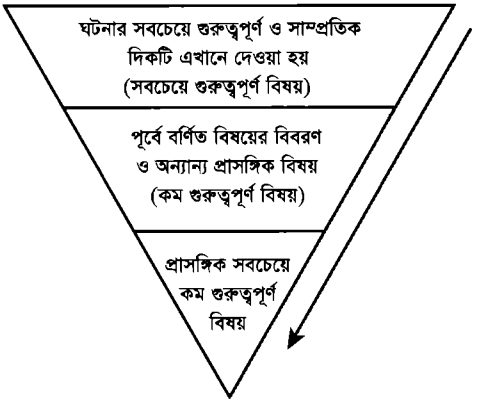

নমুনা প্রতিবেদন

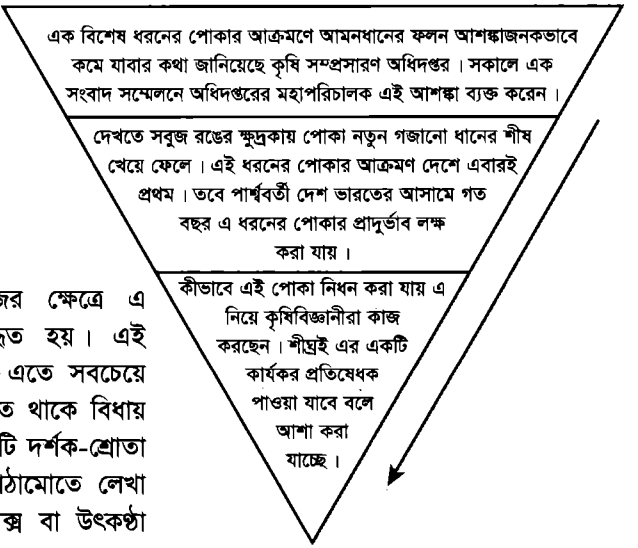

সাধারণত হার্ড নিউজের ক্ষেত্রে এ ধরনের কাঠামো ব্যবহৃত হয়। এই কাঠামোর সুবিধা হলো এতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শুরুতে থাকে বিধায় খুব সহজেই মূল সংবাদটি দর্শক-শ্রোতা জানতে পারে। এই কাঠামোতে লেখা সংবাদে কোনো ক্লাইমেক্স বা উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করার উত্তেজনা থাকে না। মূল ঘটনা প্রথমে জানা হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আওয়ার গ্লাস কাঠামো

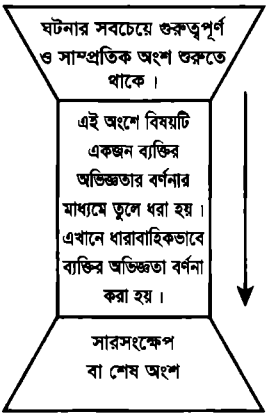

এটি উল্টো পিরামিড কাঠামোর একটি রূপান্তরিত সংস্করণ। সম্প্রচার সাংবাদিকতায় হার্ড নিউজ লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি কাঠামো। এর শুরু ও শেষ অংশ সংবাদ উপস্থাপক বলেন আর মাঝখানের বর্ণনাটি প্রতিবেদক দেন। এই কাঠামোতে ঘটনাটি জানা হয়ে যাওয়ার পরও পরের অংশ দেখা/শোনার আগ্রহও দর্শক-শ্রোতার থাকে।

নমুনা প্রতিবেদন

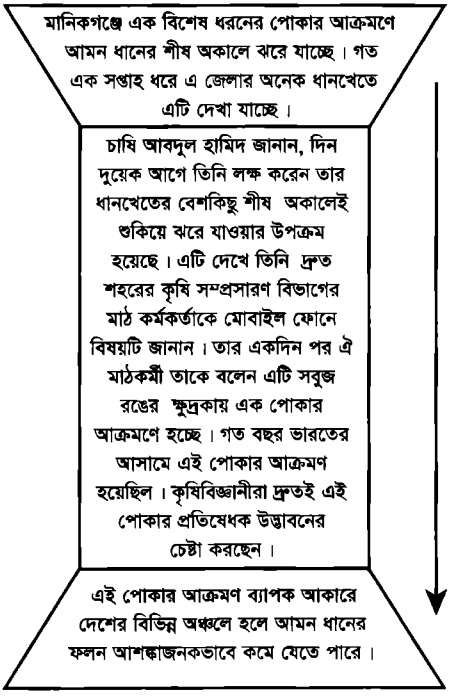

www.pathagar.com

হীরক কাঠামো

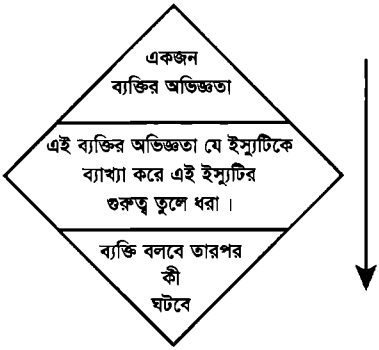

নমুনা প্রতিবেদন

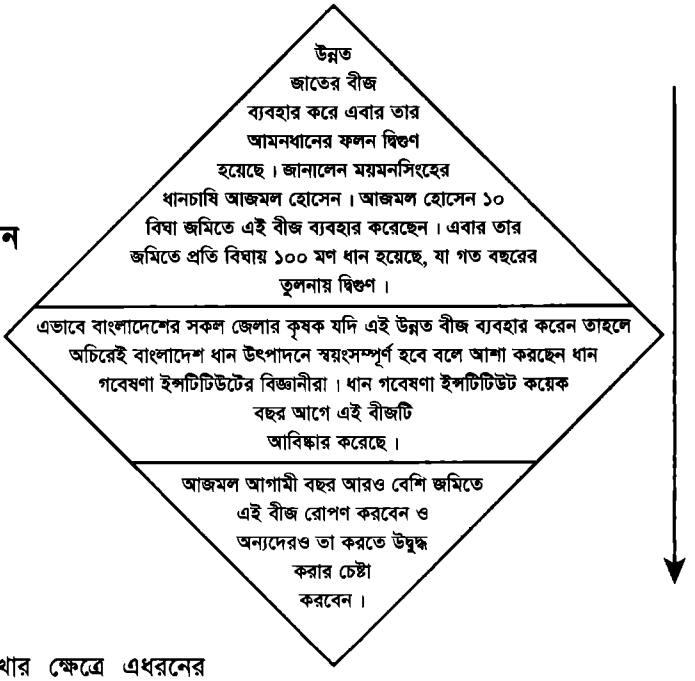

সফ্‌ট নিউজ লেখার ক্ষেত্রে এধরনের কাঠামো ব্যবহৃত হয়। যেমন–আমরা যদি কোনো সফল কৃষকের উপর কোনো ফিচার করতে চাই তা লেখার ক্ষেত্রে এই কাঠামো ব্যবহার করতে পারি। এধরনের রিপোর্ট মানুষের আবেগকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

ক্রিসমাস ট্রি কাঠামো

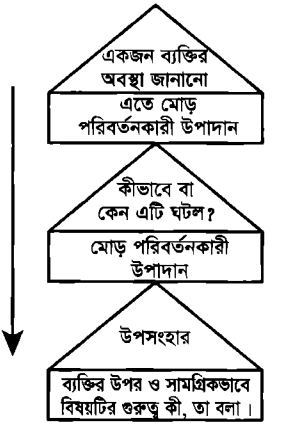

নমুনা প্রতিবেদন

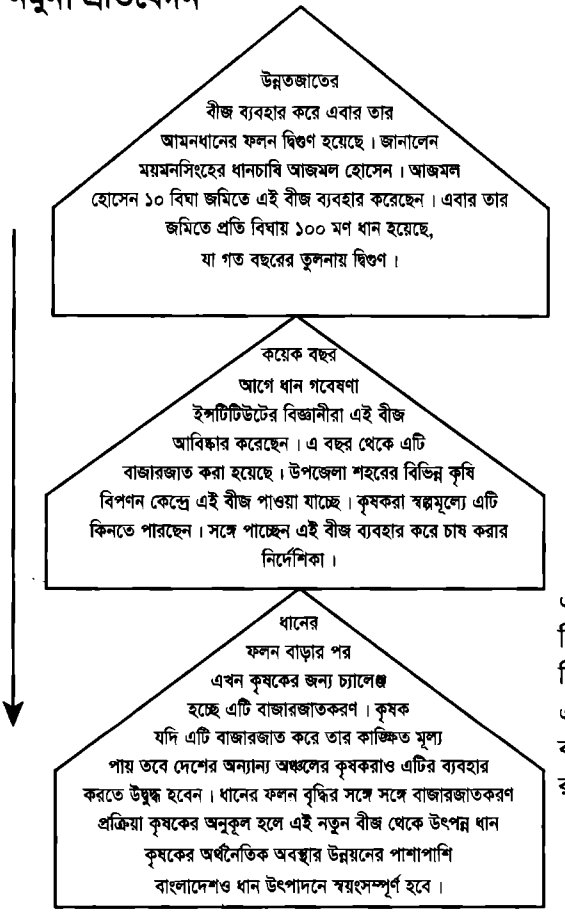

এটি হীরক কাঠামোরই একটি বিস্তারিত রূপ। সাধারণত লম্বা ফিচার প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে এই কাঠামো ব্যবহৃত হয়। এই কাঠামো মানুষের আকর্ষণ ধরে রাখতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

কৃষিবিষয়ক প্রতিবেদন সম্পাদনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

সম্পাদনা ছাড়া কোনো রিপোর্টই ছাপা/প্রচারিত হয় না। প্রতিদিন ডেস্কে অসংখ্য কপি আসে, যার সবই ছাপা বা প্রচারিত হয় না বা ছাপা/প্রচারযোগ্য হয় না। কোনোটার সবটুকু বাদ দিতে হয়, আবার কোনোটার অংশবিশেষ কাটছাঁট করে বা পুনর্লিখনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করা হয়। সম্পাদনা ডেস্ক থেকে এই সম্পাদনার কাজগুলো করা হয়। সহ-সম্পাদক/নিউজ রুম এডিটরগণ মূলত এই কাজের দায়িত্ব পালন করেন অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও মেধা দিয়ে। এভাবে তারা কপি সম্পাদনা করে প্রকাশযোগ্য করে তোলেন। অর্থাৎ প্রতিবেদকের কাজ যেখানে শেষ, সম্পাদনার কাজ সেখানে শুরু।

কপি সম্পাদনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- তথ্যগুলো সঠিক আছে কি না, প্রয়োজনীয় সকল তথ্য আছে কি না এবং সব তথ্য প্রয়োজন কি না তা পরীক্ষা করা।
- পাঠক-শ্রোতার উপর প্রভাবের কথা চিন্তা করে কৃষিপণ্যের বাজারমূল্য উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে কি না তা বিশেষভাবে দেখা। স্থান-কাল-পাত্রভেদে পণ্যমূল্যের যে তারতম্য থাকে, সে ব্যাপারে সজাগ থেকে বিষয়গুলোকে অতিমাত্রায় সরলীকরণ করা হয়েছে কি না তা বিশ্লেষণ করে দেখা।
- কৃষকের ভুল, উপকরণ বিতরণ, বিপণন, কৃষিপণ্যের বাণিজ্য ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি এসব বিষয়ের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সযত্ন ও সংবেদনশীল হয়ে সম্পাদনা করা।
- কোনো তথ্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে সেই অংশটুকু বাদ দেওয়া, তথ্যগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি আছে কি না লক্ষ করা। কৃষক, কৃষিবিষয়ক কর্মকর্তা, কৃষিবিশেষজ্ঞ বা অন্য আরও কোনো সূত্র থাকলে তাদের দেওয়া তথ্যের মধ্যে কোনো গরমিল আছে কি না তা যাচাই করা।
- নাম-ঠিকানা থাকলে তা যাচাই করা, সংখ্যা পরীক্ষা করা ও তারিখ-সময় ইত্যাদি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া। তারিখ, মাস, দিন উল্লেখ করার সময় ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকা দেখা। পরিসংখ্যানের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক থাকা।
- কোনো পরিভাষা ব্যবহার করা হলে প্রয়োজনে তার সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া, যাতে সকল শ্রেণির পাঠক বিষয়টি বোঝেন।
- কৃষিবিষয়ক প্রচলিত এবং সর্বশেষ আইনকানুন ও নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখা।
- সূচনা কতটুকু সঠিক ও বলিষ্ঠ তা খেয়াল করা, অনাবশ্যক তথ্য আছে কি না, সূচনায় অতিরিক্ত কথা বলা হলো কি না বা যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা বলা হলো কি না, সূচনাকে আরও সহজ ও সংক্ষেপিত করা যায় কি না সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ রাখা।
- বড় বাক্য এবং বড় প্যারা ভেঙে ছোট করা, প্যারা পুনর্বিন্যাসের দরকার হলে তা করা।
- কপিতে নামের তালিকা দীর্ঘ হলে ভেঙে ভেঙে লেখা যাতে সুনির্দিষ্টভাবে নামগুলো পড়া ও বের করা যায়। সম্প্রচার কপিতে সাধারণত নামের তালিকা দেওয়া হয় না।

www.pathagar.com

- সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিবরণী দীর্ঘ হলে মাঝে সাব-হেডিং ব্যবহার করলে ভালো হয়। সাব-হেডিং পুরো বাক্য হবে না। সাব-হেডিংয়ে পরবর্তী প্যারার মূল বিষয়ের আবাস থাকবে।
- অতিরিক্ত শব্দ, বিশেষণ, বাগ্‌ধারা ইত্যাদি বাদ দিয়ে বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত ও জোরালো করা। গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বাক্যের শুরুতে আনা।
- সহজ সরল শব্দের মাধ্যমে বাক্য সহজভাবে লেখা।
- একঘেয়েমি দূর করতে বাক্যে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি না করা।
- বিবরণীতে কোনোভাবেই যেন রিপোর্টারের মন্তব্য না আসে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা।
- বানান শুদ্ধ, ব্যাকরণ ও বাক্যরীতি শুদ্ধ করা ছাড়াও অনাবশ্যক প্যারা বা প্যারার অনাবশ্যক অংশ ছেঁটে বাদ দেওয়া।

টেলিভিশন চ্যানেলে ছবি ও প্রতিবেদন সম্পাদনা করার জন্য ভিডিও এডিটর আছেন। তারা ছবি কাটা ও জোড়া লাগানোর কারিগরি ব্যাপারগুলো জানেন। প্রতিবেদক তার সাহায্য নিতে পারেন। ইন্টারভিউয়ের কোন্ অংশটা কোথায় বসাতে হবে, কোন্ শট দিয়ে প্রতিবেদক প্রতিবেদন শুরু করতে চান, কোথায় এমবিয়েন্ট সাউন্ড (স্বাভাবিক শব্দ) রাখতে চান–এসব ঠিক করতে হবে প্রতিবেদককেই। সে কারণে স্ক্রিপ্ট লেখার সময়ই কোথায় কোন ছবি ব্যবহার করবেন তা ভেবে রাখা ভালো।

কিছু নমুনা সংবাদ বিশ্লেষণ

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ অক্টোবর, ২০১৪ইং

ফুলবাড়িয়ায় আনারস পাকাতে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার

ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা : ফুলবাড়িয়া উপজেলায় ৩ ইউনিয়নে আশ্বিনা আনারস পাকাতে ব্যবহার করা হচ্ছে রাসায়নিক দ্রব্য। ঈদের পর হঠাৎ করেই আনারসের বাজার চাঙ্গা হয়ে যাওয়ায় আনারস খেত থেকে অপরিপক্ব আনারস তুলে দ্রুত পাকানোর জন্য দেহের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ইথোফান প্রকাশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব আনারস খেয়ে মানুষ পেটের অসুখসহ জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

উপজেলার রাঙামাটিয়া ইউনিয়নের বাদশা মার্কেটে সারি সারি আনারস স্তূপ করে রাখা হয়েছে। আনারসের দোকানের কর্মচারী হোসেন জানান, আমরা কর্মচারী, টাকা দেয় কাজ করি। আনারসের পাইকার সুরুজ মিয়া জানান, এ আনারস আমাদের এলাকায় বিক্রি হচ্ছে না। প্রতিদিন ৭-৮টি ট্রাকে করে আনারস সরাসরি চলে যাচ্ছে ঢাকা, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হারুন আল মাকসুদ জানান, রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে পাকানো আনারস খেয়ে মানুষ পেটের পীড়াসহ কঠিন ও জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আহসানুল বাসার জানান, আনারসে রাসায়নিক

www.pathagar.com

উপাদান প্রয়োগ করা হলে তাদের কিছুই করার নেই। বিষয়টি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দেখার কথা।

বিশ্লেষণ

এই প্রতিবেদনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছে, যার সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের দিকটি সরাসরি জড়িত।

এই প্রতিবেদনের সমস্যা হচ্ছে সূত্রের অনুপস্থিতি। ইথোফান ব্যবহারের তথ্যটি কোন্ সূত্র থেকে পাওয়া গেল তার উল্লেখ নেই। বিশুদ্ধ খাদ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে নজরদারি দরকার তা-ই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রতিবেদনটি পাঠের মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে আনারসকে দ্রুত পাকানো ও বাজারজাত করার প্রক্রিয়ায় রসায়নের কৃত্রিম ব্যবহার যে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর তা একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তার জবানিতে ফুটে উঠেছে। সাংবাদিক যথার্থ কাজই করেছেন।

তবে এখানে চিকিৎসকের বক্তব্য না দিয়ে একজন রসায়নবিদের বক্তব্য দেওয়া হলে আরও ভালো হতো। প্রতিবেদনে কোন্ জায়গায় মানুষ পেটের পীড়াসহ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে তার উল্লেখ নেই।

এই প্রতিবেদনটি পূর্ণাঙ্গ হতো, যদি কৃষি কর্মকর্তাকে তার দায়-দায়িত্ব (কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মাঝে জনসচেতনতা সৃষ্টি) সম্পর্কে আরও প্রশ্নের মুখোমুখি করা যেত। আনারসের দোকানের কর্মচারীর বক্তব্যই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন ছিল এই ব্যবসার মূল মালিক ও পাইকারদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা।

প্রথম আলো, ০৬ মার্চ, ২০১৫

দুগ্ধ খামারিদের সহায়তায় শত কোটি টাকার তহবিল হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক : দেশে দুগ্ধ উৎপাদন ও গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্র স্থাপনে স্বল্পসুদে ঋণ দিতে ১০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় গতকাল বৃহস্পতিবার এ তহবিল গঠনের নীতিগত অনুমোদন হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সভায় গভর্নর আতিউর রহমান সভাপতিত্ব করেন।

জানা যায়, সরকারের প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে দুগ্ধখামারি ও গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজননকেন্দ্রের খামারিদের সহজ শর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ জোগানে একটি তহবিল গঠনের অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদে গতকাল এ প্রস্তাবটি উঠলে তাতে সম্মতি মেলে।

পর্ষদ বৈঠকে অনুমোদন হওয়া নীতিমানা অনুসারে ব্যাংকগুলো ৫ শতাংশ সুদে এ তহবিল থেকে অর্থ নিয়ে গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ সুদে তা বিতরণ করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ এ তহবিলের সার্বিক কার্যক্রম

www.pathagar.com

পরিচালনা করবে। শিগগিরই এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোর কাছে পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গতকালের বৈঠকে পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ ১৬টি বিষয় আলোচ্যসূচিতে ছিল। বৈঠকে শীর্ষ পাঁচজন ঋণখেলাপির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। তবে সময় কম থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়নি বলে সূত্র জানায়।

বিশ্লেষণ

এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো কৃষি সংবাদ। তবে এখানেও সূত্র উল্লেখের সমস্যা রয়েছে। রিপোর্টার নিজে সভায় উপস্থিত ছিলেন নাকি সভায় উপস্থিত কোনো কর্মকর্তা তাকে এই তথ্য দিয়েছেন, নাকি বাংলাদেশ ব্যাংকের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রতিবেদনটি করেছেন, তা পরিষ্কার নয়। আর প্রতিবেদনের শেষ প্যারাটি অপ্রয়োজনীয়। ফেলে দেওয়া যেতে পারত।

আরেকটি বিষয় বলা ভালো, এই প্রতিবেদনটি আরও বেশি তথ্যবহুল ও হৃদয়গ্রাহী হতে পারত, যদি বাংলাদেশের বর্তমান দুগ্ধ উৎপাদন খামারের সংখ্যা, খামারির সংখ্যা ও ঋণ প্রচলন হলে পরে সম্ভাব্য কত মানুষ উপকারভোগী হতে পারে তার চিত্র দেওয়া গেলে।

যুগান্তর, ১৮ অক্টোবর, ২০১৪

ভুট্টা চাষিদের টিকে থাকতে সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ

যুগান্তর রিপোর্ট : ভুট্টাচাষিদের টিকে থাকতে সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ দিলেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। খাবার তালিকায় ভুট্টা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাষিদের আরও ফলন বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার এশিয়ান সোসাইটি অব অ্যাগ্রিকালচারাল ইকোনোমিস্ট (এএসএই) আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শেষ দিনে বক্তারা এ পরামর্শ দেন। সাভার ব্র্যাক সিডিএম-এ দিনব্যাপী এ সম্মেলন শুরু হয় বুধবার। ভুট্টা চাষিদের টিকে থাকা এই মূল ভাবনা নিয়ে সম্মেলনে ফিলিপাইন, জাপান, চিন, কোরিয়া ও ভারতসহ বিশ্বের ৩০টি দেশের ৩২১ জন কৃষিবিদ, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের শেষ দিনে আগামী ২ বছরের জন্য এএসএই প্রেসিডেন্ট হিসেবে ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালকের উপদেষ্টা ড. মাহবুব হোসেন নির্বাচিত হয়েছে।

ড. মাহবুব হোসেন বলেন, দেশকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে কৃষকরা। তিনি আরও বলেন, একবিংশ শতাব্দীর কৃষি খাতের সংকট মোকাবেলায় ও খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে একটি কৃষিবান্ধব পাবলিক পলিসি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

বিশ্লেষণ

এটি একটি সেমিনার প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের দুর্বলতা অনেক। এখানে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। সক্ষমতা একটি জেনারেল টার্ম, যার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। তাই এই প্রতিবেদনে এটি স্পষ্ট করা দরকার ছিল আসলে কোন ক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্জন করা দরকার।

www.pathagar.com

এই প্রতিবেদনে প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কোন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিত এটি স্পষ্ট করা হয়নি।

প্রতিবেদনের শেষ অনুচ্ছেদটি সূচনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেখা উচিত ছিল। এই সময়ে বাংলাদেশে ভুট্টা চাষির সংখ্যা কত এই তথ্যগুলো সন্নিবেশিত হলে প্রতিবেদনটি আরও পাঠ-উপযোগী হতে পারত।

কালের কণ্ঠ, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

উদ্বেগজনক হারে কমছে কৃষিজমি

নিজস্ব প্রতিবেদক : স্বাধীনতার পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার পাশাপাশি কৃষিজমি কমছে উদ্বেগজনক হারে। গবেষকরা এ পরিস্থিতিতে পরিকল্পিত ভূমি ব্যবস্থাপনার উপরে গুরুত্বারোপ করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে গতকাল শনিবার বাংলাদেশ ভূগোল পরিষদ আয়োজিত এক সেমিনারে গবেষকরা এসব কথা বলেন। পরিষদের সভাপতি ড. মো. আবদুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নগর গবেষণা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. নাসরিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. শহীদ আখতার হোসেন, ডিন ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রমুখ বক্তব্য দেন।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক নজরুল ইসলাম আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। অন্যদিকে এ সময়ে কৃষিজমি কমেছে ৬ শতাংশ। পরিকল্পনা মাফিক না এগোলে কৃষিজমি ক্রমেই আরও কমে যাবে।

তিনি বলেন, একদিকে বসবাসের জন্য জায়গার চাহিদা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে এভাবে জমির জোগান কমে আসার ফলে সৃষ্টি হবে কঠিন সমস্যার।

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বলেন, বাংলাদেশ বিপুল সম্ভাবনার একটি দেশ। এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন।

বিশ্লেষণ

এটি একটি সেমিনারের আলোচনা থেকে প্রস্তুত করা প্রতিবেদন। এখানে বাংলাদেশের কৃষির একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এটা সহজেই অনুমেয় যে বাংলাদেশের মতো একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে অধিক জনসংখ্যার চাপ যেকোনো অর্থেই খুব চ্যালেঞ্জিং। তবু অল্প কৃষিজমি ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক মানুষের খাদ্যের সংস্থান করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সফল দেশ।

সেমিনারের বক্তাদের বক্তব্যে চ্যালেঞ্জের কথাটি উঠে এলেও এই প্রতিবেদনে কিছু perspectives missing অর্থাৎ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে মোট কৃষিজমির পরিমাণ এবং বিগত দশকগুলো থেকে এই পরিমাণ কমে আসার রেকর্ডস সংক্ষেপে তুলে ধরা হলে প্রতিবেদনটির পাঠকেরা বেশি উপকৃত হতেন।

www.pathagar.com

The Daily Star, February 01, 2015

Water Shortage drives journs to wheat cultivation

Sohel Parvez : Wheat acreage has increased in the current plantation season as farmers shift away from paddz due to shortage of water for irrigation during the dry season.

This winter, farmers planted wheat on 4.81 lakh hectares of land, according to an estimate from Department of Agricultural Extension. The figure is 12 percent higher than in the previous year.

Wheat requires a less amount of water than paddz and the production costs are lower as well, Paritosh Kumar Malaker, director in-charge of Dinajpur-based Wheat Research Centre.

The declining underground water table in the north and northwest regions means there is not enough water for paddz irrigation. As a result, many farmers are gradually moving to wheat cultivation, he added.

Wheat acreage, which fell to its lowest level of 3.58 lakh hectares in fiscal 2011-12, started to rise a year later. The area under the cereal rose to 4.29 lakh hectares in fiscal 2013-14 from 4.16 lakh hectares the previous year.

The other reasons for the farmers' renewed interest in the cereal are: its relatively stable prices in recent years, the higher yield of seeds released by state-run agriculture research institutes and government purchase.

The food office bought 1.49 lakh tonnes of wheat from the domestic market after last year's harvest.

The crop extension office has targeted 13.3 lakh tonnes of wheat output from harvests by the end of March and early April.

"Crop prospects look good due to prolonged winter and rainfall in some areas. We hope wheat output may exceed last year's level if there is no natural disaster," said AZM Momtajul Karim, director general of DAE.

Wheat production touched an 11-year high of 13.02 lakh tonnes in fiscal 2013-14, according to Bangladesh Bureau of Statistics.

The country needs 40 lakh tonnes of wheat on average, two-thirds of which are imported every year. Between July 1 last year and January 8 this year, wheat imports rose 36 percent year-on to 15.62 lakh tonnes, according to the food ministry.

Early this month, USDA Foreign Agriculture Service in its GAIN report said Bangladesh's wheat imports would be 33 lakh tonnes in fiscal 2014-15 due to competitive international prices and strong domestic demand.

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ

এটি একটি ভালো কৃষি প্রতিবেদনের উদাহরণ। কী কারণে উত্তরের কৃষকেরা শুষ্ক মৌসুমে (During boro season) ধান থেকে কিছুটা শিফ্‌ট করে গম চাষের দিকে আগ্রহী হয়েছেন বা ঝুঁকেছেন তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বোরো ধান উৎপাদনে প্রচুর সেচ-জল প্রয়োজন হয়, সে তুলনায় গমে পানির প্রয়োজনীয়তা কম। দেশের উত্তরাঞ্চলে গত কয়েক দশকে অনেক ভূগর্ভস্থ পাম্পের মাধ্যমে জল সেচ করে ধানচাষ করায় ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ পড়েছে।

পাশাপাশি, ধান উৎপাদন করে বাজারে ন্যায্যমূল্য পাওয়ার বিষয়ে যে অনিশ্চয়তা তা গমের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম। সেই বিষয়টিরও অবতারণা করা হয়েছে। গ্রাফচিত্রের ব্যবহার ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত সোর্সের ব্যবহার প্রতিবেদনটিকে আরও পাঠযোগ্য করে তুলেছে। তবে এতে কিছু ভাষাগত ভুল রয়েছে।

চ্যানেল আই

অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত যশোরের বেগুনখেত

রাজীব আহমেদ (প্রতিনিধি/এসএম/পিএস)

অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়েছে যশোরের বিভিন্ন এলাকার বেশিরভাগ বেগুনখেত। চাষিরা এ রোগকে তুলসি মদ্দা বা মাইক রোগ বললেও কৃষি বিভাগ রোগটি সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না। যশোর প্রতিনিধি আকরামুজ্জামানের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট।

রিপোর্টার্স টেক্সট/ ভয়েস ওভার

চলতি বছর যশোর জেলায় ১৪ হাজার ১৫০ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে। এর মধ্যে বেগুন আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৬৭০ হেক্টরে। তবে বেগুনগাছ অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ফুল এলেও ফল না ধরায় চিন্তিত চাষিরা।

স/বা

বেগুন চাষি, যশোর

চাষিরা এ রোগকে তুলসি মদ্দা ও মাইক রোগ বলে মনে করেছেন। তবে কৃষি বিভাগ বেগুনক্ষেতের রোগ এখনও নির্ণয় করতে না পারায় বিপাকে পড়েছেন চাষি।

স/বা

বেগুন চাষি, যশোর

কৃষি কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বেগুন চাষে যত্রতত্র হরমোন ব্যবহার করায় চাষিরা এ সমস্যায় পড়েছেন।

সা/বা

এমদাদ হোসেন

অতিরিক্ত উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর

বেগুন খেতের রোগ নির্ণয়ে কাজ করছে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র।

রাজীব আহমেদ, চ্যানেল আই

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ

এটি কৃষি বিষয়ে মৌসুমি প্রতিবেদনের একটি নমুনা। আমরা টিভির পর্দায়, পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন মৌসুমে এ ধরনের কিছু প্রতিবেদন দেখতে পাই।

তবে, এক্ষেত্রে যারা কৃষি বিষয়ে সাংবাদিকতা করেন/করবেন তাদের খুব সচেতন থাকতে হবে যে আমরা চট করে যেন এই উপসংহারে না পৌঁছাই যে কোনো একটি রোগ 'অজ্ঞাত'।

ফসলের মাঠে ভরা মৌসুমে যখন উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে, মাটির জৈব পরিস্থিতির কোনো ঘাটতির কারণে, কোনো পোকা বা অসুখের কারণে বা ফাংগাল আক্রমণের কারণে শস্যহানির আশঙ্কা দেখা দেয় দিশেহারা কৃষকরা তখন অনেকভাবেই তাদের সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা সমস্যার ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ/বিশেষজ্ঞ/বিজ্ঞানী/সম্প্রসারণকর্মীর সঙ্গে বিষয়টি সঠিকভাবে আলোচনা করেছি কি না।

এই রিপোর্টটিতে রোগের ধরন সম্পর্কে আরও একটু বলা যেত। এতে তিনটি সিংক (ইন্টারভিউ) ব্যবহার করা হয়েছে–বেগুন চাষি, কৃষি কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত উপপরিচালক। কিন্তু অতিরিক্ত উপপরিচালক ছাড়া আর কারও নাম নেই। নাম থাকা উচিত ছিল। স্ক্রিপ্টে ইমেজ সম্পর্কেও কোনো তথ্য নেই।

টিভি সংবাদবিষয়ক বিভিন্ন টার্ম

বুলেটিন

একটি টেলিভিশন বুলেটিন তৈরি হয় বিভিন্ন বিষয়ের ছোট বড় অনেকগুলো সংবাদ মিলিয়ে। বিষয়ের ধরন ও ট্রিটমেন্টের কারণে বিভিন্ন সংবাদ আইটেম প্রচারিত হয় বিভিন্ন চেহারায়। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে এটি প্রচারিত হয়। বিবিসিসহ মানসম্পন্ন টেলিভিশনে—

- শীর্ষ বুলেটিনের ব্যাপ্তি হয় ৫ থেকে ১০ মিনিট। এতে কোনো বিজ্ঞাপন বিরতি থাকে না।
- প্রতিঘণ্টার বুলেটিনের ব্যাপ্তি হয় ২৫ মিনিট। এতে সাধারণত একটি বিজ্ঞাপন বিরতি থাকে।
- প্রাইম টাইমে প্রধান সংবাদ বুলেটিনের ব্যাপ্তি হয় ৪৫ মিনিট। এতে সাধারণত তিনটি বিজ্ঞাপন বিরতি থাকে।

টেলিভিশন বুলেটিনের ব্যাপ্তি অনুযায়ী কয়টি প্রতিবেদন বা প্যাকেজ, কয়টি OoV/উভ এবং কয়টি OoV+Sync (উভ+সিংক) যাবে তা নির্ধারণ করতে হয়। এ ছাড়া একটি বুলেটিনের কাঠামোতে যে বিষয়গুলো থাকে, সেগুলো হচ্ছে—

ওপেনিং স্টিং : বুলেটিনের শুরুতে বুলেটিনের পরিচিতিমূলক শব্দ/মিউজিক এবং গ্রাফিক্স।

হেডলাইন : বুলেটিনের শুরুতে সংবাদ পাঠক সকল সংবাদের শিরোনাম পড়ে শোনান।

www.pathagar.com

ক্লোজিং স্টিং : বুলেটিনের শেষে বুলেটিনের পরিচিতিমূলক শব্দ/মিউজিক এবং গ্রাফিক্স

ক্লোজিং হেডলাইন : বুলেটিনের শেষে সংবাদ পাঠক সকল সংবাদের শিরোনাম আরেকবার পড়ে শোনান।

বিরতি : বুলেটিনের মাঝখানের বিরতি।

বিরতি হেডলাইন : বুলেটিনের মাঝখানে বিরতি শুরু হওয়ার আগে সংবাদ পাঠক বিরতির পরের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলোর শিরোনাম পড়ে শোনান।

IV/ আইভি (ইন ভিশন) : সংবাদ পাঠক সংবাদটি পাঠ করেন এবং পর্দায় তাকেই দেখা যায়।

OoV/ উভ (আউট অব ভিশন) : পাঠক সংবাদটি পাঠ করেন, তার কণ্ঠ শোনা যায়, তবে পর্দায় তার ছবি দেখা যায় না। পর্দায় থাকে ওই সংবাদ-ঘটনার ছবি। বিবিসিসহ মানসম্পন্ন টেলিভিশনের চর্চা অনুযায়ী এর ব্যাপ্তি সাধারণত ২৫ থেকে ৩০ সেকেন্ড হয়।

OoV+Sync/উভ+সিঙ্ক/ সারফেইস (আউট অব ভিশন এবং সাক্ষাৎকার/আবহ শব্দ/ছবি) বা OoV+SoT/উভ+সট (আউট অব ভিশন+সাউন্ড অন টেপ) পাঠক সংবাদটি পাঠ করেন, তার কণ্ঠ শোনা যায় এবং পর্দায় ওই সংবাদ-ঘটনার ছবি থাকে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় সংবাদ-ঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজনের সাক্ষাৎকারের অংশ (উভ+সিংক)/(উভ+সট) অথবা আবহ শব্দ/ছবি (উভ+সারফেইস)।

প্যাকেজ

টেলিভিশন সাংবাদিকতায় প্যাকেজ হলো একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট। প্যাকেজের শুরুতে সংবাদ পাঠক শুধু সূচনাটি পাঠ করেন। পরবর্তী অংশে প্রতিবেদক নিজেই পুরো রিপোর্টটি উপস্থাপন করেন।

একটি প্যাকেজে নানা অংশ থাকে যেমন—

লিংক : সংবাদ পাঠক/উপস্থাপক সংবাদের সূচনা পড়েন। তখন তাকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়।

ভয়েস ওভার : সূচনার পর প্রতিবেদক ঘটনার বর্ণনা তুলে ধরেন।

সিংক : এক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার। সিংকে কোনো বিষয়ে প্রতিবেদকের বর্ণনার সঙ্গে সরাসরি সেই বিষয়ে যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ কারও সাক্ষাৎকার এককভাবে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্য দিয়ে সেই বিষয়ে যেমন আনুষঙ্গিক তথ্য, মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া উঠে আসে, তেমনি এটি প্রতিবেদকের বর্ণনাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। সিংকের ব্যাপ্তি সাধারণত ২০ সেকেন্ডের মধ্যে হয়।

www.pathagar.com

ভক্সপপ : কোনো একটি বিষয়ে একাধিক জনের সাক্ষাৎকার একের পর এক দেওয়া হয়। ভক্সপপে সাধারণত ভুক্তভোগী বা সুফলভোগী সাধারণ মানুষের কণ্ঠ তুলে ধরা হয়। এখানেও দাবি, তথ্য, মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া উঠে আসে। ভক্সপপে সাধারণত অ্যাস্টন ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। কারণ পর্দায় এদের উপস্থিতি কমসময় ধরে থাকে বলে সাধারণত অ্যাস্টন ব্যবহার করা যায় না।

পিটিসি (PTC, পিস টু দ্য ক্যামেরা) : প্রতিবেদনের শেষে ক্যামেরার সামনে প্রতিবেদকের তথ্য/ বিশ্লেষণ উপস্থাপন এবং নিজের পরিচয় বলা। তখন স্ক্রিনে শুধু প্রতিবেদককেই দেখা যায়।

মিড-পিটিসি : প্রতিবেদনের মাঝামাঝি ক্যামেরার সামনে প্রতিবেদকের তথ্য/বিশ্লেষণ উপস্থাপন। প্যাকেজে পিটিসি মাঝামাঝি বা প্রায়শই শেষে দেওয়া হয়।

একটি প্যাকেজ প্রতিবেদনের স্ক্রিপ্ট লেখা হয় এভাবে :

রিপোর্ট : নতুন ধানের বীজের উপর প্যাকেজ
স্থায়িত্ব : রিপোর্ট ১ মিনিট ছয় সেকেন্ড

সময়কাল	ভিডিও	অডিও
০০-০০.১২	ইন ভিশান : পর্দায় সংবাদ উপস্থাপক	সংবাদ উপস্থাপক : নতুন বীজ ব্যবহারের ফলে ময়মনসিংহ অঞ্চলে আমন ধানের ফলন দ্বিগুণ হয়েছে।
০০.১৩-০০.২৩	কৃষক আজমল হোসেনের ইন্টারভিউ	আজমল হোসেন : ১০ বিঘা জমিতে আমি এই বীজ ব্যবহার করেছি। এতে প্রতি বিঘায় ১০০ মণ ধান হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ।
০০.২৪-০০.৪৪	আমন খেতের চিত্র, শীষের চিত্র, বীজের চিত্র	ভয়েস ওভার (প্রতিবেদক) : ময়মনসিংহের মুক্তগাছার অনেক এলাকায় এই উন্নত প্রজাতির ধানের চাষ করা হয়েছে। ২০১৪ সালে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ধানের বিশেষ ধরনের এই প্রজাতিটি আবিষ্কার করেন। গত বছর থেকে এটি বাজারজাত শুরু হয়।
০০:৪৫-০০:৫৫	কৃষিবিজ্ঞানী ড. আবুল কাশেমের ইন্টারভিউ	আবুল কাশেম : আমি ও আমার টিম অনেকদিন গবেষণায় মধ্য দিয়ে এই প্রজাতিটি আবিষ্কার করেছি। এটি এক ধরনের জেনেটিক্যালি মোডাফাইড ভ্যারাইটি। পোকামাকড় এর ক্ষতি করতে পারে না।
০০.৫৬-০০.৬৬	পিটিসি : পর্দায় প্রতিবেদক	প্রতিবেদক : এভাবে বাংলাদেশের সকল জেলার কৃষকরা যদি এই উন্নত বীজ ব্যবহার করেন তাহলে অচিরেই বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং কৃষকেরও আয় বৃদ্ধি পাবে।

www.pathagar.com

সারফেইস : ঘটনাস্থলের প্রাকৃতিক শব্দ/ছবি

লাইভ : গুরুত্বপূর্ণ/সাড়া জাগানো ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদক সরাসরি ভিডিওর মাধ্যমে সংবাদ উপস্থাপন করেন। সংবাদ পাঠক সূচনাটি করে দেন বা প্রতিবেদককে ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন।

ফোনো/ফোন-ইন: গুরুত্বপূর্ণ/সাড়া জাগানো ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদক সরাসরি ফোনের মাধ্যমে সংবাদ উপস্থাপন করেন। সংবাদ পাঠক সূচনাটি করে দেন বা প্রতিবেদককে ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। পর্দায় ওই প্রতিবেদকের কোনো একটি ছবি এবং পরিচিতি এবং সংবাদ-ঘটনাটির কিছু ছবি দেখানো হয়।

রেডিও টিভির লাইভ অনুষ্ঠানে যখন দর্শকরা বাইরে থেকে টেলিফোনে প্রশ্ন করেন বা মতামত রাখেন তখন তাকে ফোন-ইন প্রোগ্রাম বলে।

আবার প্রতিবেদক যখন কোনো স্পট থেকে টেলিফোনে কোনো বিশেষ ঘটনার লাইভ বর্ণনা দেন তখন তাকে টিভির পরিভাষায় ফোনো বলে। ফোনো সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফোনোতে প্রতিবেদকের কথায় যেন পরিস্থিতির একটি চিত্র ফুটে ওঠে। ফোনো যেহেতু এডিটিং করার সুযোগ থাকে না তাই শব্দ ও বাক্য ব্যবহারে প্রতিবেদককে দায়িত্ববান ও সতর্ক থাকতে হয়। যে কোনো লাইভ সম্প্রচারেই এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

স্টুডিও লাইভ : কোনো বিশেষ ঘটনার ওপর সংশ্লিষ্ট কারও বিশ্লেষণ বা মন্তব্য শোনার জন্য তাকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি স্টুডিওতে আসেন। সংবাদ পাঠক সূচনা এবং ওই ব্যক্তির পরিচয় উল্লেখ করে তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে যান।

প্যাকেজ গ্রাফিক্স : এটি হচ্ছে প্রতিবেদনের প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্য বা পরিসংখ্যান প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত শব্দ, ডায়াগ্রাম, ম্যাপ অথবা গ্রাফ, যা পর্দায় দেখা যায়।

ইনসার্ট/কাট-অ্যাওয়ে : সম্পাদনার সময় ছবি/শট কাটতে হলে সেই কাটের ফলে তৈরি হওয়া জাম্প এড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট অন্য একটি শট মাঝখানে ব্যবহার করা হয়। একই ফ্রেমে নেওয়া সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন অংশ কেটে কেটে জোড়া লাগানো হয়, কিন্তু যখন জোড়া লুকানোর জন্য ইনসার্ট বা কাটওয়েজ ব্যবহার করা হয় না তখন পর্দায় জাম্প কাট দেখা যায়। সংবাদে জাম্প কাট বর্জনীয় কারণ এটা অস্বাভাবিকতা বা নাটকীয়তার জন্ম দেয়।

কল-সাইন/পে-অফ : প্রতিবেদনের শেষে প্রতিবেদকের পরিচয় উপস্থাপন।

অ্যাসটন : ব্যবহার করা ছবির বা সাক্ষাৎকারদাতার পরিচিতি।

সেটআপ শট : সাক্ষাৎকারদাতার পরিচিতিমূলক শট। যেমন–সাক্ষাৎকারদাতা কাজ করছেন অথবা প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলছেন এমন দৃশ্য।

শপিং লিস্ট/শট লিস্ট : প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনের জন্য যেসব ছবি সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করে তার তালিকা।

www.pathagar.com

স্লাগ : রিপোর্টের পরিচিতিমূলক নাম। যে নামে রিপোর্টটিকে সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। এতে দিন ও সময় উল্লেখ থাকে।

রাশ ফুটেজ : ক্যামেরাপার্সনের তোলা অসম্পাদিত বা আন-এডিটেড ফুটেজ।

রানিং অর্ডার/রান ডাউন : এটি হচ্ছে বুলেটিনে সংবাদের ক্রমানুসার। একটি বুলেটিনে কোন সংবাদটি সবার আগে যাবে, তারপর কোনটা যাবে এরকম একটি ধারাবাহিক তালিকা তৈরি করা হয়। সে অনুযায়ী সংবাদ বুলেটিন প্রচার করা হয়। সংবাদ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্তরা বা বার্তা সম্পাদকরা এই রান ডাউন তৈরি করেন। এতে দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও স্টেশনের নিউজ পলিসির প্রতিফলন ঘটে। বার্তা প্রযোজনা কক্ষের জন্য এটি নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। বার্তা প্রযোজনাসহ সম্প্রচার বিভাগ এই ধারার ক্রম অনুযায়ী বুলেটিনটি প্রচার করেন। কখনও কোনো তাৎক্ষণিক বা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে রান ডাউনের পরিবর্তন আনা দরকার হলে বার্তা কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা বার্তা সম্পাদকরা বার্তা প্রযোজকদের সে বিষয়ে নির্দেশনা দেন।

কৃষিবিষয়ক বেতার-টেলিভিশন অনুষ্ঠান

কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষককে তাদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যকর তথ্য দেওয়া, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কৃষকের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা এবং কৃষকের পক্ষে ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করা। এতে সমসাময়িক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এর মধ্যে আসতে পারে কৃষি প্রযুক্তি, উৎপাদনে সাফল্য-ব্যর্থতা ও এসবের কারণ, সমস্যা সমাধান, কৃষিভিত্তিক বাণিজ্য, যেমন—প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, বাজারজাতকরণ, বিপণন, মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি। কৃষিনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোও প্রাধান্য পাওয়া উচিত। যেমন—কৃষক বিশেষত, দরিদ্র কৃষকবান্ধব আইন, নীতিমালা ও বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি। পুরো প্রক্রিয়াটি আকর্ষণীয় ও কার্যকর করে তুলতে গবেষণা পর্যায় থেকে শুরু করে নির্মাণ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে কৃষকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাও জরুরি।

যেহেতু কৃষি মূলত মাঠভিত্তিক এক বিশাল কর্মযজ্ঞ, কাজেই মাঠের উপস্থিতি যাতে টের পাওয়া যায়, তেমন প্রকাশনা ও নির্মাণকৌশল নিশ্চিত করতে হবে। যেমন—মুদ্রণমাধ্যমের জন্য হলে মাঠ পর্যায়ের কৃষক ও কৃষিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের প্রতিনিধি ও নীতিনির্ধারকদের বক্তব্য ও ছবি অন্তর্ভুক্ত করা। অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের জন্য হলে পুরো অনুষ্ঠান বা এর সিংহভাগ আউটডোর লোকেশনে চিত্রায়ণ করা। মুদ্রণমাধ্যমের জন্য ভাষা হতে হবে সহজ-সাবলীল, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ছবি ব্যবহারও জরুরি। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের জন্য প্রচারসময় হবে কৃষকের উপযোগী, যেমন—সন্ধ্যার পরপর। আর পুরো বিষয়টি যেন বিনোদন দেওয়ার মতো করে উপভোগ্য হয় তেমন করে নির্মাণ করা উচিত। সেজন্য লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ও আঙ্গিক ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—খনার বচন, পটগান ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে কৃষিবিষয়ক টিভি অনুষ্ঠানের উদাহরণ হিসেবে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের কথা বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

মাটি ও মানুষ

১৯৮০ সালে শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মূলধারার অনুষ্ঠান। এর দর্শকপ্রিয়তা যে কোনো অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে যায়। শুরুতে *কাজের কথা*, তারপর *আমার দেশ* এবং সর্বশেষ *মাটি ও মানুষ* নাম নেয় অনুষ্ঠানটি–যেখানে প্রাধান্য পায় কৃষি। কৃষকদের কাছে তো বটেই, অন্য দর্শকদের কাছেও এটি তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। *আমার দেশ* অনুষ্ঠানে মূলত নগর কৃষি, যেমন—ছাদে বা টবে সবজিচাষ প্রাধান্য পেত। এটির সম্প্রচার সময় ছিল বিকেল বেলা। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠানটির নাম হয় *মাটি ও মানুষ*। প্রচার সময় ছিল প্রাইম টাইমে–রাত ৮:৩০। মূলত নাগরিক দর্শকদের কথা মাথায় রেখে মাটি ও মানুষের পর্বগুলো বানানো হতো। কারণ তখনও গ্রামীণ এলাকায় টিভি দর্শকশ্রেণি তৈরি হয়নি। *মাটি ও মানুষ*-এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী; বাংলাদেশের কৃষি সম্প্রসারণে এটি অনন্য ভূমিকা রেখেছে, আর কৃষি স্বীকৃতি পেয়েছে গণমাধ্যমের মূলধারার আধেয় হিসেবে। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষককে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন জুগিয়েছে।

মাটি ও মানুষ-এর সঙ্গে যে ব্যক্তিত্বের নাম মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, তিনি শাইখ সিরাজ। শুধু নামের পরিবর্তন নয়, অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুতে ধীরে ধীরে বিবর্তন ঘটিয়েছেন তিনি। পরবর্তীতে তিনি *চ্যানেল আই*-এর *হৃদয়ে মাটি ও মানুষ* ও বিটিভি-র *কৃষি দিবানিশি* অনুষ্ঠান তৈরি করেন। তবে *মাটি ও মানুষ* অনুষ্ঠানটি এখনও বিটিভিতে প্রচারিত হয়।

ছাদে, টবে সবজিচাষ থেকে বাণিজ্যিক কৃষি, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিপণন, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, নীতিবিতর্ক প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে এ অনুষ্ঠানে। কৃষিবিষয়ক দরকারি সব তথ্য ও জ্ঞান কৃষকরা জানতে পারেন *মাটি ও মানুষ* থেকে, কারণ কৃষকদের তথ্য জানানোর বা কারিগরি সহায়তার জন্য সরকারের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাইরেই থেকে যেতেন বেশিরভাগ কৃষক। গণমাধ্যমে কৃষির সকল খাত যেমন—ফসল ও শস্য, মাছ, গরুছাগল, হাঁসমুরগি ইত্যাদির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কারিগরি ও অন্যান্য তথ্য উঠে আসে এ অনুষ্ঠানে। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে ফসলচাষ, মৎস্য খামার ও পোলট্রি ফার্মের ব্যাপক বিকাশের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানটির অবদান রয়েছে। বহু সম্ভাবনাময় কৃষি-প্রযুক্তির প্রসারের মাধ্যমে, নতুন নতুন জাত ও প্রজাতির প্রসারের মাধ্যমে *মাটি ও মানুষ* (এবং পরবর্তীকালে চ্যানেল আই-এর *হৃদয়ে মাটি ও মানুষ*) কৃষিবিজ্ঞানী ও গবেষকদের পরীক্ষাগার এবং কৃষকদের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা কমিয়ে আনে।

এই অনুষ্ঠানের কতগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—

ক. মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ : স্টুডিও বা কোনো আবদ্ধ ঘরে নয়, কৃষকদের কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বিভিন্ন পর্ব ধারণ করা। প্রথম দিকে দেখা যেত যে, কৃষক মাঠে কাজ করছেন, কিন্তু যখন কৃষকের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে তখন তাকে ভিন্ন একটি জায়গায় এনে কথা বলা হতো বা সাক্ষাৎকার নেওয়া হতো। এ অবস্থায় কৃষক আড়ষ্ট বোধ করতেন। দেখা যেত কৃষকের চেয়ে উপস্থাপকই বেশি কথা বলছেন। এর পরিবর্তন ঘটানো হয় কৃষকদের নিজেদের জায়গায় অর্থাৎ ফসলের মাঠে বা গোয়ালঘরে গিয়ে কথা বলার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

খ. ভাষা : কৃষকদের সঙ্গে কথোপকথনের বিশেষ আঙ্গিক নির্মাণ করা হয়। তাদের মতো করে সাধারণ বাংলায় কথা বলতে শুরু করায় কৃষকরাও খুব সাবলীল ও নির্ভয়ে কথা বলা শুরু করেন ক্যামেরার সামনে। কথা বলার অনানুষ্ঠানিক ধরনটি তাদের কথা বলা সহজ করে দেয়।

গ. পোশাক : মাঠঘাটের পরিবেশ-উপযোগী কৃষকের পছন্দের সবুজ রঙের পোশাক বেছে নেন শাইখ সিরাজ। একই রঙের পোশাকে প্রতিটি পর্বে কৃষকসহ দর্শকের মুখোমুখি হন নির্মাতা ও উপস্থাপক।

এই কৌশলগুলোর মধ্য দিয়ে কৃষকের সঙ্গে দূরত্ব কমে আসে; অনুষ্ঠানগুলোতে কৃষক অনেক বেশি সরব ও সক্রিয় হয়; সমস্যা, সম্ভাবনা, নতুন ধারণা ও কৃষি প্রযুক্তিসহ অনুষ্ঠানগুলোর বক্তব্য কৃষকসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয়, বিশ্বাসযোগ্য ও কার্যকর হয়ে ওঠে। অনেকে কৃষিকে ননগ্লামারাস সংবাদ বিট মনে করলেও কৃষি রিপোর্ট করেও যে খ্যাতির শীর্ষে ওঠা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শাইখ সিরাজ। তিনি পেয়েছেন অশোকা ফেলোর সম্মান। ২০০৯ সালে প্রথম বাংলাদেশি ও পঞ্চম এশীয় হিসেবে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার কৃষি সাংবাদিকতা বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্মাননা এ এইচ বোয়ের্মা পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়া ২০১১ সালে যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সের সম্মানসূচক ক্রেস্ট পান। ২০১৫ সালে পান গুসি শান্তি পুরস্কার।

তথ্যসূত্র

Weinberg, S. (1995). *The Reporter's Handbook*. New York: St. Martin Press.

www.pathagar.com

১৩. সাক্ষাৎকার

শাহনাজ মুন্নী ও মীর মাসরুর জামান

আধুনিক সাংবাদিকতায় রিপোর্টিংয়ের অনিবার্য অনুষঙ্গ সাক্ষাৎকার। একটি রিপোর্টকে সার্বিক অর্থে সুন্দর ও তথ্যবহুল করে তুলতে সাক্ষাৎকার খুবই জরুরি। সাক্ষাৎকারের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ইন্টারভিউ'–বিশ্লেষণ করলে এর মূল অর্থটি স্পষ্ট হতে পারে। ইন্টার অর্থ আন্তঃ বা দুপক্ষের সংযোগ বা সম্পর্ক। আর ভিউ হচ্ছে 'অভিমত' বা 'ভাষ্য'। সেই অর্থে সাক্ষাৎকার হচ্ছে প্রতিবেদক এবং তথ্যপ্রদানকারীর মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ। অন্যভাবে বলা যায়, তথ্যসংগ্রহের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরভিত্তিক কথোপকথন বা আলাপচারিতা। এ প্রসঙ্গে কেন মেজলার (১৯৯৯) বলেছেন, 'The interview is a conversation designed to elicit (or exchange) information on behalf of an unseen audience.' (Metzler, 1999)

সাক্ষাৎকার নেওয়ার উদ্দেশ্য :

ক. প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য নেওয়া।

খ. প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ, অভিমত ও পরামর্শ নেওয়া।

প্রিন্ট এবং ব্রডকাস্টিং দুই ক্ষেত্রেই একটি ভালো রিপোর্ট করতে হলে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্য সমর্থনের জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা অনিবার্য বিষয়।

তবে মেজলার মনে করেন যে কোনো সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। শুরুতে সাংবাদিকদের নিজেকেই নিজের দুটি প্রশ্ন করতে হয়। প্রশ্ন দুটি হলো :

ক. কী তথ্য দরকার?

খ. তথ্যটি কে সবচেয়ে ভালো দিতে পারবে?

www.pathagar.com

এই দুটি প্রশ্নের পরিষ্কার ও যথাযথ উত্তর পাওয়া গেলে প্রতিবেদকের কাজটি সহজ হবে এবং তার প্রতিবেদনটি অর্থপূর্ণ ও তথ্যবহুল হয়ে উঠবে। সাক্ষাৎকারের প্রথম ধাপটিতেই প্রতিবেদক কী তথ্য চান, সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। তেমনি প্রয়োজনীয় তথ্য বা মন্তব্যের জন্য কার কাছে যেতে হবে সে বিষয়টি জানা থাকা দরকার। তা না হলে তার সময় ও শ্রম দুটোই নষ্ট হবার ঝুঁকি থেকে যায়।

প্রকারভেদ

সাক্ষাৎকার নানা ধরনের হয়, যেমন—সংবাদ সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার ও অভিমত সাক্ষাৎকার।

সংবাদ সাক্ষাৎকার : সংবাদে প্রচারিত প্রতিবেদনের প্রয়োজনে যেসব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তা-ই সংবাদ সাক্ষাৎকার। ইতোমধ্যে ঘটে গেছে বা খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে যাচ্ছে এমন কোনো ঘটনার সংবাদকে কেন্দ্র করে এ ধরনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। যেমন—সংসদে বাজেট পাস হওয়ার আগে ও পরে অর্থনীতিবিদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী বা ব্যবসায়ী নেতাদের সাক্ষাৎকার। এসব সাক্ষাৎকার সাধারণত সংক্ষিপ্ত ও টু দ্য পয়েন্ট হয়। টিভি প্রতিবেদক তার ভয়েস ওভারের মাঝখানে এই সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর কথার নির্বাচিত অংশ (সাউন্ড বাইট) বসিয়ে দেন। একইভাবে পত্রিকা প্রতিবেদক তার প্রতিবেদনের মাঝে সাক্ষাৎকার দানকারী ব্যক্তির কথা উদ্বৃতিচিহ্নের (কোটেশন) মাধ্যমে উদ্ধৃত করতে পারেন।

ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার : এ ধরনের সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিই মুখ্য। প্রায় সময়ই এর মাধ্যমে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠক বা দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ব্যক্তির সাফল্য, ব্যর্থতা, ভাবমূর্তি ও প্রকৃতমূর্তি এবং সমাজে তার বিশেষ অবদান তুলে ধরা হয়। যেমন–একজন সফল কৃষকের সাক্ষাৎকার যিনি একটি বিশেষ ধরনের চাষপদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করেছেন। এরকম ক্ষেত্রে সাংবাদিকের সৃজনশীলতা ও পরিমিতিবোধ খুব দরকারি। যে কারণে সংবাদ সাক্ষাৎকারের চেয়ে ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে করা হয়।

অভিমত সাক্ষাৎকার : অনেক সময় সংবাদ সাক্ষাৎকারে তুলে ধরা হয় সাধারণ মানুষের কথা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়স ও পেশার লোকজনকে রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তু অনুযায়ী একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়, যা থেকে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত বা এক ধরনের মত পাওয়া যায়। ইংরেজিতে একে বলে ভক্সপপ। এটি ল্যাটিন শব্দ ভক্স পোপিলি থেকে নেওয়া, যার মানে ভয়েস অব দ্য পিপল। এতে ব্যক্তি মূল বিষয় নয়, সাক্ষাৎকার দানকারী যা বলছেন সেটাই মূল বিষয়। যেমন–হয়তো একটি বিশেষ অঞ্চলে সারের অভাব। এই সারের অভাব কীভাবে কৃষককে প্রভাবিত করছে, তা জানতে এই নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রতিবেদক কথা বলতে পারেন এলাকার বিভিন্ন বয়স ও শ্রেণির কৃষকদের সঙ্গে। পাঠক বা দর্শককে জানাতে পারেন তাদের অভিমত।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারের কৌশল : পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ

পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

বিষয় বা ইস্যু শনাক্ত করা: শুরুতেই বিষয়বস্তু বা মূল ইস্যু চিহ্নিত করে, সে সম্পর্কে যতটা জানা সম্ভব তা জানার চেষ্টা করে মোটামুটি একটি পরিষ্কার ধারণা নিয়ে এগুতে হবে। এক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী, ইন্টারনেট বা পুরনো পেপার কাটিং সাহায্য করতে পারে।

সঠিক ও প্রকৃত ব্যক্তি নির্বাচন : রিপোর্টের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে ঠিক করতে হবে কার সাক্ষাৎকার প্রয়োজন। যিনি বিষয়টি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানেন, তেমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষটিকে প্রথমে খুঁজে নেওয়া ভালো। কৃষি-অর্থনীতি সম্পর্কে রিপোর্টিং করতে গিয়ে কৃষি-প্রযুক্তিবিদের সাক্ষাৎকার খুব একটা কাজে লাগবে না। এক্ষেত্রে যিনি বিষয়টি ভালো বোঝেন কিংবা যিনি এর সঙ্গে জড়িত তেমন ব্যক্তিটিরই সন্ধান করতে হবে। সহকর্মী, টেলিফোন ডিরেক্টরি, ইন্টারনেট, লাইব্রেরি ইত্যাদি যে কোনো সূত্রকে কাজে লাগিয়ে সঠিক ব্যক্তিটিকে খুঁজে নিতে হবে।

বিকল্প চিন্তা

ধরা যাক যাকে আপনি সাক্ষাৎকারের জন্য উপযুক্ত বলে ভাবলেন, তিনি আপনাকে সময় দিতে পারলেন না অথবা তিনি অসুস্থ বা বিদেশে আছেন, আপনারও রিপোর্ট জমা দেওয়ার সময় হয়ে গেছে, আবার তিনি হয়তো হঠাৎ করে সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকৃতি জানালেন, এক্ষেত্রে বিকল্প কার সাক্ষাৎকার নেওয়া যায় সে সম্পর্কে আগেই ভেবে রাখা ভালো। একজনকে না পাওয়া গেলে যাতে অন্য জনকে দিয়ে কাজ শেষ করা যায় সেই প্রস্তুতি থাকতে হবে।

যোগাযোগ

যার সাক্ষাৎকার নেবেন তার সম্বন্ধে আগেই পর্যাপ্ত তথ্য জেনে নেওয়া দরকার। তারপর তার কাছে নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য বিনীত ও যথাযথভাবে তুলে ধরে সময় চাওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সঙ্গে আলোচনা করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করতে হবে। এসময় যিনি সাক্ষাৎকার দেবেন তাকে বিষয়বস্তু সম্পর্কেও কিছুটা অবহিত করতে হবে।

প্রশ্ন

কী প্রশ্ন করবেন, প্রশ্নের উত্তরে কী ধরনের তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে আশা করেন, তা নিশ্চিত হয়েই প্রশ্ন করা উচিত। সাক্ষাৎকারের পরিকল্পনা পর্বেই প্রশ্নগুলো ঠিক করে নিতে পারলে ভালো। প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করতে পারলে তা অনেক সময় কাজে লাগে। অন্তত পয়েন্টগুলোও যদি আগেভাগে ঠিক করে রাখা যায়, কিংবা একটি চেকলিস্ট তৈরি থাকে তবে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও উত্তর এড়িয়ে চলা সম্ভব।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল

রিপোর্টারের প্রথম কাজ নির্ধারিত সময়ে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত জায়গায় উপস্থিত থাকা। প্রথমেই প্রশ্নোত্তর পর্বে না গিয়ে কুশল বিনিময় ও আন্তরিকভাবে ছোটখাটো কথা বলে পরিবেশটা সহজ করে নেওয়া উচিত। তারপর আস্তে আস্তে মূল প্রসঙ্গে আসা যায়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা ক্যামেরা বসানো, ফ্রেম ঠিক করা ও অডিও চেকের ফাঁকে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন। প্রয়োজন মনে হলে, রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও খানিকটা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। অনেক সময় এসব আলোচনায় সংবাদের নতুন অ্যাঙ্গেল পাওয়া যায়, আবার অনেক সময় তা বিপজ্জনকও বটে, সব শুনে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বেঁকে বসতে পারেন।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে আস্থায় নিয়ে এসে আলোচনাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বিষয়ের গভীরে ঢুকতে হবে। কঠিন প্রশ্ন শেষদিকে করতে হবে। এতে যদি সাক্ষাৎকার প্রদানকারী বিব্রত হন বা অস্বস্তি বোধ করেন, তবে তা মোকাবেলা করার কৌশলও ঠিক করে নিতে হবে। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, কেন এই বিশেষ তথ্যটি আপনার রিপোর্টের জন্য জরুরি।

প্রশ্ন করার সাধারণ নিয়মাবলি

শুরুর প্রশ্নটি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে করে সাক্ষাৎকারদাতা উত্তর দিতে স্বস্তি পান।

তারপর প্রতিক্রিয়ামূলক প্রশ্ন করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। খানিকটা পাঠক বা দর্শকের প্রতিনিধি হয়ে প্রশ্ন করা ভালো। প্রথমেই স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন করলে সাক্ষাৎকারদাতা নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারেন।

প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত হওয়া ভালো। সাধারণ কথাবার্তার মতো প্রশ্ন করা উচিত। যথাসম্ভব বিনয়ী ভঙ্গিতে প্রশ্ন করা উচিত, যেন সাক্ষাৎকারদাতার কাছে প্রশ্নগুলো জেরা করার মতো মনে না হয়। যে প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ'/'না' দিয়েই দেওয়া যায় তেমন প্রশ্ন না করাই ভালো।

সম্পূরক কাগজপত্র চেয়ে নেওয়া যেতে পারে। শেষ প্রশ্ন করার আগে বলা যেতে পারে এটি শেষ প্রশ্ন। এতে সাক্ষাৎকারদাতা হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পাবেন। হয়তো শেষ প্রশ্নেই রিপোর্টার তার কাঙ্ক্ষিত উত্তরটি পেয়ে যাবেন।

ভালো সাক্ষাৎকার নেওয়ার ৭টি সাধারণ প্রশ্ন :

১. কেন? কেন আপনারা এই প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন? কেন এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করছেন?

২. একটা উদাহরণ দেবেন, যেমন...?

৩. বিষয়টি কীভাবে জানা গেল, কে বলেছে, কীভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি...

৪. এর ফলে কী হবে? এর প্রভাব কোথায় পড়বে?

৫. এর কি কোনো প্রমাণ আছে?

www.pathagar.com

৬. এমনকিছু কি আপনি বলতে চান, যা আমি জিজ্ঞেস করিনি...

৭. বিষয়টি নিয়ে আর কার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমের জন্য সাক্ষাৎকার

মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক দুক্ষেত্রেই সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রায় একই ধরনের। পার্থক্য এই যে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে দেখা যায়, ফলে তার মুখভঙ্গিও দর্শকদের সামনে অনেক অর্থ তুলে ধরে। তা ছাড়া ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বিশেষ করে নিউজ রিপোর্টে সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত কিছু চুম্বক অংশ তুলে ধরা হয়। ফলে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সাক্ষাৎকার সংক্ষিপ্ত ও টু দ্য পয়েন্ট হলে সম্পাদনার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এছাড়া ইলেকট্রনিক মাধ্যমের সঙ্গে মুদ্রণ মাধ্যমের কিছু কারিগরি ভিন্নতা তো আছেই। টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের শুরুতেই সাক্ষাৎকারদাতার কিছু সেট-আপ শট নেওয়া দরকার। অর্থাৎ সাক্ষাৎকারদাতার পরিচিতিমূলক কয়েকটি শট নেওয়া। সাক্ষাৎকারদাতা কাজ করছেন বা প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলছেন এমন ছবি সেট-আপ শট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাক্ষাৎকারদাতার ব্যাকগ্রাউন্ড, তার বসার জায়গা, তার ফ্রেমিং দেখা যদিও মূলত ক্যামেরাম্যানের কাজ তবু প্রতিবেদককেও এসব জিনিস লক্ষ রাখতে হয়। যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তার চেহারা স্পষ্ট ও ভালো দেখানোর ব্যাপারটিও নিশ্চিত করা দরকার।

সাক্ষাৎকারে যে কথাগুলো ব্যবহার করা হবে তা সাক্ষাৎকারদাতা একবারে না বলে বিভিন্ন বাক্যে ছাড়া ছাড়া ভাবে বলতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দু তিনটি জায়গা থেকে তার কথা কেটে নিয়ে জোড়া দিতে হতে পারে। এসব জোড়া লুকানোর জন্য কাটওয়েজ বা ইনসার্ট শট নিয়ে রাখতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় ফ্রেমে ছিল এমন কোনো বস্তুর ছবি অথবা প্রতিবেদকের চেহারা কাটওয়েজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

সাক্ষাৎকার শেষে সাক্ষাৎকারদাতার নাম পদবি ঠিকভাবে জেনে নিতে হবে। তার নামের বানান যেন ভুল না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মানুষ নিজের নামের বানান ভুল দেখতে খুবই অপছন্দ করে।

সাক্ষাৎকারের করণীয় ও বর্জনীয়

- সফল সাক্ষাৎকারের জন্য সাক্ষাৎকারদাতার কথা মনযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। উত্তম প্রশ্নকারীর পাশাপাশি উত্তম শ্রোতা হওয়ার চেষ্টা করা দরকার। একটি প্রশ্নের উত্তর শেষ করার পর আরেকটি প্রশ্ন করা উচিত। উত্তরের মাঝখানে সাক্ষাৎকারদাতাকে থামিয়ে দেওয়া ভালো অভ্যাস নয়।
- অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ও উত্তর এড়িয়ে চলতে হবে। কখনই সাক্ষাৎকারদাতার প্রতি কোনো ধরনের অবজ্ঞাপূর্ণ উপেক্ষা বা বিদ্রূপাত্মক মনোভাব পোষণ করা যাবে না।
- দীর্ঘ, জটিল এবং একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ভালো তথ্য বের করে আনতে পারে না। সাক্ষাৎকারদাতা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। সহজ, স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, শ্রুতিমধুর, ছোট্ট কিন্তু টু দ্য পয়েন্ট প্রশ্ন করতে হবে।

www.pathagar.com

- যে প্রশ্ন উরদাতাকে কোনো বিশেষ দিকে ধাবিত করে তেমন প্রশ্ন করা যাবে না।
- প্রশ্ন যেন অতি তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত না থাকে। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বড় প্রশ্ন করা অনুচিত এবং প্রশ্নে রিপোর্টার বা প্রশ্নকারীর নিজের মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়।
- কোনোভাবেই সাক্ষাৎকারদাতার সঙ্গে তর্কে জড়ানো যাবে না। রিপোর্টারকে সহনশীল ও ধৈর্যশীল হতে হবে।

কৃষক ও কৃষি-বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকারে বিবেচ্য বিষয়

এটা সাধারণভাবে সকলেই জানেন যে, কৃষকের সঙ্গে কথা বলতে বা প্রশ্ন করতে হবে কৃষকের ভাষায়, আন্তরিক ও সহজ ভঙ্গিতে। কৃষকের ভাষা মানে আঞ্চলিক ভাষাতে নয় বা আঞ্চলিক ভাষাকে বিকৃত করে নয় বরং ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষকের বোধগম্যতা মাথায় রেখে নম্র ভঙ্গিতে স্বাভাবিকভাবে কথা বলাই ভালো। এমন শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করা ঠিক নয় যাতে কৃষক ঘাবড়ে গিয়ে কৃত্রিম আচরণ করার চেষ্টা করেন।

কৃষি-বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে সামান্য গবেষণা বা পড়াশোনা করে নিতে হবে। বিশেষ করে যার সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছেন তিনি কোন বিষয়ে পারদর্শী, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তা জেনে নিলে ভালো। তাতে প্রশ্ন করতেও সুবিধা। তবে প্রতিবেদক সব জানেন এমন ভান করা ঠিক নয়। প্রতিবেদক বিশেষজ্ঞের কাছে জানতে যাচ্ছেন, জানাতে নয়। অনেক সময় বিশেষজ্ঞ টেকনিক্যাল শব্দ বা পরিভাষা ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে তাকে বিষয়টি পাঠক বা দর্শকের উপযুক্ত করে বলতে অনুরোধ জানানো উচিত। প্রয়োজনে প্রতিবেদককেও প্রশ্ন করে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে। রিপোর্ট লেখার ক্ষেত্রে এই জানা-বোঝাটা সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র

Metzler, K. (1999). *Creative interviewing: The writers Guide to Gathering Information By asking Questions*. USA: Allyn And Bacon.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফসলের রোগবালাই[১]

ধান

টুংরো

- প্রথমে কচি পাতায় লম্বালম্বিভাবে শিক্ষরা বরাবর পর্যায়ক্রমে হালকা সবুজ ও হালকা হলদে রেখা দেখা যায়।
- পরে ক্রমান্বয়ে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে সমস্ত পাতাটা উপর দিক থেকে গাঢ় হলদে রঙের হয় এবং আক্রান্ত কচি পাতা একটু মুচড়ে যায়।
- গাছের বাড়-বাড়তি ও কুশি গজানো কমে যায়। ফলে আক্রান্ত গাছ সুস্থ গাছের তুলনায় খাটো দেখায়।
- প্রথমদিকে বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি গোছায় এ রোগটি দেখা যায় এবং পরে আশপাশের গোছা বা খেতেও রোগ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে।
- পাতাফড়িং থাকলে রোগ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ক্ষতির পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে।
- ধানগাছ হলদে হলেই টুংরো হয়েছে বলে মনে করা সঙ্গত নয়; কারণ খেতে নাইট্রোজেন ও সালফার বা গন্ধক সারের অভাবজনিত অপুষ্টি, পানির অভাব, শীতের প্রকোপ, লোহার আধিক্য ও লবণাক্ততার কারণেও ধানগাছ হলদে হতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে জমির ১০০ ভাগ গাছেই সমভাবে লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে; কিন্তু টুংরো হলে বিক্ষিপ্তভাবে এর লক্ষণ দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগের উৎস, যেমন আড়ালী ঘাস, বাওয়া ধান এবং রোগাক্রান্ত গাছ দেখামাত্রই তুলে ধ্বংস করতে হবে;
- আলোক-ফাঁদ ব্যবহার করে বাহক সবুজ পাতাফড়িং মেরে ফেলতে হবে;

হাতজালের প্রতি টানে দুটি সবুজ পাতাফড়িং এবং রোগাক্রান্ত গাছ দেখা গেলে প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলিলিটার ডায়াজিনন বা কুইনালফস মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পাতাপোড়া

- চারা অবস্থায় এ রোগ হলে সম্পূর্ণ গোছা পচে যায় ও ঢলে পড়ে। রোগের এ অবস্থাকে কৃসেক বলে। এ অবস্থায় আক্রান্ত কাণ্ড ছিঁড়ে চাপ দিলে পুঁজের মতো আঠালো ও দুর্গন্ধযুক্ত রস বের হয়।
- এ ছাড়া কখনও কখনও রোগাক্রান্ত গাছের উপর দিকের কচিপাতা ফ্যাকাশে হলদে রং ধারণ করে আস্তে আস্তে মারা যেতে পারে। এ অবস্থাকে ফ্যাকাশে হলদে লক্ষণ বলে। তবে এ লক্ষণ সচরাচর খুব কমই দেখা যায়।

---

১. রোগবালাই বিষয়ক তথ্যবলি কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে সংগৃহীত

www.pathagar.com

- ধানগাছে থোড় অবস্থা থেকে প্রধানত পাতাপোড়া রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমে পাতার অগ্রভাগ বা কিনারা থেকে লক্ষণ শুরু হয়। আক্রান্ত অংশ থেকে পাতার দুই বা এক ধার থেকে পাতাটা শুকনো খড়ের রং ধারণ করে মরতে থাকে এবং ক্রমশ সম্পূর্ণ পাতাটাই মরে শুকিয়ে যায়।
- রোগ বেড়ে গেলে গাছের সব পাতাই এভাবে মরে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হতে পারে। অনবরত বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া এ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।
- পামরিপোকা বা অন্যান্য পাতা নষ্টকারী পোকার আক্রমণ ও বাতাসে পাতায় পাতায় ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট ক্ষত দিয়েও রোগজীবাণু পাতার ভেতর ঢুকে এ রোগ বিস্তার করতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- সুষম মাত্রায় ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- ঝড়-বৃষ্টির পর ইউরিয়া সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে;
- রোগ দেখা দেওয়ার পর ইউরিয়া সারের উপরি-প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে;
- রোগ দেখার পর একরপ্রতি ১৫ কেজি পটাশ সার ১৫ দিন অন্তর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- পাতাপোড়া রোগ হলে আক্রান্ত জমির পানি শুকিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন পর আবার সেচ দিতে হবে; চারা উঠানোর আগে সেচ দিয়ে বীজতলা ভালোভাবে ভিজিয়ে সাবধানে চারা তুলতে হবে যেন শেকড় কম ছেঁড়ে;

রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া জমিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

উফরা

- উফরা রোগে আক্রান্ত ধানগাছের কচি অংশ বা পাতা ও খোলের সংযোগস্থল একপ্রকার ক্ষুদ্র কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং গাছ থেকে রস শোষণের দরুন প্রথমে কচিপাতার গোড়ায় সাদা ছিটেফোঁটা দাগ দেখা যায়।
- সাদা দাগ ক্রমে বাদামি রঙের হয় এবং পরবর্তীতে পুরো পাতাটাই শুকিয়ে মরে যায়।
- আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে গাছের বাড়-বাড়তি কম হয়। থোড় অবস্থায় আক্রমণ করলে থোড়ের মধ্যে ছড়া মোচড়ানো অবস্থায় দেখা যায়। ফলে কোনো ছড়া বের হতে পারে না। আবার থোড় বের হলেও আংশিক বা অর্ধেক বের হয়।
- শীষ বের হবার আগে লক্ষণ দেখা দিলে রোগপ্রবণ জাতের ক্ষেত্রে কোনো ফলনই হয় না।

উফরা রোগের কৃমি পরিত্যক্ত নাড়া, খড়কুটা, ঝরা ও মুড়ি ধান এবং ঘাসজাতীয় কোনো কোনো আগাছায়, এমনকি মাটিতে কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া জমিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- জমিতে ঘাসজাতীয় আগাছা, মুড়ি বা ঝরা ধান তুলে জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- সম্ভব হলে প্রথম বৃষ্টির পর জমিচাষ দিয়ে ১৫ থেকে ২০ দিন ফেলে রেখে জমি ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে বীজতলা করা যাবে না।

www.pathagar.com

- রোগ দেখা দিলে একর প্রতি ৮ কেজি ফুরাডান ৫জি অথবা কুরাটার ৫জি ছিটিয়ে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে অথবা আক্রান্ত চারার বেলায় রোপণের ১২ থেকে ২০ ঘণ্টা আগে বীজতলা থেকে উঠিয়ে তার শিকড় কৃমিনাশকের ১.৫% দ্রবণে (১০০ মিলিলিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম কৃমিনাশক) ভিজিয়ে রেখে পরে তা জমিতে লাগাতে হবে।

শুধু ধান না করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ফসলের চাষ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ব্লাস্ট

পাতা ব্লাস্ট ও গিঁট ব্লাস্ট

- ব্লাস্ট একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগটি ধানগাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকা পর্যন্ত যেকোনো সময়ে হতে পারে। এ রোগে ধানগাছের পাতা, গিঁট ও শিষের গোড়া আক্রান্ত হয়। তাই এ রোগ তিনটি নামে পরিচিত, যেমন পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও শিষ ব্লাস্ট।
- পাতা ব্লাস্টে প্রথমে পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকৃতি দাগ হয়। আস্তে আস্তে দাগ বড় হয়ে দুই প্রান্ত লম্বা হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে। দাগের চারদিকের অংশ গাঢ় বাদামি ও মাঝের অংশ সাদা-ছাইবর্ণ ধারণ করে। অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে গিয়ে পুরো পাতাই মরে যায়।
- গিঁট ব্লাস্ট হলে আক্রান্ত গাছের গিঁট কালো এবং দুর্বল হয় এবং জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙে পড়ে।
- শিষ ব্লাস্ট হলে শিষের গোড়ায় অথবা যেকোনো শাখায় বাদামি দাগ পড়ে এবং এতে শিষ বা শিষের শাখা ভেঙে পড়ে ও ধান চিটা হয়।
- এ রোগের কারণে জমির সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশে এ রোগ বোরো মৌসুমেই বেশি হয়। পাতা ব্লাস্ট না হলেও শিষ ব্লাস্ট হয় এবং এতে শিষ ভেঙে পড়ে ও ধান চিটা হয়।
- রোগপ্রবণ ধানের জাত, বেলে জাতীয় মাটি এবং বেশি ইউরিয়া সার প্রয়োগ এ রোগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া রাতে ঠান্ডা, দিনে গরম ও সকালে পাতায় শিশির জমে থাকলেও এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে;
- সুস্থ বীজ ব্যবহার করতে হবে;
- বীজ শোধন করে ব্যবহার করতে হবে;
- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি-প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে;
- পটাশিয়ামের অভাবযুক্ত জমিতে পর্যাপ্ত পটাশ সার অথবা আমাদের দেশের কৃষকের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী ছাই ব্যবহার করতে হবে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

একরপ্রতি ৩২৫ মিলিলিটার হিনোসান অথবা ১ কেজি হোমাই বা টপসিন-এম আক্রান্ত জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

খোলপোড়া

- খোলপোড়া একটি ছত্রাকজনিত রোগ। ধানগাছের কুশি গজানোর সময় হতে সাধারণত এ রোগ দেখা যায়। পানিতে ভাসমান ছত্রাক গুটিকা দিয়ে প্রাথমিক আক্রমণ সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

- প্রথমে খোলে গোলাকার ও লম্বাটে ধরনের ধূসর রঙের জলছাপের মতো দাগ পড়ে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হয়ে উপরের দিকে সমস্ত খোলে ও পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় খোল দেখতে অনেকটা গোখরা সাপের চামড়ার দাগের মতো মনে হয়।
- গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগটি বেশি হয়। এ ছাড়া রোগপ্রবণ জাত, বেশি মাত্রায় ইউরিয়া ব্যবহার ও ঘন করে চারা রোপণ এ রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। আমাদের দেশে আউশ ও আমন মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ২৫×২০ সেমি, ২৫×২৫ সেমি বা ২০×২০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করা যেতে পারে;
- রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে পরে আবার সেচ দিতে হবে;
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ফলিকুর একরপ্রতি ২০০ এমএল, টিল্ট অথবা এ্যাকোনা জোল একরপ্রতি ৪০০ মিলিলিটার যে কোনো একটি ওষুধ রোগ দেখা দেওয়ার পর ১৫ দিন পরপর দু-বারে প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- জমিতে সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার করতে হবে;
- রোগ দেখার পর একরপ্রতি ১৫ কেজি পটাশ সার ১৫ দিন পরপর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে;
- যেসব এলাকায় প্রতি বছরই এ রোগ হয় সেখানে মোটামুটি লম্বা জাতের ধান চাষ করা যেতে পারে।
- রোগাক্রান্ত জমির ধান কাটার পর বছরে অন্তত একবার নাড়া জমিতে পুড়িয়ে ফেলা ভালো;

শুধু ধান না করে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ফসলের চাষ করা যেতে পারে।

খোলপচা রোগ

এ রোগটিতে খোলের উপরে ছোট ও গোলাকার বাদামি দাগ হয়। আস্তে আস্তে দাগ বড় হতে থাকে এবং কালচে থেকে ধূসর রঙের হয়। রোগের মাত্রা বেশি হলে শিষ বের হতে পারে না অথবা রোগের তীব্রতা অনুযায়ী আংশিক বের হয় তবে ধান বেশিরভাগ কালো ও চিটা হয়ে যায়। আক্রান্ত শিষ খোল থেকে খুলে দেখলে সাদা সাদা ছত্রাক-কাণ্ড দেখা যায়। অনেক সময় নিচের দিকের খোলও আক্রান্ত হয়, কিন্তু এ অবস্থায় ফসলের কোনো ক্ষতি হয় না।

দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত খড়কুটো, জমিতে পুড়িয়ে ফেলা;
- সুস্থ বীজের ব্যবহার, পরিমিত সারের ব্যবহার, বীজ শোধন করা (হোমাই ৩ গ্রাম/ কেজি বীজ), একরপ্রতি ৪০০ সিসি টিল্ট বা হোমাই ৯০০ গ্রাম প্রয়োগ করা।

পাতায় বাদামি দাগ রোগ

- ধানের পাতায় প্রথমে ছোট ছোট বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়;
- দাগগুলো আস্তে আস্তে বড় হয়ে অনেকটা তিলের বীজের মতো আকার ধারণ করে;
- ধানের জাতভেদে দাগের আকার ও বর্ণ বিভিন্ন হতে পারে;
- রোগকাতর জাতে দাগের আকার বড় হয় এবং দাগের মাঝখানটা ধূসর বর্ণ বা হালকা বাদামি; রঙের হয়; পাতায় অনেক দাগের সৃষ্টি হয় ফলে পাতাটি মারা যায়। অনেক সময় দাগের চারদিকে হলুদ রং ধারণ করতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

দমন ব্যবস্থাপনা

- সুষম সারের ব্যবহার
- অধিক পরিমাণে জৈব সারের ব্যবহার
- সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা
- সুস্থ বীজের ব্যবহার
- বীজ শোধন করা (ডাইথেন এম ৪৫ বা ভিটাভেক্স ২০০ ছত্রাকনাশক ৩ গ্রাম/কেজি বীজ)

সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ করা।

বাকানি রোগ বা গোড়া পচা

ধানের বাকানি রোগ বীজতলা ও মূল ধানের জমিতে দেখা যায়। আক্রান্ত চারা বা গাছ লম্বা হয়ে যায় এবং কখনও কখনও সুস্থ গাছের চেয়েও বেশি লম্বা হয়। এই গাছগুলো লিকলিকে হয় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। আক্রান্ত গাছ বেঁচে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ছড়ায় চিটা হয়। ধানগাছ যখন মারা যায় তখন গাছের নিচের দিকের অংশে সাদা বা গোলাপি বর্ণের ছত্রাক দেখা যায়।

স্বাস্থ্যসম্মত ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা, পরিমিত মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার করা, আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা, আগাছা ও খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলা, রোগমুক্ত এলাকা থেকে বীজ সংগ্রহ করা, হোমাই দ্বারা বীজ শোধন করা, বীজতলা সবসময় পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখা এবং একই জমিকে বারবার বীজতলা হিসেবে ব্যবহার না করা।

ফোস্কা দাগ রোগ

রোগটি ধানগাছে বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ সৃষ্টি করে থাকে। তবে বেশিরভাগ সময়ে পাতায় যে লক্ষণটি বেশি দেখা যায় তা হলো, পাতার আগা থেকে দাগ আরম্ভ করে নিচের দিকে বাড়তে থাকে। প্রথমত পাতায় ভেজা ভেজা জলপাই রঙের দাগ হয়, যা আস্তে আস্তে গাঢ় বাদামি ও হালকা বাদামি দাগে পরিণত হয় এবং পাশাপাশি একসঙ্গে হয়ে ঢেউয়ের মতো দাগের গুচ্ছ ঘটায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত খড়কুটো জমিতে পুড়িয়ে ফেলা;
- রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করা;

একরপ্রতি ১ কেজি থিউভিট, সালফেনাক, সাইক্রোথিওল স্পেশাল বা কুমুরাস ধানের থোড় অবস্থায় প্রয়োগ করতে হবে।

ভুট্টা

বীজ পচা ও চারাগাছের রোগ

মাটি ও বীজে অবস্থানকারী ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। স্যাঁতসেঁতে মাটি ও ঠান্ডা আবহাওয়া এ রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। জমিতে রসের পরিমাণ যদি বেশি থাকে এবং মাটির তাপমাত্রা যদি কম হয় তবে রোপণকৃত বীজ হতে চারা গজাতে এবং চারা বড় হতে অনেক সময় লাগে। ফলে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণ বেড়ে যায়। তাই রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, আক্রমণের সময় এবং মাটির রসের পরিমাণ ও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে এসব রোগের বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন–বীজ পচে যাওয়া, চারা ঢলে পড়া, চারা ঝলসে যাওয়া, মিইয়ে পড়া বা গোড়া ও শিকড় পচে যাওয়া ইত্যাদি। বীজ পচে যাওয়া এবং চারা নষ্ট হওয়ার ফলে ক্ষেতে সাধারণত ভুট্টাগাছের সংখ্যা পাতলা হতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুস্থ, সবল, ক্ষতমুক্ত উন্নতমানের বীজ বপন করতে হবে। এ জাতীয় বীজ খুব তাড়াতাড়ি গজায় এবং সবল চারার জন্ম দেয়, যা বিভিন্ন প্রকার রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

২. জমি ভালোভাবে চাষ করে মাটিতে পরিমিত রস ও তাপমাত্রা থাকলে (১৩° সে এর উপর) বীজ বপন করতে হবে।

৩. বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক নাশক যেমন–ভিটাব্যক্স-২০০ বা থিরাম (০.২৫% হারে) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে। এতে বীজ পচা বা চারা ঝলসানো রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ

এ রোগের জীবাণু গাছের আক্রান্ত অংশে ও মাটির মধ্যে অনেক দিন বেঁচে থাকে এবং ছত্রাকের বীজকণা বাতাসের সাহায্যে সুস্থ গাছে ছড়ায়। আমাদের দেশে ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ বেশি হয় ড্রেসলেরা টারসিকামের আক্রমণে। দেশের প্রায় সব এলাকাতেই কম বেশি এই রোগটি হয়ে থাকে। এ ছত্রাকের দ্বারা আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় লম্বা, ডিম্বাকার ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায় যা ২.৫ থেকে ১৫.০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং পরবর্তীতে গাছের উপরের অংশে বিস্তার লাভ করে। রোগের প্রকোপ বেশি হলে গাছের ডগা শুকিয়ে যায় ও গাছ মরে যায় যা অনেক সময় খরায় আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগ প্রতিরোধী জাতের ভুট্টার চাষ করতে হবে। শুভ্রা এবং মোহর অপেক্ষাকৃত রোগ প্রতিরোধী জাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

২. রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত ফসলে টিল্ট ২৫০ ইসি (০.১%) অথবা ব্যাভিস্টিন (০.২%) ১৫ দিন পর পর তিনবার স্প্রে করতে হবে।

৩. ভুট্টা সংগ্রহের পর আক্রান্ত গাছের পাতা ও কাণ্ড জমি থেকে সরিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ডাউনি মিলডিউ

এ রোগটি ভুট্টা চাষের প্রধান অন্তরায়। ভুট্টা গাছের আক্রান্ত পাতা ও পাতার ফলকে লম্বা লম্বা কোরোটিক দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতার নিচে সাদা সাদা ছত্রাক ও ছত্রাকের বীজকণা দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতি ও দুর্বল হয়। মোচার আকার ছোট হয় এবং অনেক সময় মোচা পুরোপুরি আসে না। আক্রান্ত বীজের মাধ্যমেও রোগটি ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগমুক্ত সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

২. রিডোমিল এম জেড-৭২ নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা ১:৪০০ (ছত্রাকনাশক ও বীজ) অনুপাতে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

৩. ভুট্টাখেতে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তুলে ধ্বংস করতে হবে।

৪. জমিতে অধিক মাত্রায় সেচ বা বৃষ্টির পানি বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কাণ্ড পচা রোগ

গাছের পাতা ঝলসে যাওয়া, শিলাবৃষ্টি অথবা গাছের কাণ্ডে ও শিকড়ে পোকার আক্রমণে কাণ্ড পচা রোগ বৃদ্ধি পায়। কাণ্ড পচা রোগের প্রাথমিক লক্ষণ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপর নির্ভর করে কিন্তু শেষ পর্যায়ে সর্বক্ষেত্রেই গাছের কাণ্ড পচে গাছ ভেঙে বা মুচড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আমাদের দেশে খরা মৌসুমে এবং সাধারণত বয়স্ক গাছে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি লক্ষ করা যায়।

www.pathagar.com

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুস্থ ও সবল বীজ ছত্রাকনাশক যথা থিরাম বা ভিটাভেক্স-২০০ (০.২৫% হারে) দ্বারা শোধন করে বপন করতে হবে।

২. সুষম সার (সুপারিশকৃত) ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও পটাশের ক্ষেত্রে পরিমাণের কমবেশি প্রয়োগ বর্জন করতে হবে।

৩. ভুট্টার গাছ ঘন করে বপন থেকে বিরত থাকতে হবে। বীজ সারিতে বপন করতে হবে এবং সারি ও গাছের মধ্যে পরিমিত দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

৪. একই জমিতে একাধারে ভুট্টা চাষ না করে পর্যায়ক্রমে চাষ করতে হবে এবং ফসল কাটার পর আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৫. শিকড় অথবা কাণ্ড আক্রমণকারী পোকা কীটনাশক ছিটিয়ে দমন করতে হবে।

মোচা ও দানা পচা রোগ

মোচা ও দানা পচা রোগ ভুট্টার ফলন, বীজের গুণাগুণ ও খাদ্যমান কমিয়ে দেয়। আক্রান্ত মোচার খোসা ও দানা বিবর্ণ হয়ে যায়। দানা স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হয় না এবং দানা কুঁচকে অথবা ফেটে যায়। অনেক সময় মোচায় বিভিন্ন দানার মাঝে বা উপরে ছত্রাকের উপস্থিতি খালি চোখে দেখা যায়। মোচা প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত হলে পুরো মোচাই পচে যায়। একই জমিতে বারবার ভুট্টার চাষ করলে এ রোগ বেশি হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. এ রোগের প্রাদুর্ভাব এড়াতে হলে একই জমিতে বারবার ভুট্টা চাষ না করে শস্য পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. ভুট্টাখেতে কীটনাশক ছিটিয়ে পোকা দমন করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাখির আক্রমণ রোধ করতে হবে।

৩. ভুট্টা পেকে গেলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের পর ভুট্টার পরিত্যক্ত অংশ জমি থেকে সরিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪. মোচা পরিপক্ব হলে দানা ছাড়িয়ে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে বাজারজাত অথবা গুদামজাত করতে হবে।

গুদাম পচা রোগ

প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগের লক্ষণ খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু গুদামে পচন বেশি হলে এসব ছত্রাকের উপস্থিতি খালি চোখে দেখা যায়। ভুট্টার দানা স্বাভাবিক রং হারায়। গুদামে পচন দেখা দিলে অনেক সময় দুর্গন্ধ বের হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. ভুট্টা পেকে যাওয়ার পর দেরি না করে যত শীঘ্র সম্ভব ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

২. ভুট্টার দানা ছাড়ানোর সময় দানা যাতে ভেঙে না যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

৩. দানা ভালোভাবে শুকাতে হবে যাতে করে দানায় জলীয় অংশের পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগের নিচে থাকে।

৪. গুদামজাত দানায় পোকার আক্রমণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. গুদামে তাপমাত্রা যেন বেড়ে না যায় সে জন্য বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। গুদামে রক্ষিত

www.pathagar.com

দানার জলীয় অংশ কম রাখার জন্য বর্ষাকালে প্রয়োজন হলে ভুট্টাদানা কিছুদিন পরপর রোদে শুকাতে হবে।

মোজাইক রোগ

মোজাইক রোগ এক প্রকার ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণত আক্রান্ত গাছের পাতার শিরা বরাবর লম্বা লম্বা সরু বা চওড়া হলুদ দাগ বা স্ট্রাইপ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। এই রোগটির প্রকোপ চারা অবস্থায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. একই জমিতে বারবার ভুট্টা চাষ না করে শস্য পর্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

২. রোগ প্রতিরোধী জাতের ভুট্টার চাষ করতে হবে।

৩. খেতে আক্রমণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গাছ সরিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪. রোগের বাহক পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত যেকোনো কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

গম

পাতার মরিচা বা লিফ ব্লাস্ট :

এ রোগের কারণ হলো একধরনের ছত্রাক। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উপর ছোট ছোট গোলাকৃতি মরিচা রঙের দাগ পড়ে। ধীরে ধীরে এসব দাগের আকার বড় হতে থাকে, সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বাদামি রং ধারণ করে। এ অবস্থায় গাছের গায়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে মরিচার মতো দাগ লেগে যায়। আক্রমণ বেশি হলে এ দাগগুলো কাণ্ড এবং খোলেও দেখা যায়। বেশিদিন ধরে এ রোগের আক্রমণ চলতে থাকলে দাগগুলো কালো রং ধারণ করে। আক্রমণ ব্যাপক হলে পাতাগুলো দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং জমি পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগ সহ্য করতে পারে এমন জাত যেমন শতাব্দী, বিজয়, প্রদীপ, সুফী, সৌরভ চাষ করা।

২. সঠিক সময় জমিতে সার ও সেচ দেওয়া এবং আগাছা দমন করা।

৩. ভিটাবেক্স ২০০ (০.২৫% হারে) দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করা।

৪. আক্রান্ত জমিতে টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ফলিকুর (০.৫০%) ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. জমির ফসল ওঠার পর ফসলের অপ্রয়োজনীয় অংশ জমিতে পুড়িয়ে ফেলা।

লিফ ব্লাইট বা পাতা ঝলসানো রোগ

চারা অবস্থায় আক্রান্ত গাছের পাতায় প্রথমে হলুদ রঙের ডিম আকৃতির দাগ পড়ে। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড় হয়ে গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে এবং পুরো পাতা ঝলসে যায়। বয়স্ক গাছে আক্রমণ হলে পাতায় লম্বা ধরনের দাগ পড়ে। এসব দাগের মাঝের অংশ ধূসর রঙের হয় এবং চারপাশে একটি হলুদ আবরণ থাকে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে দাগগুলো বড় হতে থাকে। এ অবস্থায় পাতা শুকিয়ে যায় যা দূর থেকে আগুনে পোড়া বা ঝলসানো বলে মনে হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগ সহ্য করতে পারে এমন জাত যেমন শতাব্দী চাষ করতে হবে।

২. সঠিক সময় জমিতে সার ও সেচ দেওয়া এবং আগাছা দমন করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. ভিটাভেক্স ২০০ (০.২৫% হারে) দিয়ে বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে।

৪. আক্রান্ত জমিতে টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ফলিকুর (০.৫০%) ১৫ দিন পরপর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৫. জমির ফসল উঠার পর ফসলের অপ্রয়োজনীয় অংশ জমিতে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

বীজে কালো দাগ

একধরনের ছত্রাক দিয়ে এ রোগ হয়। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো বীজের ভ্রূণে কালো দাগ। ছত্রাকের আক্রমণে ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে এ দাগ সৃষ্টি হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. গম পাকার সময় যদি আকাশ মেঘলা থাকে অথবা কুয়াশা পড়ে সে অবস্থায় টিল্ট ২৫০ ইসি নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মিলি হিসেবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২. গম পাকার পর জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে।

বীজ ও গোড়া পচা

এ রোগের ফলে বীজে পচন ধরে, চারা ঝলসে যায় এবং গোড়া ও শিকড় পচে যায়। বীজ পচে যাওয়ায় জমিতে চারা গজানোর হার কমে যায়। চারা গজানোর পর গাছ আক্রান্ত হলে প্রথমে গাছটিতে হলুদ রং দেখা যায় এবং আস্তে আস্তে গাছটি মারা যায়। এ অবস্থায় টান দিলে গাছটি সহজেই মাটি হতে উঠে আসে। আক্রান্ত গাছটির গোড়া ভালোভাবে পরীক্ষা করলে গোড়ায় সাদা রঙের সরিষার দানার মতো ছত্রাকের আক্রমণ দেখা যায়। এসময় সমস্ত শিকড় পচে যায়, শিকড় ও কাণ্ডে কালচে বাদামি দাগ দেখতে পাওয়া যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুস্থ, সবল ও গজানোর হার ভালো এমন বীজ বপন করতে হবে।

২. বীজ শোধক যেমন ভিটাবেক্স ২০০ বা বেভিস্টিন (০.২৫% হারে) দিয়ে বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে।

৩. বেশি তাপমাত্রা ও বৃষ্টি হবে না এমন মৌসুমে (মার্চ-এপ্রিল) জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে।

লুজ স্মার্ট বা আলগা ঝুল

একধরনের ছত্রাক দিয়ে এ রোগ হয়। চারা অবস্থায় এই রোগের আক্রমণ বোঝা যায় না। গমের শিষ আসার সময় দেখা যায় যে, গমের শিষে ফুল ও বীজের পরিবর্তে সমস্ত শিষ কালো রঙের পাউডার দিয়ে ভর্তি থাকে যা দেখতে ঝুলের মতো দেখায়। জমিতে সুস্থ শিষ থেকে রোগাক্রান্ত শিষ আগে বের হয় বা পরবর্তীতে সুস্থ গাছকে আক্রমণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুস্থ জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করা। কোনো জমিতে শতকরা একভাগও যদি এ রোগ দেখা যায় তাহলে সে জমি হতে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না।

২. বীজ ৪ ঘণ্টা ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরে ৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রার পানিতে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে।

৩. জমিতে রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত শিষ আস্তে করে পলিথিন অথবা চটের ব্যাগে ভরে জমি থেকে তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

৪. ভিটাবেক্স ২০০ (০.২৫% হারে) দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

www.pathagar.com

গমের শিষ ঝলসানো বা দাগ রোগ

একধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের ফলে গমের শিষ কালো, কখনও-বা সাদা অথবা হাল্কা গোলাপি রঙের হয়ে যায়। শিষ বের হওয়ার প্রাথমিক অবস্থায় রোগের আক্রমণ হলে শিষে কোনো দানা হয় না এবং একটু দেরিতে হলে দানা কুঁচকে যায় ও ফলন অনেক কমে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

এ রোগ দমনের জন্য সুস্পষ্ট কোনো কার্যকর পদ্ধতি নেই। তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনার সাহায্যে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে।

১. জমিতে ফসলের অপ্রয়োজনীয় অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২. রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

৩. জমিতে বীজ বপনের পূর্বে ভিটাবেক্স ২০০ নামক ছত্রাক প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৪. গমের শিষ আসার ঠিক আগে এবং শিষ আসার পর আবহাওয়ায় বেশি আর্দ্রতা অথবা বৃষ্টির ভাব দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে এবং বেভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।

আলুর রোগবালাই

আলুর মড়ক/নাবি ধসা

ফাইটপথোরা ইনফেসটেনস নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। প্রথমে পাতা, ডগা ও কাণ্ডে কিছু অংশ ঘিরে ফেলে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যেই জমির অধিকাংশ ফসল আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ভোরের দিকে আক্রান্ত পাতার নিচে সাদা পাউডারের মতো ছত্রাক চোখে পড়ে। আক্রান্ত খেতে পোড়া পোড়া গন্ধ পাওয়া যায় এবং মনে হয় যেন জমির ফসল পুড়ে গেছে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২. আক্রান্ত জমিতে সেচ যথাসম্ভব বন্ধ করে দিতে হবে।

৩. রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিডোমিল (০.২%), ডাইথেন এম-৪৫ (০.২%) ইত্যাদি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত হারে ১০-১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

আগাম ধসা বা পাতার দাগ

অলটারনারিয়া সোলানাই নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। নিচের পাতায় ছোট ছোট বাদামি রঙের অল্প বসে যাওয়া কৌণিক দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশে সামান্য বাদামি এলাকার সাথে পর্যায়ক্রমে কালচে রঙের চক্রাকার দাগ পড়ে। পাতার বোঁটা ও কাণ্ডের দাগ অপেক্ষাকৃত লম্বা ধরনের হয়। গাছ হলদে হওয়া, পাতা ঝরে পড়া এবং অকালে গাছ মরে যাওয়া এ রোগের লক্ষণীয় উপসর্গ। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে গাঢ় বাদামি থেকে কালচে বসে যাওয়া দাগ পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুষম সার প্রয়োগ এবং সময়মতো সেচ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. রোগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর প্রয়োগ করতে হবে। ডাইথেন এম- ৪৫ ০.২% হারে প্রয়োগ করা যায়।

৩. আগাম জাতের আলু চাষ করতে হবে।

www.pathagar.com

ভারটিসিলিয়াম উইল্ট

ভারটিসিলিয়াম এলবএট্রাম জাতীয় ছত্রাক এই রোগের উৎস। রোগাক্রান্ত গাছ শুকিয়ে, হলুদ হয়ে অকালে মারা যায়। আক্রান্ত কাণ্ড কাটলে ভিতরে ধূসর বর্ণ দেখা যায়। টিউবারের উপরিভাগে চোখসমূহ গোলাপি ও ধূসর বর্ণের হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।

২. মাটি শোধন।

৩. ফসল পর্যায়।

স্টেম ক্যাঙ্কার স্কার্ফ রোগ

রাইজকটোনিয়া সোলানাই নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। গজানো অঙ্কুরের মাথায় এবং স্টোলনে আক্রমণের দাগ দেখা যায়। বড় গাছের গোড়ার দিকে লম্বা লালচে বর্ণের দাগ বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কাণ্ডের সঙ্গে ছোট ছোট টিউবার দেখা যায়। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে শক্ত কালচে এবং সুপ্ত রোগজীবাণুর গুটি দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. টেরক্লোর (PCNB) হেক্টরপ্রতি ১৫ কেজি মাত্রায় বীজ লাগানোর পূর্বে বীজনালায় প্রয়োগ করতে হবে।

২. ৩% বরিক এ্যাসিড দ্বারা বীজ শোধন বা স্প্রে যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

৩. বীজ আলু মাটির বেশি গভীরে রোপণ পরিহার করতে হবে।

৪. ভালোভাবে অঙ্কুরিত বীজ আলু রোপণ করতে হবে।

কাণ্ড পচা

স্কেলেরোসিয়াম রলফসি নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণের ফলে বাদামি দাগ কাণ্ডের গোড়া ছেয়ে ফেলে। গাছ ঢলে পড়ে এবং পাতা বিশেষ করে নিচের পাতা হলদে হয়ে যায়। আক্রান্ত অংশে বা আশপাশের মাটিতে ছত্রাকের সাদাসাদা জালিকা দেখা যায়। কিছুদিন পর সরিষার দানার মতো রোগ জীবাণুর গুটি বা স্কেলেরোসিয়া সৃষ্টি হয়। আলুর গা থেকে পানি বের হয় এবং পচন ধরে। ক্রমে আলু পচে নষ্ট হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আক্রান্ত গাছ কিছুটা মাটিসহ সরিয়ে ফেলতে হবে।

২. জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।

৩. জমিতে সব সময় জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

শুকনো পচা রোগ

ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। আলুর গায়ে কিছুটা গভীর কালো দাগ পড়ে। আলুর ভেতরে গর্ত হয়ে যায়। প্রথম পচন যদিও ভিজা থাকে পরে তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আক্রান্ত অংশে গোলাকার ভাঁজ এবং কখনও কখনও ঘোলাটে সাদা ছত্রাক জালিকা দেখা যায়।

www.pathagar.com

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আলু ভালোভাবে বাছাই করে সংরক্ষণ করতে হবে।

২. যথাযথ কিউরিং করে আলু গুদামজাত করতে হবে।

৩. ডাইথেন এম ৪৫ দ্রবণ ০.২% দ্বারা বীজ আলু শোধন করতে হবে।

৪. বস্তা, ঝুড়ি ও গুদামজাত আলু ৫% ফরমালিন দিয়ে শোধন করতে হবে।

৫. প্রতি কেজিতে ২ গ্রাম হিসেবে টেকটো ২% গুঁড়া দিয়ে আলু শোধন করতে হবে।

ঢলে পড়া এবং বাদামি পচন

সিউডোমোনাস সোলানেসিয়ারাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। গাছের একটি শাখা বা এক অংশ ঢলে পড়তে পারে। পাতা সাধারণত হলুদ হয় না এবং সবুজ অবস্থায়ই চুপসে ঢলে পড়ে। গোড়ার দিকে গাছের কাণ্ড ফেঁড়ে দেখলে বাদামি আক্রান্ত এলাকা দেখা যায়। ঢলে পড়া গাছ খুব দ্রুত চুপসে যায়।

আক্রান্ত আলু কাটলে ভিতরে বাদামি দাগ দেখা যায়। আলুর চোখে সাদা পুঁজের মতো দেখা যায় এবং আলু অল্প দিনের মধ্যে পচে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুস্থ রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২. আলু লাগানোর সময় প্রতি হেক্টরে ৮০-৯০ কেজি হারে স্ট্যাবল ব্লিচিং পাউডার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

৩. পরিমিত মাত্রায় সেচ প্রয়োগ এবং রোগ দেখা দিলে পানি সেচ বন্ধ করতে হবে।

আলুর দাদ রোগ

স্ট্রেপ্টোমাইসিস স্ক্যাবিজ নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। হালকা দাদ হলে টিউবারের উপরে উঁচু এবং ভাসা বিভিন্ন আকারের বাদামি দাগ পড়ে। রোগের গভীর দাদে গোলাকার গর্ত বা ডাবা দাগ পড়ে। রোগের আক্রমণ সাধারণত ত্বকেই সীমাবদ্ধ থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২. জমিতে বেশি মাত্রায় নাইট্রোজেন সার ব্যবহার বর্জন করতে হবে।

৩. ৩% বরিক এসিড দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

৪. জমিতে হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।

আলুর কালো পা/নরম পচা রোগ

আরউইনা কেরোটোফোরা ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত অংশের কোষ পচে যায়। পচা আলুতে এক ধরনের উগ্র গন্ধের সৃষ্টি হয়। চাপ দিলে আলু থেকে এক প্রকার দূষিত পানি বেরিয়ে আসে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২. অতিরিক্ত সেচ পরিহার করতে হবে।

৩. উচ্চ তাপ এড়ানোর জন্য আগাম চাষ করতে হবে।

www.pathagar.com

৪. ভালোভাবে বাছাই করে আলু সংরক্ষণ করতে হবে।

৫. ১% ব্লিচিং পাউডার অথবা ৩% বরিক অ্যাসিডের দ্রবণে টিউবার শোধন করে বীজ আলু সংরক্ষণ করতে হবে।

নরম পচা রোগাক্রান্ত আলুর কন্দ

পাতা মোড়ানো ভাইরাস

এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। আক্রান্ত গাছের পাতা খসখসে, খাড়া ও উপরের দিক মুড়ে যায়। আগার পাতার রং হাল্কা সবুজ হয়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। কখনও আক্রান্ত পাতার কিনারা লালচে বেগুনি রঙের হয়। গাছ খাটো হয় এবং সোজা হয়ে উপরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। আলুর সংখ্যা কমে যায় এবং আলু অনেক ছোট হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২. কীটনাশক (এজেড্রিন, নোভাক্রন, মেনোড্রিন ইত্যাদি) ২ মিলি অথবা ১ মিলি ডাইমেক্রন প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর জমিতে স্প্রে করতে হবে।

৩. আক্রান্ত গাছ টিউবারসহ তুলে ফেলতে হবে।

৪. রোগের বিস্তার রোধে মেলাথিন ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে ৭-১০ দিন পর পর জমিতে স্প্রে করে বাহক পোকা নিধন করতে হবে।

মৃদু মোজাইক

আলুর পাতা হলদে হয় ও তার উপরে বিভিন্ন বর্ণের দাগ পড়ে। পাতা কিছুটা কুঁকড়িয়ে গাছ খর্বাকৃতির হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

রোগমুক্ত বীজ আলু ব্যবহার এবং এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন আলুবীজ বপন ও জাব পোকা দমন করতে হবে।

রুগোজ মোজাইক

এই রোগে আক্রন্ত হলে গাছ বেটে হয়, পাতায় দাগ পড়ে, পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং পাতার মরা দাগ বেড়ে যায়। ফলে পাতা মরে ঝরে পড়ে ও গাছ অকালে মরে যায়।

প্রতিকার :

রোগমুক্ত বীজ আলু ব্যবহার এবং এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আলু বীজ বপন ও জাব পোকা দমন করতে হবে।

কমন স্কেব

শুধু টিউবারেই লক্ষণ প্রকাশ পায়। টিউবারের গায়ে বাদামি রঙের বসে যাওয়া, উঁচু অথবা খসখসে দাগ (দাদ) দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

ক. ফসল পর্যায়।

খ. শোধিত ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।

www.pathagar.com

গ. ক্ষারীয় মাটিতে আলুর আবাদ পরিহার ও জমিতে নিয়মিত ও পরিমিত সেচ।

রিং রট

আক্রান্ত গাছের পাতার রং ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। পাতা কুঁকড়ে কিনারা শুকিয়ে পরে মারা যায়। আক্রান্ত টিউবারের মাঝ বরাবর কাটলে কিনারা দিয়ে আংটির মতো কালো দাগ দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

ক. আস্ত বীজের টিউবার ব্যবহার করা।

খ. রোগমুক্ত বীজ খেতে লাগানো।

ভিতরের কালো দাগ

টিউবারের কেন্দ্র কালো বা নীলচে কালো রং ধারণ করে। অক্সিজেনের অধিক অভাব হলে সমস্ত টিউবারই কালো হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত অংশ সংকুচিত হয়ে ফেঁপে যেতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. উচ্চ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ না করা,

২. গুদামে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা।

অন্তর ফাঁপা রোগ

সাধারণত বড় বড় আলুর কেন্দ্রে অসম ফাঁপা অংশ সৃষ্টি হয়। পাশের কোষসমূহ খসখসে ও বাদামি বর্ণ ধারণ করে যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. কম দূরত্বে বপন।

২. সুষম সার ব্যবহার করা।

৩. নিয়মিত সেচ প্রদান করা।

অভ্যন্তরীণ কালো দাগ

ফসল তোলা বা পরিবহনের সময় থেতলে গেলে ১-৩ দিন পর থেতলানো চামড়ার ঠিক নিচেই নীল ধূসর থেকে কালো দাগ পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আঘাত থেকে আলুকে রক্ষা করতে হবে।

২. সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।

৩. সংরক্ষণের পূর্বে প্রিকুলিং করতে হবে।

৪. চামড়া পরিপক্ব হওয়ার পর আলু তুলতে হবে।

শিকড় ফোলা

বৃদ্ধি থেমে যায়, পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যায় ও ঢলে পড়ে, শিকড়ে গুটি দেখা যায়। টিউবারের আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা;

www.pathagar.com

২. ফসল পর্যায় অনুসরণ করা,
৩. বপনের পূর্বে হেক্টরপ্রতি ৪০ কেজি ফুরাডন প্রয়োগ করা।

সবজির রোগ

চারাধসা রোগ (Damping off)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয়

বেগুন, টমেটো, কপি, কুমড়াজাতীয় ফসল ইত্যাদি।

বীজতলায় বীজ ফেলার পর যখন তা গজাতে শুরু করে তখন থেকে চারাধসা রোগের আক্রমণ শুরু হয় আর তা চলতে থাকে মূল খেতে চারা রোপণ পর্যন্ত। অংকুরিত বীজে এ ছত্রাকের আক্রমণ শুরু হয়ে বীজপত্র, কাণ্ড এবং শেষে মূল বা শিকড় নষ্ট করে দেয়। চারাতে এ রোগ চেনার সহজ উপায় হলো, চারার গোড়ায় বাদামি জলবসা দাগ কাণ্ডকে ঘিরে থাকতে দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণে চারা প্রথমে হাল্‌কা সবুজ হয়ে ঢলে যায় এবং আক্রান্ত স্থান পচনের ফলে সম্পূর্ণ চারাটিই মরে যায়। বীজতলায় এটি সবচেয়ে মারাত্মক একটি রোগ। আক্রমণ শুরু হওয়ার ২-৪ দিনের মধ্যেই আক্রান্ত চারা পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রোগের জীবাণু মাটিতে থাকে এবং তা থেকে পরবর্তী মৌসুমেও রোগের বিস্তার ঘটাতে পারে। বীজ অংকুরিত হওয়ার পর চারা মাটির উপরে ওঠার আগেও এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. বীজতলায় ঘন করে বীজ না বোনা।
২. দীর্ঘ সময় ধরে ছায়া পায় এমন জায়গায় বীজতলা না করা।
৩. বীজতলায় বীজ ফেলার আগে মাটি ভালো করে চাষ দিয়ে রোদে কয়েকদিন শুকিয়ে নেওয়া এবং শেষ চাষের পর সম্ভব হলে বীজতলা সম্পূর্ণভাবে দু-চারদিন কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা।
৪. বীজতলায় শুকনো খড় পোড়ানো।
৫. নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো রাখা। বীজতলায় কখনও যেন পানি জমতে/দাঁড়াতে না পারে।
৬. পর্যাপ্ত জৈব সার (হেক্টরপ্রতি ১৫-২০ টন) জমি তৈরির সময় মেশানো।
৭. সম্ভব হলে জমি তৈরির সময় এক বোতল ফরমালিন ৫০ বোতল পানির সঙ্গে মিশিয়ে মাটি শোধন করে নেওয়া যেতে পারে। ফরমালিন মাটিতে দেওয়ার পর বীজতলার মাটি দু-একদিন পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।
৮. বাসামিড, ভিটাবেক্স ২০০, রিডোমিল গোল্ড ইত্যাদি প্রয়োগ করে বীজতলার মাটি শোধন করা যায়।
৯. বীজতলায় বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম হারে ভিটাভ্যাক্স ২০০ অথবা হোমাই ৮০ ডব্লিউ পি দ্বারা বীজ শোধন করে নেওয়া। এর পরিবর্তে এপ্রোন টি জেড ৭৯ এবং লিরোটেকট-এম ব্যবহার করা যায়। ৫১.৭° সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ৩০ মিনিট বীজ ডুবিয়ে রেখেও শোধন করা যায়।
১০. আক্রান্ত গাছ জমি থেকে তুলে ধ্বংস করতে হবে।
১১. ট্রাইকোডার্মা হারজিয়ানাম নামক ছত্রাক জীবাণু এ রোগ প্রতিরোধ করতে পারে বলে জানা গেছে। তাই, চারা রোপণের পূর্বে জমি তৈরির সময় মূল জমির মাটির সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা মিশিয়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

১২. বীজতলায় এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিলে বোর্দো মিশ্রণ (অনুপাত ৪ ৪ ৫০ চুন: তুঁতে পানি) প্রতি বর্গমিটারে এক গ্যালন হারে স্প্রে করা। চারা গজানোর পরপরই এই মিশ্রণ একবার স্প্রে করতে পারলে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়।

১৩. খেতে একবার এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে অন্তত দুবছর সেখানে বেগুন গোত্রীয় কোনো ফসল চাষ না করা।

ঢলে পড়া বা নেতানো রোগ (Wilt)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বেগুন, টমেটো, মরিচ, আলু, তামাক ইত্যাদি।

যেকোনো বয়সের গাছই খেতে গেলে অনেক সময় ঝিমিয়ে ঢলে যেতে দেখা যায়। বেগুন ও টমেটো চাষে এ এক দারুণ সমস্যা। এ রোগের প্রকোপ বেশি হলে সম্পূর্ণ খেতই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে গাছের কচি পাতা প্রথমে ঢলে পড়ে কিংবা নিচের বয়স্ক পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। শিকড়ের মাধ্যমে আক্রমণ শুরু হলেও পরে তা কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের জীবাণু গাছে মাটি থেকে টেনে তোলা পানি সঞ্চালনে বাধা দেয়, ফলে গাছ ঢলে পড়ে ও শেষে মারা যায়। ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত গাছের ডাল কেটে পানিতে রাখলে ব্যাকটেরিয়ার সাদা কষ বেরিয়ে আসে। পক্ষান্তরে ছত্রাক জীবাণু দ্বারা গাছ আক্রান্ত হলে প্রথমে গাছের অংশবিশেষ এবং কয়েকদিন পর সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়ে। আক্রান্ত কাণ্ডের ভেতরের অংশ বাদামি রং ধারণ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আইএসডি০০৬, বিএল০৯ এবং এসএ২০০০ জাত এ রোগ প্রতিরোধী। এ ছাড়া পুষা ক্রান্তি এবং মুক্তাকেশী এ রোগের প্রতি মোটামুটি সহনশীল। এ ছাড়া হাইব্রিড বিজয়, উৎসব, আনন্দ, হাসি, খুশি ইত্যাদি জাত ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী বলে জানা গেছে।

২. বীজতলায় বপনের পূর্বে বেডের উপরে ১৫ সেন্টিমিটার পুরু করে কাঠের গুঁড়া বিছিয়ে পুড়িয়ে দিলে জীবাণু নষ্ট হয়। জমি কাদা করে সপ্তাহখানেক পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখলে মাটি শোধন হয় ও ছত্রাক জীবাণু মারা যায়।

৩. রোগমুক্ত চারা উৎপাদন ও রোপণ করতে হবে। বীজতলায় বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে ৩-৫ টন/হেক্টর হারে মুরগির পচা বিষ্ঠা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া। মূল জমিতেও এভাবে মুরগির বিষ্ঠা দেওয়া যেতে পারে। ২৫০-৩০০ কেজি/হে. হারে সরিষা বা নিম খৈল এভাবে প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যায়।

৪. জমি আগাছামুক্ত রাখা। ঢলে পড়া চারা খেতে দেখা মাত্রই তুলে তা ধ্বংস করতে হবে।

৫. পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার ও পরিমিত ইউরিয়া ব্যবহার করা।

৬. জমি সবসময় আর্দ্র বা ভিজা না রাখা এবং নিকাশের ব্যবস্থা রাখা।

৭. বনবেগুন গাছের কাণ্ডের সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত জাতের জোড় কলম করে বেগুনের চাষ করলে ঢলে পড়া রোগ সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা যায়।

৮. চারা রোপণের পূর্বে মাটির সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা মিশিয়ে দিলে ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ কম হয়।

মোজাইক রোগ (Mosaic)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : টমেটো, শিম, বরবটি, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, পেঁপে ইত্যাদি।

গাছের যে কোনো বৃদ্ধি স্তরেই এ রোগ হতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে গাছ সবচেয়ে বেশি

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় বীজ গজানোর পর বীজপত্র হলুদ হয়ে যায় এবং পরে চারা নেতিয়ে পড়ে। বয়স্ক গাছে প্রথমে ডগার মাথায় কচি পাতায় এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণে পাতায় হলুদ সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইকের মতো দাগ দেখা যায়। দাগগুলো অসম আকারের। দ্রুত বড় হয়। শেষে দাগগুলো সম্পূর্ণ পাতাই ছেয়ে ফেলে। আক্রান্ত পাতা ছোট, বিকৃত, নিচের দিকে কোঁকড়ানো ও বিবর্ণ হয়ে যায়। এমনকি শিরা-উপশিরাও হলুদ হয়ে যায়। লতার পর্বমধ্য খাটো হয়ে আসে। ফলে গাছ খাটো হয়ে যায়। সাধারণত ফল ধরে না। ধরলেও কচি ফল খসখসে, ছোট ও ফুটকি দাগযুক্ত হয়। মাঝেমধ্যে ফলের রং সাদাও হয়ে যায়। ফুল কম আসে এবং অধিক আক্রমণে পাতা ও গাছ মরে যায়। *Myzus persicae* I *Aphis gossipii* প্রজাতির জাব পোকা দ্বারা এ ভাইরাস রোগ ছড়ায়। তবে বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। টমেটোর হলদে ভাইরাসের দুটি প্রজাতি আছে। একটি পাতার রং হলুদ করে, অন্যটি বেগুনি করে। অল্পবয়সী গাছ আক্রান্ত হলে ফল ধরার আগেই মারা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আক্রান্ত গাছ দেখলেই তা তুলে ধ্বংস করা।

২. খেতের আগাছা পরিষ্কার রাখা।

৩. খেতে বাহক পোকার উপস্থিতি দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে তা দমন করা।

৪. রোগাক্রান্ত গাছ থেকে কোনো বীজ সংগ্রহ ও ব্যবহার না করা।

ফল পচা ও কাণ্ড পচা রোগ (Fruit & stem rot)

যে সবজি আক্রান্ত হয় : বেগুন।

সাধারণত ফুল আসার সময় বেগুন গাছে এ রোগ দেখা যায়। এ রোগ হলে খেতে মধ্যে প্রথমে মাঝেমধ্যে দু-একটি করে গাছ ঢলে যেতে দেখা যায়। ঢলে পড়া গাছ টান দিয়ে শিকড়সহ তুলে ফেললে দেখা যায় মাটির সংযোগস্থলে গাছের কাণ্ড হঠাৎ সরু হয়ে গেছে। কাণ্ডের ছাল শুকিয়ে মরে ভেতরের কাঠ বেরিয়ে পড়ে। আক্রান্ত স্থানে গাঢ় বাদামি থেকে কালো ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পাতা ঝরে যেতে থাকে, এমনকি পাতা এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতায় চক্রাকার দাগ দেখা যায়। ধূসর বা বাদামি বৃত্তের এরূপ দাগের কেন্দ্রস্থল হালকা রঙের হয় এবং অসম একটি কালো রেখা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। আক্রান্ত পাতা ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে মারা যায়। পাতা থেকে বোঁটা, সেখান থেকে কাণ্ড ও শেষে ফলে আক্রমণ করে ও গোলাকার তালির মতো বাদামি রঙের ক্ষতের সৃষ্টি করে ফল পচিয়ে ফেলে। সাধারণত কচি ফলে আক্রমণ দেখা যায় না। বীজ ফলে আক্রমণ দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুস্থ ও রোগমুক্ত ভালো বীজ বপন করে চারা তৈরি করা।

২. প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম পরিমাণ ভিটাভক্স ২০০ এবং অল্প পানি মিশিয়ে বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নেওয়া। ৫০° সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ৩০ মিনিট বীজ ডুবিয়ে বীজ শোধন করে নেওয়া যায়।

৩. জমিতে যাতে পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা করা।

৪. প্রাথমিকভাবে দু-একটি গাছে সংক্রমণ শুরু হলে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে নেওয়া এবং সে সময় সেচ দেওয়া বন্ধ রাখা।

৫. বীজ-বেগুন পাকার একমাস আগে থেকে নোইন/ব্যাভিস্টিন স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

৬. একই জমিতে পর পর বেগুন অথবা বেগুন জাতীয় অন্যান্য সবজি যেমন টমেটো, আলু ইত্যাদি চাষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। একবার এ রোগের আক্রমণ হলে সেই খেতে পরপর তিনবার বেগুন চাষ না করা ভালো।

www.pathagar.com

৭. পুরোপুরিভাবে ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, পাতা, ডাল ইত্যাদি একত্র করে পুড়িয়ে ফেলা।

৮. বেগুন খেতের আশপাশে বেগুন গোত্রীয় কোনো আগাছা না রাখা।

৯. গাছের গোড়ার মাটিসহ ভালোভাবে ভিজিয়ে জমির সব কটি গাছে মাত্রানুযায়ী অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করা।

খুদে পাতা রোগ (Little leaf)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বেগুন, পুঁইশাক।

বেগুনের খুদে পাতা বা তুলসীপাতা রোগ কোনো কোনো খেতে মারাত্মক আকার ধারণ করে। সারা দেশেই কমবেশি এ রোগ দেখা যায়। জমিতে চারা রোপণের পর থেকে যেকোনো সময় বেগুন গাছ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এ রোগে আক্রান্ত হলে গাছ খাটো হয়ে যায়, কিন্তু অধিক হারে ডালপালা গজায়, শিকড় ও পাতা যে কোনো সুস্থ গাছের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। তবে এ রোগের অন্যতম শনাক্তকারী লক্ষণ হলো পাতাগুলো খুবই ছোট হয়ে যায় এবং গুচ্ছাকারে থাকে। পাতা আকারে প্রায় তুলসীপাতার মতো হয়ে যায় বলে একে 'তুলসীপাতা' রোগ বলে। গাছের পর্বমধ্য খাটো হওয়ায় গাছ আর লম্বা হতে পারে না। অধিক ডালপালা, গুচ্ছপাতা ও গাছের খাটো চেহারার জন্য ঝোপালো মনে হয়। সাধারণত এ রোগে আক্রান্ত গাছে কোনো ফুল-ফল ধরে না। গাছে ফুল ও ফল থাকলে তা বিকৃত হয়ে যায়। যদিও পত্রকক্ষে অসংখ্য কুঁড়ি দেখা যায় কিন্তু তা থেকে ফুল ও ফল হয় না। গাছে যদি কোনো ফল থাকে তাও ছোট হয় এবং শক্ত হয়ে যায়। সিসিটিস ফাইসিটিস নামক এক ধরনের জ্যাসিড এ রোগের জীবাণু বাহক। কিছু জাবপোকাও এ রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. খেতে প্রাথমিকভাবে এ রোগে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তা তুলে ধ্বংস করা।

২. চারা রোপণের পরপর এ রোগ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত চারা তুলে ফেলে জ্যাসিডপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

৩. চারা রোপণের সময় যদি চারার গোড়া টেট্রাসাইক্লিনের ১০০০ পিপিএম দ্রবণে চুবিয়ে রোপণ করা যায় এবং রোপণের পর ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত সপ্তাহে একবার এই দ্রবণ স্প্রে করা যায় তাহলে এ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা অনেক কম থাকে।

৪. এ রোগ সহনশীল জাতের বেগুন যেমন পুষা পার্পল রাউন্ড অথবা দেশি গোল জাতের বেগুন চাষ করা।

৫. আগাম চারা রোপণ করা। দেখা গেছে জুলাই বা আগস্ট মাসে রোপণকৃত চারার চেয়ে জুনের প্রথম দিকে রোপণকৃত চারায় এ রোগ কম হয়।

৬. কাঁটা বেগুন, তিতবেগুন ইত্যাদি আগাছা এবং টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদি এ বাহকের বিকল্প পোষক। অতএব খেতে এসব না রাখা।

আগাম ধসা (Early blight)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, টমেটো, আলু ও মরিচ।

যেকোনো বয়সের গাছেই আগাম ধসা রোগ হতে পারে। চারাতে যদি ক্ষতি করতে পারে তবে বর্ধনশীল বড় গাছেই রোগ বেশি দেখা যায়। মাটির উপরে গাছের সব অংশই এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। চারায় প্রথমে বীজপত্র গাঢ় রঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে। পরে তা কাণ্ড ও পাতায় যায়। শেষে চারা মরে যায়। চারা অবস্থায় এ রোগ হলে তাকে কলার রট (Coller rot) বা ঘাড় পচা রোগ বলে। কেননা, চারার গোড়া ও তার উপরে যে কোনো জায়গার কাণ্ডে এ দাগ ঘিরে ফেলে সেখান থেকে চারা পচিয়ে মেরে

www.pathagar.com

ফেলে। যদি চারা না মরে তবে তার বৃদ্ধি কমে যায় ও গাছ খাটো হয়ে যায়।

বয়স্ক গাছের পাতায় প্রথমে চাক চাক বলয়ের মতো গাঢ় বাদামি দাগ পড়ে। দাগগুলো পরে বড় হয়ে থাকে। একাধিক দাগ মিলে বড় বড় দাগের সৃষ্টি করে। পাতা হলদে হয়ে যায় ও পরে বাদামি হয়ে ঝরে পড়ে। বয়স্ক পাতায় প্রথমে এ লক্ষণ দেখা যায় ও পরে তা উপরের দিকে উঠতে থাকে। চরম আক্রমণে সম্পূর্ণ গাছই মরে যেতে পারে। টমেটো গাছে যখন ফল পাকতে শুরু হয় সাধারণত তখন এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়। ফল আক্রান্ত হলে পাকার আগেই তা ঝরে পড়ে। ফলেও অনুরূপ চাক চাক কোঁচকানো বাদামি থেকে কালো রঙের দাগ সৃষ্টি হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. যেখানে এ রোগ নিয়মিত ও বেশি হয় সেখানে রোপণ সময় পরিবর্তন করে সম্ভব হলে শুষ্ক মৌসুমে ঐসব ফসল চাষ করা।
২. রোগমুক্ত গাছ থেকে সংগৃহীত বা রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।
৩. বীজতলা ও মূল জমিতে নিকাশ ব্যবস্থা ভালো রাখা।
৪. শস্য পর্যায় অবলম্বন করা।
৫. ফল চূড়ান্তভাবে সংগ্রহের পরপরই সব গাছ ধ্বংস করে দেওয়া।
৬. পরিচর্যার সময় গাছে যেন কোনো ক্ষত সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।
৭. পাতা বেশি সময় ধরে ভেজা থাকলে এ রোগের জীবাণু বেশি অংকুরিত হওয়ার সুযোগ পায়। তাই ঝরনা সেচ না দেওয়া ভালো।
৮. মুড়ি ফসল, বিশেষ করে বেগুন ফসল না রাখা।
৯. সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক সঠিক নিয়মে স্প্রে করা।

নাবিধসা (Late blight)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : টমেটো, আলু।

যে কোনো বয়সের গাছে নাবিধসা রোগ হতে পারে। তবে ফুল আসার সময় সাধারণত আক্রমণ করে, বিশেষত জানুয়ারি মাসে। প্রথমে পাতায় ফ্যাকাশে সবুজ রঙের দাগ পড়ে এবং দ্রুত তা বাদামি রং ধারণ করে পুরো পাতাই ঝলসে দেয়। সাধারণত পাতার আগা ও কিনার থেকে এই ঝলসানো শুরু হয়। গোড়ার দিকের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আলুর কন্দও এ রোগে আক্রান্ত হয়। আলুর আক্রান্ত কন্দে এ রোগের জীবাণু সুপ্তাবস্থায় থেকে রোপণের পর গাছে আবার বিস্তার লাভ করে। টমেটোর কাণ্ড ও ফলেও এ রোগ ক্ষতি করে। কাণ্ড ও ফলে বাদামি দাগ পড়ে সে জায়গা ঝলসে যায়। আক্রান্ত ফল টিপ দিলে শক্ত মনে হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. রোগমুক্ত সুস্থ বীজ ও কন্দ বপন করা। সম্ভব হলে বীজ শোধন করে নেওয়া।
২. আক্রান্ত ফল ও গাছ তুলে ধ্বংস করা।
৩. আক্রান্ত খেত থেকে দেরি করে আলু তোলা। প্রথমে উপরের সব গাছ কেটে খেত থেকে সরিয়ে ফেলে ৭-১০ দিন জমিতে আলু রেখে দিয়ে পরে সেগুলো তোলা।
৪. অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। সুষম সার ও অধিক জৈব সার দিয়ে চাষ করা।
৫. ঘন করে চারা বা কন্দ রোপণ না করা।
৬. খেতে রোগের উপস্থিতি ও রোগ বিস্তারের অনুকূল অবস্থা থাকলে দ্রুত অনুমোদিত ছত্রাকনাশক সঠিক নিয়মে স্প্রে করা।

www.pathagar.com

ডাউনি মিলডিউ (Downy mildew)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, করলা, লাউ, শসা, ধুন্দুল, পটল, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি ।

গাছের পাতা এ রোগে আক্রান্ত হয় । আক্রান্ত পাতার উপরে সাদা বা হলদে থেকে বাদামি রঙের তালির মতো দাগ দেখা যায় । পাতার নিচের দিকেও অনুরূপ লক্ষণ দেখা যায় । বিবর্ণ হয়ে যাওয়া এসব দাগের ঠিক তলেই টোপ খাওয়া ছত্রাক এলাকা দেখা যায় । বর্ষাকাল বা আর্দ্র আবহাওয়ায় এরূপ দেখা যায় । মাঝের পাতাগুলো প্রথমে আক্রান্ত হয় । পরে ধীরে ধীরে অন্যান্য পাতায়ও এ রোগ বিস্তৃত হয় । আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত পাতা মরে যায় । এমনকি পুরো গাছই দুর্বল হয়ে যায় বা নেতিয়ে পড়ে । কচি পাতাগুলো বয়স্ক পাতার চেয়ে কম আক্রান্ত হয় । আক্রান্ত লতায় ফল ধরে কম আর ফল ধরলেও তার স্বাদ ভালো হয় না । কপি গাছের বীজতলার চারায় এবং রোপণের পরপরই চারাগাছে সাধারণত এ রোগ দেখা দেয় ।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. আগাম জাতের চাষ করলে এ রোগ কম হয় ।

২. সম্ভব হলে রোগাক্রান্ত ডগা ও পাতা ছিঁড়ে ধ্বংস করা ।

৩. প্রাথমিকভাবে প্রতি ১২ দিন অন্তর অনুমোদিত ছত্রাকনাশক আক্রান্ত গাছে স্প্রে করা । অনুমোদিত ছত্রাকনাশক আক্রান্ত খেতে নিয়মিতভাবে স্প্রে করলে নতুন সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না । কিন্তু আক্রান্ত পাতা ও ডগা স্প্রে করার আগে খেত থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত ।

৪. খেতের আশপাশ থেকে কুমড়া গোত্রীয় অন্যান্য সবজি বা বন্য সবজি গাছ থাকলে তা সরিয়ে ফেলা ।

৫. আক্রমণ খুব বেশি হলে খেত ভালো না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে একবার ১% বোর্দো মিশ্রণ বা অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায় ।

সাদাগুঁড়া রোগ (Powdery mildew)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয়: লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, করলা, শসা ইত্যাদি ।

এ রোগে আক্রান্ত হলে পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডার বা গুঁড়া দেখা যায় । ধীরে ধীরে এই দাগ বড় ও বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায় । কোনো একটি লতার পাতায় আক্রমণ বেশি হলে ধীরে ধীরে সেই লতা ও পরে পুরো গাছই মরে যেতে পারে । এ রোগে কচি কাণ্ড বা লতাও আক্রান্ত হতে পারে । পাতা ও কাণ্ড আক্রান্ত হলে লতাটি দুর্বল ও হলুদ হয়ে ধীরে ধীরে মরে যেতে পারে । অনেক সময় পাতার সম্পূর্ণ সবুজ অংশটিই সাদা গুঁড়ায় ঢেকে যায় । দাগ শুকিয়ে গেলে সেখানে আলপিনের মাথার মতো কালো কালো বিন্দু দেখা যায় । ফলের উপরেও সাদা গুঁড়া দাগ দেখা বিচিত্র নয় ।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. জমির আশপাশে কুমড়াজাতীয় অন্য যে কোনো রকমের সবজিচাষ থেকে বিরত থাকা ।

২. আগাম চাষ করে রোগের প্রকোপ কমানো ।

৩. আক্রান্ত পাতা বা গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা ।

৪. আক্রমণ বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১৫-৩০ কেজি গন্ধক চূর্ণ আক্রান্ত খেতের গাছে ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যেতে পারে ।

৫. সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করা ।

www.pathagar.com

অ্যানথ্রাকনোজ বা ফলপচা (Anthracnose)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : শিম, মরিচ ইত্যাদি।

কেবলমাত্র পরিপুষ্ট পাকা মরিচে এ রোগ দেখা যায়। মরিচের কাঁচা অবস্থা থেকেই রোগের সংক্রমণ শুরু ও লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাঁচা ও পাকা উভয় ফলেই আক্রমণ হতে পারে। তবে পাকা ফল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিণত ফলে প্রথমে ছোট গোলাকার জলবসা কালো দাগ পড়ে এবং দাগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দাগগুলো পরে কুঁচকে যায় ও গাঢ় রং ধারণ করে। অনেক সময় আক্রান্ত ফল বোঁটা থেকে খসে ঝরে পড়ে। বীজেও আক্রমণ ঘটে। এ ছাড়া কাণ্ড, পাতা এমনকি শিকড়েও এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পাতায় হলে ছোট, বৃত্তাকার বাদামি দাগ ও তার চারপাশে হলুদাভ বলয় দেখা যায়। আক্রান্ত বীজ থেকে পরে যে চারা হয় তাতেও এ রোগ হয়। ফলে দাগের কিনারা বরাবর চারপাশে কালো বেষ্টনী দেখা যায়। কিন্তু দাগের রং ফিকে হয়ে আসে ও এক সময় আক্রান্ত অংশ ছিঁড়ে যায়। অনেক সময় বীজ বেরিয়ে আসে। আক্রান্ত অংশ বরাবর ফল কাটলে আক্রান্ত খোসা বা দাগের নিচের পাশে অসংখ্য ছত্রাক আছারভুলি বা বীজাণু দেখা যায়। তীব্র আক্রমণে বীজের উপরে ছত্রাকসূত্রের আবরণ থাকে। এধরনের বীজ মরিচা রং ধারণ করে। খেত থেকেই এ রোগের শুরু হয় এবং তা তোলার সময় থেকে শুকানো ও সংরক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি ভালো দেখে ফল তোলার পর তা শুকানোর সময়েও এ রোগ দেখা যেতে পারে। আক্রান্ত গাছ ও তার অবশিষ্টাংশের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তৃত হয়। শিমের কাণ্ড, পাতা ও বীজ ফলে আক্রমণ দেখা যায়। শিম ও মরিচে রোগটি বীজবাহিত।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. এ রোগ একবার হলে সে জমিতে পরপর তিন বছর বেগুনজাতীয় কোনো ফসল চাষ না করা।

২. রোগমুক্ত ভালো বীজ ব্যবহার করা।

৩. রোগাক্রান্ত ফল ও গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। এমনকি ফসল সব তোলার পর গাছের অবশিষ্টাংশ জমিতেই পুড়িয়ে ফেলা।

৪. জমি সব সময় সুনিষ্কাশিত রাখা।

৫. ঝরনা দিয়ে গাছে পানি সেচ না দেওয়া।

৬. ফল পুরোপুরি না পাকিয়ে খেত থেকে তুলে নেওয়া।

৭. সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক আক্রমণের শুরুতেই প্রয়োগ করা। তবে মরিচের পরিণত ও পাকা ফলে না দেওয়া ভালো। তবে শিমের বীজ ফসলে অবশ্যই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে বীজ রোগমুক্ত রাখা উচিত।

শিকড় পচা (Root rot)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বেগুন ও টমেটো।

এ রোগের আক্রমণে আংশিক বা পুরো শিকড়ই পচে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হলো, মাটি বরাবর গাছের গোড়ায় প্রথমে সবুজাভ জলবসা দাগ দেখা যায়। পরে এই দাগ কাণ্ডকে ঘিরে ফেলে। ফলে গাছ নেতিয়ে পড়ে ও মারা যায়। খেতের যে জায়গায় এ রোগ প্রথম দেখা যায় সেখানে আশপাশের গাছেও তা ছড়িয়ে পড়ে এবং খেতে তালির মতো স্থানে স্থানে এরূপ লক্ষণ দেখা যায়। গোড়া থেকে ধীরে ধীরে শিকড়ে যায় এবং শিকড় পচে যায়। এ রোগ হলে মাঝেমধ্যে পাতায়ও তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। পাতায় অসম আকারের জলবসা দাগের সৃষ্টি হয় যা পরে হালকা বাদামি রং ধারণ করে। ফলেও অনেক সময় একই রকম লক্ষণ দেখা যায়। পচা শিকড় ও মাটিতে এ রোগের জীবাণু বাস করে এবং সেচ ও নিড়ানোর সময় তা অন্যান্য গাছে বিস্তৃত হয়।

www.pathagar.com

দমন ব্যবস্থাপনা

১. চাষের সময় মাটি ভালো করে উল্টেপাল্টে কয়েক দিন রোদে শুকানো।

২. পূর্ববর্তী ফসলের সমস্ত অবশিষ্টাংশ, আগাছা জমি থেকে সরিয়ে ফেলা।

৩. জমিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব সার দেওয়া।

৪. পরপর তিন বছর শস্য পর্যায় মানা।

৫. নিকাশ ব্যবস্থা ভালো রাখা।

৬. আক্রান্ত বা ঢলে পড়া গাছ জমি থেকে দ্রুত তুলে ধ্বংস করা।

৭. ট্রাইকোডার্মা জীবাণু এ রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

পাতা কোঁকড়ানো (Leaf curl)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : টমেটো, মরিচ, পেঁপে ইত্যাদি।

এ রোগের আক্রমণে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ও আকারে ছোট হয়। কাণ্ড বা ডালের গিঁট কাছাকাছি চলে আসে, ফলে গাছ খাটো হয়ে যায়। আক্রমণ খুব বেশি হলে গাছ অনেক সময় খাড়া ঝাঁটার মতো দেখায়। কচি ও আগার পাতা বেশি আক্রান্ত ও নষ্ট হয়। এজন্য ফুল ও ফল উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পাতার রং আর সবুজ থাকে না, হলদেটে ভাব ধারণ করে। কচি পাতা বেশি হলদে হয়। বয়স্ক পাতাগুলো একটু শক্ত ও মচমচে হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত গাছে বেশি ডালপালা গজায় বলে গাছ ঝোপালো হয়ে যায়। গাছের অংশবিশেষ বা পুরো গাছেই এ লক্ষণ দেখা যেতে পারে। গাছে যেসব ফল থাকে সেগুলো ছোট ও বিকৃত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে এ রোগ খেতের সব গাছেই ছড়িয়ে পড়ে এবং খেত নষ্ট করে। এই ভাইরাস জীবাণু গাছের রস বা বীজ দ্বারা বাহিত হয় না। তাই এক গাছ থেকে আর এক গাছে রোগ ছড়াতে হলে বাহকের দরকার হয়। সাদা মাছি বা হোয়াইট ফ্লাই নামক এক ধরনের পোকা এ রোগ ছড়ায়। এ পোকা যখন সুস্থ কোনো গাছে বসে রস খেয়ে অন্য গাছে পুনরায় রস চোষা শুরু করে তখন সেই গাছে ভাইরাস জীবাণু সংক্রমিত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. নিয়মিতভাবে খেত পরিদর্শন করে যদি উপরিউক্ত লক্ষণের কোনো গাছ দেখা যায় তবে তখনই তা উপড়ে নষ্ট করে ফেলা।

২. মরিচখেতের আশপাশে বা ভিতরে টমেটো, তামাক, পেঁপে ইত্যাদি গাছ রাখা যাবে না। কারণ এসব গাছ এ রোগের পোষক হিসেবে কাজ করে।

৩. প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকটি গাছে যদি এ রোগ দেখা যায় তাহলে তা তুলে ধ্বংস করা।

৪. খেতে বাহক পোকার উপস্থিতি থাকলে অন্যান্য সুস্থ গাছে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে এ রোগের বাহক পোকা দমন করা।

শিকড়ে গিঁট রোগ (Root knot)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বেগুন, ঢেঁড়শ, টমেটো, কুমড়া জাতীয় সবজি ইত্যাদি।

চারা অবস্থা থেকেই এ রোগ শুরু হয়। এ দেশের আবহাওয়ায় প্রায় সর্বত্রই সব মৌসুমে বেগুন গাছে কমবেশি এ রোগ দেখা যায়। কৃমিরা সাধারণত ভূপৃষ্ঠের ৬০ সেন্টিমিটার গভীরতার মধ্যেই থাকে। সেখান থেকে গাছের শিকড়ের মধ্য দিয়ে ঢুকে সেখান থেকে রস চুষে খেতে থাকে ও সে স্থান ফুলে শক্ত গিঁটের মতো হয়ে যায় (চিত্র ৩০)। এসব গিঁটের মধ্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে অনেক কৃমি দেখা যায়। এ রোগের অন্যতম লক্ষণ হলো ঢলে যাওয়া গাছ টেনে তুললে তার শিকড়ে অসংখ্য গিঁট দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ স্বাভাবিক গাছের তুলনায় কম বাড়ে, খাটো ও দুর্বল হয় এবং ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

হলদেটে হয়ে যায়। চারাগাছ আক্রান্ত হলে তার অধিকাংশ শিকড় নষ্ট হয়ে যায় ও গাছ ঢলে পড়ে। ফুল ও ফল ধারণ ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে অধিকাংশ সবজিতে এ রোগের ব্যাপক আক্রমণ দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. শুষ্ক মৌসুমে জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে রোদে শুকিয়ে নেওয়া। এতে কৃমি মরে যায়।

২. বেগুনচাষের পর ঐ জমিতে পুনরায় বেগুন চাষ না করে গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদি চাষ করা।

৩. জমি প্লাবিত করে রাখলেও এ রোগের জীবাণু বা কৃমি মরে যায়। তাই বছরে একবার সুযোগ থাকলে ধানচাষ করে জমি থেকে এদের মেরে ফেলা যেতে পারে।

৪. রোগমুক্ত চারা অর্থাৎ শিকড়ে কোনো গিঁট নেই এমন চারা রোপণ করা।

৫. ফসল সংগ্রহের পর সমস্ত অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলা।

৬. চিনাবাদাম ও গাঁদা ফুল ফসলের জমিতে চাষ করলে তা কৃমির জন্য ফাঁদ ফসল হিসেবে কাজ করতে পারে।

৭. রোগের লক্ষণ দেখা দিলে হেক্টরপ্রতি ৬০ কেজি হারে ফুরাডান ৫জি বা মিরাল ৩জি মাটিতে ছিটিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে সেচ দেওয়া।

৮. চারা রোপণের অন্তত ২০ দিন পূর্বে মাদা প্রতি ভালোভাবে পচানো নিম/সরিষার খৈল বা উত্তমরূপে পচানো মুরগির বিষ্ঠা ৭৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করলে কৃমির আক্রমণ কম হয়।

৯. নিমজাত কীটনাশক আরডি-৯ রেপিলিনের ৫% দ্রবণে বীজ শোধন বা রোপণের পূর্বে চারার গোড়া কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে জমিতে লাগালে এ কৃমির আক্রমণ কমে।

১০. জমি চাষের সময় নিশিন্দার কাঁচা পাতা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে কৃমির বংশ কমে যায়। মহুয়ার খৈল এভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে উপকার পাওয়া যায়।

কালো পচা (Black rot)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি।

চারা থেকে বয়স্ক সব স্তরের গাছেই এ রোগ হতে পারে। আক্রান্ত চারা গাছের পাতা হলদে হয়ে বড় হওয়ার আগেই তা ঝরে পড়ে। বয়স্ক গাছের পাতার কিনারা থেকে আকৃতির হয়ে দাগ ভেতরের দিকে আসতে থাকে। আস্তে আস্তে তা পাতার মধ্যশিরা ও কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দাগ বাদামি হয়ে যায় এবং পাতা শুকিয়ে মারা যায়। মধ্যশিরা ও অন্যান্য শিরা কাটলে তার ভিতরে কালো রঙের পচন দেখা যায়। এ রোগের ফলে কপির মাথা ছোট হয়ে যায় এবং নিচের দিকের পাতা খসে পড়তে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. শস্য পর্যায় অবলম্বন করা।

২. বিশ্বস্ত সূত্র থেকে বীজ কিনতে ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।

৩. বীজ বপনের পূর্বে ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার গরম পানিতে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রেখে বীজ শোধন করে নেওয়া।

৪. ঝরনা দিয়ে সেচ দেওয়া যাবে না। সকালে সেচ দেওয়া।

৫. আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। বিশেষ করে সরিষা গোত্রের আগাছা খেতে না রাখা।

৬. সর্বশেষে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করা।

www.pathagar.com

পাতার দাগপড়া রোগ (Leaf spot)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বেগুন, টমেটো, মরিচ, আলু, কপি ইত্যাদি।

সবজি গাছের পাতায় অনেক সময় নানা ধরনের দাগ দেখা যায়। প্রধানত ফুল আসার আগেই এসব দাগ বেশি দেখা যায়। মূলত দুটি ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। অল্টানেরিয়া দ্বারা যেসব পাতা আক্রান্ত হয় সেসব পাতায় বাদামি রঙের চক্রাকার দাগ পড়ে। দাগগুলো অসম আকারের হয়। দাগ দেখতে অনেকটা চাক চাক বা পরপর সাজানো কতগুলো বলয়ের মতো দেখা যায়। অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে অনেক সময় পাতার অনেকটা জায়গা নষ্ট করে ফেলে। অধিক আক্রমণে পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়। অনেক সময় এই দাগ ফলেও বিস্তৃত হয় এবং এতে ফল পুনর্গঠিত হওয়ার আগেই হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সারকোস্পোরা জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট দাগ গোলাকার বা চাক হয় না, কোনাকৃতি ছোট বড় অসম অনেক দাগ পাতায় পড়ে। দাগের মধ্যস্থল সাদা ও চারদিকে হলুদ বা বাদামি রঙের আভা থাকে। দাগের রং ধূসর থেকে বাদামি। অধিক আক্রমণে পাতা ঝরে যায়। পাতা ঝরে যাওয়ায় ফলনও কমে যায়। গাছের পরিত্যক্ত অংশ, বিকল্প পোষক বা আগাছা, বাতাস প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে। জমিতে পানি ও সারের অভাব হলে এ রোগ বাড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. সুষম সার ও সেচের ব্যবস্থা করা।

২. উপযুক্ত শস্য পর্যায় অবলম্বন করা।

৩. সময়মতো সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপণ করা।

৪. রোগ সহনশীল জাত যেমন পুসা পার্পল ক্লাস্টার, হাইব্রিড ব্লাক রাউন্ড ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

৫. রোগের প্রাথমিক অবস্থায় অনুমোদিত ছত্রাকনাশক গাছে ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করা।

কাণ্ড পচা (Stem rot)

যেসব সবজি আক্রান্ত হয় : বেগুন, শিম, গাজর, কপি, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

এ রোগ চেনার সহজ লক্ষণ হলো গাছের পাতা, বোঁটা ও কাণ্ডে নরম, জলজলা সাদাটে রঙের পচন। গাছের যেখানে এরূপ পচন হয় সে জায়গা থেকে উপরে আর খাদ্য ও পানি চলাচল করতে পারে না। ফলে উপরের অংশ মরে যায়। প্রথমে পাতায় সংক্রমণ শুরু হয়। পরে বোঁটা থেকে কাণ্ডে যায়। পচার পর যদি আর্দ্রতা বেশি থাকে তবে সেখানে সাদা তুলার মতো ছত্রাক সূত্র দেখা যায় যা এ রোগ শনাক্তের একটি অন্যতম উপায়। এসব ছত্রাকসূত্রের মধ্যে পরে সরিষা দানার মতো কালচে ছত্রাক বীজাণু বা স্পোর দেখা যায় যাকে বলে স্কেলোরোশিয়া। এর মধ্যেই এ রোগের জীবাণু সুপ্তাবস্থায় থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে অঙ্কুরিত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

১. শালগম, পিঁয়াজ, পালং, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল দিয়ে শস্য পর্যায় করা।

২. দুবছর পর পর ধানচাষের উপযোগী জমি হলে সেখানে এক মৌসুমে ধান চাষ করা। জমি ২৩-৪৫ দিন প্লাবিত করে রাখলে এ রোগের স্কেলোরোশিয়া মারা পড়ে।

৩. জমি গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি কয়েকদিন রোদে শুকানো। চাষের সময় জমিতে খড় পোড়ানো যেতে পারে।

৪. যেহেতু গাছের গোড়ায় ঝুলে থাকা পাতা মাটিতে লাগলে মাটি থেকে এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয় তাই গোড়ার পাতা পরিষ্কার করে দিলে উপকার হয়।

www.pathagar.com

৫. রোগ প্রবণতা থাকলে একটু বেশি দূরে দূরে চারা রোপণ করা।

৬. নালা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া।

৭. ট্রাইকোডার্মা ব্যবহার করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

৮. রোদে বীজতলা ও মূল জমির মাটি বীজ বপন বা চারা রোপণের আগে শোধন করে নিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

৯. ভিটাভ্যাক্স দ্বারা বীজ শোধন করে চারা তৈরি করলে গাছ কম মরে।

১০. সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা।

www.pathagar.com

গণমাধ্যমে কৃষিবিষয়ক সংবাদ ও অনুষ্ঠান

দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র কৃষিবিষয়ক বিশেষ পাতা বের করছে। তবে কিছু কিছু সংবাদপত্র কৃষিবিষয়ক পাতা বের করে কোনো ঘোষণা ছাড়াই তা বন্ধ করে দিয়েছে এরকম নজিরও আছে। বর্তমানে যেসব সংবাদপত্র নিয়মিত কৃষিপাতা বের করছে তার বিবরণ:

প্রথম আলো	ক্ষেত খামার	অর্ধপৃষ্ঠা, সপ্তাহে এক দিন, শনিবার
যুগান্তর	কৃষিকথা	অর্ধপৃষ্ঠা, সপ্তাহে এক দিন, শনিবার
নয়া দিগন্ত	চাষাবাদ	অর্ধপৃষ্ঠা, সপ্তাহে ১ দিন, শনিবার
কালের কণ্ঠ	চাষবাস	পূর্ণপৃষ্ঠা, সমন্বিত কৃষি, শনিবার
ইত্তেফাক	হৃদয়ের মাটি ও মানুষের কৃষি	পূর্ণপৃষ্ঠা, সমন্বিত কৃষি, রবিবার
যায়যায়দিন	কৃষি ও সম্ভাবনা	পূর্ণপৃষ্ঠা, সমন্বিত কৃষি, রবিবার
সংবাদ	সম্ভাবনা	পূর্ণ পৃষ্ঠা, বৃহত্তর কৃষি, মঙ্গলবার
জনকণ্ঠ	বিচিত্র বনৌষধি	অর্ধপৃষ্ঠা, বৃহত্তর কৃষি, রবিবার
সমকাল	ধনধান্য	অর্ধপৃষ্ঠা, বৃহত্তর কৃষি, মঙ্গলবার

কৃষিবিষয়ক বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা রয়েছে। প্রকাশনাগুলোও দৈনিকের মতো মাসিক কিংবা অর্ধবার্ষিকী, বার্ষিকী পর্যায়বৃত্ত আকারে বের হয়ে একসময় বন্ধ হয়ে যায়। হাতে গোনা যে কয়েকটি প্রকাশনা টিকে আছে তার বিবরণ:

কৃষিকথা	কৃষি তথ্য সার্ভিস	মাসিক, ৩২ পৃষ্ঠা সমন্বিত কৃষি
কৃষি সম্প্রসারণ বার্তা	কৃষি তথ্য সার্ভিস	মাসিক সংবাদ বুলেটিন

www.pathagar.com

নাম	প্রকাশক	মন্তব্য
কৃষিকথা	কৃষি তথ্য সার্ভিস	মাসিক, ৩২ পৃষ্ঠা সমন্বিত কৃষি
কৃষি সম্প্রসারণ বার্তা	কৃষি তথ্য সার্ভিস	মাসিক সংবাদ বুলেটিন
ফার্ম হাউজ	মসিউর রহমান, সভাপতি ও প্রকাশক	মাসিক ৫০ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন, সমন্বিত কৃষি
কৃষি বিপ্লব	মো. নুরুন্নবী, সম্পাদক ও প্রকাশক	পাক্ষিক ট্যাবলয়েড ৩২ পৃষ্ঠা সমন্বিত কৃষি
কৃষি সওগাত	কাজী শামসুল হুদা	পাক্ষিক ট্যাবলয়েড ৩২ পৃষ্ঠা, সমন্বিত কৃষি
কৃষি প্রযুক্তি	কৃষিবিদ মো. আবদুর রহমান	পাক্ষিক ট্যাবলয়েড ১২ পৃষ্ঠা, সমন্বিত কৃষি
মাটির কথা	কৃষিবিদ মো. কামরুল আহসান ভুঁইয়া	মাসিক ট্যাবলয়েড ১২ পৃষ্ঠা সমন্বিত কৃষি
কৃষি বিপ্লব	আলহাজ্জ মো. নূরুননবী	মাসিক ট্যাবলয়েড ৩২ পৃষ্ঠা, সমন্বিত কৃষি
ফলক	প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন	ত্রৈমাসিক, সমন্বিত কৃষি
উর্বরা	বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন	মাসিক ম্যাগাজিন ২৪ পৃষ্ঠা, সমন্বিত কৃষি
SAIC News Letter	সার্ক কৃষি কেন্দ্র	পাক্ষিক, ১২ পৃষ্ঠা সার্ক দেশের কৃষি
খামার বিচিত্রা	সম্পাদক এম. বদরুল আলম	মাসিক ৩৮ পৃষ্ঠা সমন্বিত কৃষি
কৃষি বার্তা	সম্পাদক মো. নুরুল হুদা আল মামুন	মাসিক ৩২ পৃষ্ঠা
ধান গবেষণা সমাচার	ব্রি (ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট)	সমন্বিত কৃষি ত্রৈমাসিক অনিয়মিত
বিএআরআই সংবাদ	বারি (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট)	শুধু ধান ত্রৈমাসিক মুখপত্র
কৃষি সমাচার	বিএডিসি	ধান ব্যতীত সব ফসল দ্বিমাসিক, বিভাগীয়
কৃষি বাংলা	কিশোর রায়	প্রকাশনা ফসল কৃষি মাসিক, সমন্বিত কৃষি

www.pathagar.com

এখনও গ্রামীণ জনগণ তথা কৃষকরা রেডিওকেই সবচেয়ে উপযোগী গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে ব্যবহার করে। রেডিওতে কৃষিবিষয়ক যে অনুষ্ঠানগুলো রয়েছে, সেগুলো হলো:

ঢাকা	দেশ আমার মাটি আমার	২৫ মিনিট	জাতীয় অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	০৫ মিনিট	জাতীয় অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	৩০ মিনিট	ঢাকার আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
	আমার দেশ	৩০ মিনিট	জাতীয় অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
	শস্যশ্যামল	৩০ মিনিট	মাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার
	সবুজ প্রান্তর	১০ মিনিট	সপ্তাহের প্রতি শুক্রবার
চট্টগ্রাম	কৃষি সমাচার	০৫ মিনিট	চট্টগ্রামের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, গ্রষ্মী/শীতকালীন
	কৃষি খামার	৩০ মিনিট	চট্টগ্রামের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
খুলনা	কৃষি সমাচার	০৫ মিনিট	খুলনার আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, গ্রষ্মী/শীতকালীন
	চাষাবাদ	৪০ মিনিট	খুলনার আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
রংপুর	কৃষি সমাচার	৫ মিনিট	রংপুরের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, গ্রষ্মী/শীতকালীন
	ক্ষেতে খামারে	৩০ মিনিট	রংপুরের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	০৫ মিনিট	রাজশাহীর আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, গ্রষ্মী/শীতকালীন
	সবুজ বাংলা	৪০ মিনিট	রাজশাহীর আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	০৫ মিনিট	সিলেটের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, গ্রীষ্ম/শীতকালীন
	শ্যামল সিলেট	৪০ মিনিট	সিলেটের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, সপ্তাহে ৬দিন
রাঙামাটি	খামারবাড়ি	১০ মিনিট	পার্বত্য এলাকার আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, প্রতিদিন
বরিশাল	কৃষিকথা	২০ মিনিট	বরিশালের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৫ দিন
বান্দরবান	কৃষিকথা	২০ মিনিট	পার্বত্য এলাকার আঞ্চলিক অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৪ দিন
কক্সবাজার	সোনালি	২০ মিনিট	কক্সবাজারের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৪ দিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	২৫ মিনিট	ঠাকুরগাঁওয়ের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৪ দিন
কুমিল্লা	সুজলা সুফলা	১০ মিনিট	কুমিল্লার আঞ্চলিক অনুষ্ঠান সপ্তাহে ৬ দিন
কৃষি রেডিও	বিভিন্ন নামে	৮ ঘণ্টা	বরগুনা জেলার আমতলিতে এফএম ৯৮.৮ মেগাহার্জে, প্রতিদিন তিন বেলা

www.pathagar.com

প্রতিদিন সমন্বিতভাবে গড়ে সাড়ে ১২ ঘণ্টার বেশি সময় রেডিওতে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে। একমাত্র এফএম রেডিও-রেডিও টুডে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে পৌনে ৮টা পর্যন্ত ৩০ মিনিটের কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান গ্রিনআওয়ার নামে সম্প্রচার করে। আর কমিউনিটি রেডিওর আওতায় ১৪টি রেডিও গ্রামীণ কৃষকের কথাই বেশি বলে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত টেরেস্টেরিয়াল চ্যানেল বিটিভি এবং অন্যান্য স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে :

বাংলাদেশ টেলিভিশন	মাটি ও মানুষ	২২-২৫ মিনিট	সপ্তাহে ৫ দিন
	বাংলার কৃষি	১৫ মিনিট	প্রতিদিন
	সার্ক কৃষি	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
	কৃষি দিবানিশি	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
চ্যানেল আই	হৃদয়ে মাটি ও মানুষ	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
	হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
বাংলাভিশন	শ্যামল বাংলা	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
জিটিভি	সবুজ বাংলা	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
এটিএন বাংলা	সোনালি দিন	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
বৈশাখী টিভি	কৃষি ও জীবন	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
মাইটিভি	খামারবাড়ি	২২-২৫ মিনিট	সাপ্তাহিক
দীপ্ত টিভি	দীপ্ত কৃষি	প্রায় ২৫ মিনিট	সপ্তাহে ৫ দিন

www.pathagar.com

সোর্স ও রেফারেন্স

কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর-অধিদপ্তরগুলো হলো

- ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ০৯১-৬৭৩৩৩
- ভাইস চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলানগর, ঢাকা ৯১১১৬১০
- ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর ৯২০৫৩৩৬
- ভাইস চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। ০৮২১-২৮৬০৩৫১
- ভাইস চ্যান্সেলর, ভেটেনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ০৩১-২৫৬৬৩৭৫
- ভাইস চ্যান্সেলর, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী ০৪৪২৭-৫৬১১৩
- ভাইস চ্যান্সেলর, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর ০৫৩১-৬১৩২২
- ভাইস চ্যান্সেলর, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী ০১৭১১৫৩০৫৮০
- নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা ৯১৩৫৫৮৭
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষিভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা ৯৫৬৪৩৫৮
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো), মহাকাশ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প কর্পোরেশন, চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা ৭১৬২০০১
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, চট্টগ্রাম ০৩১-৬৮২৭১২

www.pathagar.com

- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, রাজশাহী ০৭২১-৭৭৬২৮৩
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্পারসো, ঢাকা ৯১৩১৭৪১
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা ৯৫৬১০৬৬
- মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা ৯১৪০৮৫৭
- মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, খিলগাঁও, ঢাকা
- নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ি, ঢাকা ৮১১৭৭২৮
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। ৯২৫২৭১৫
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, গাজিপুর ৯২৫২৭৩৬
- প্রতিনিধি, ইরি, বাংলাদেশ হাউজ ০৯, রোড-২/২, চেয়ারম্যানবাড়ি, বনানী, ঢাকা ৯৮৯৭০৪৪
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, শেরেবাংলানগর, ঢাকা ৯১১০৮৬৮
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঈশ্বরদি, পাবনা ০৭৩২৬-৬৩৬২৮
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ ০৯১-৬৭৮৩৪
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট, সাভার, ঢাকা ৭৭৯১৬৭৬
- মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা ৮১১৫৫৩২
- মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ৯৫৬২৮৬১
- মহাপরিচালক, মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ ০৯১-৬৫৮৭৪
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কারওয়ানবাজার, ঢাকা ৯১১৫৩৭৬
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা ০৮১-৬০৬০০
- মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া ০৫১-৭৮৬০৩
- মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা ৯১২৭৮৮২
- মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ভবন ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা ৯৩৩৪১১০
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, নাজিম উদ্দিন রোড, ঢাকা ৮৬৫১০৮৩
- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ৯৫৫২১৯৪
- প্রধান বন সংরক্ষক, বনভবন, শেরেবাংলানগর, ঢাকা ৮১১৮৬৭১

www.pathagar.com

- প্রধান বৃক্ষ পালনবিদ, আরবরিকালচার, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা ৯৫৬৯৩১০
- প্রধান বৃক্ষ পালনবিদ, আরবরিকালচার, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ঢাকা ৮০৩২৯৮৫
- প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, ঢাকা ৭১৬১০৯১
- পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, জয়দেবপুর, গাজীপুর ৯২৫২০৩৩
- পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা দৃষ্টি আকর্ষণ: ৮১২৩১৪৭
- পরিচালক, খাদ্যশস্য উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ৯১১৭০৩০
- পরিচালক, প্রশিক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ৮১২৩৬৩৯
- পরিচালক, অর্থকরী ফসল উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ৮১১৭৩২৮
- পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ৯১৩১২৯৫
- পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা ৮১১৬৬৩৪
- নির্বাহী পরিচালক, কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট (সার্ডি), জয়দেবপুর, গাজীপুর ৯২৫২১৮৩
- নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বোর্ড, সেচভবন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা ৮১১০৭৯৮
- নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী ০৭২১-৭৬০৫০৯
- পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ঢাকা ৯১১২২৬০
- পরিচালক, মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা। ৯১১৩৩৬৩
- পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা। ৯১১৪৩১০
- পরিচালক, কৃষিবিষয়ক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা ৯১২৯৭৬৫
- পরিচালক, সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র, বিএআরসি ক্যাম্পাস, ফার্মগেট, ঢাকা ৯১২৭৪০৭
- পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম ০৩১-৬৮১৫৭৭
- পরিচালক, চা গবেষণা ইন্সটিটিউট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভিবাজার ০৮৬২৬-৭১২২৫
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, সেচভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা ৯১২৫১৮১
- অতিরিক্ত পরিচালক, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ৮১৩০৩৫৭
- নির্বাহী পরিচালক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, লালমাটিয়া, রোড নং ৫/৫, ব্লক সি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

www.pathagar.com

- উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা ৭১৬৯৪৫৪
- সভাপতি, বাংলাদেশ সিড গ্রোয়ার্স ডিলার অ্যান্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, ঢাকা ৮৬১৯৫২১
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা ৯৫১৫২৩০
- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা ৮৮৯৬৩৬

কৃষিবিষয়ক সাংবাদিকতার কিছু অনলাইন সূত্র (ওয়েবলিংক)

বর্তমান ইলেক্ট্রনিক যুগে কৃষিতে অনেক বিভাগ সংস্থা বিভাগ প্রায় সবাই নিজেদের ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করছেন। দেশবিদেশের সংশ্লিষ্ট আগ্রহীরা এসব ওয়েবপেজ ভিজিট করে উপকার পাচ্ছেন। কৃষিভিত্তিক এসব ওয়েবপেজ সার্বক্ষণিক ইলেক্ট্রনিক সার্ভিস দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এগুলো হলো—

- কৃষি মন্ত্রণালয় বেশ সমৃদ্ধ একটি ওয়েব তৈরি করেছেন। সেটি হলো— www.moa.gov.bd
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যপ্রবাহের ফোকাল পয়েন্ট কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইট: www.ais.gov.bd (dirais@ais.gov.bd)
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের আছে ৯৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ AICC (Agriculture Information and Communication Centre)
- দেশের বৃহত্তম কৃষি সম্প্রসারণ সেবা অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট: www.dae.gov.bd
- উন্নয়ন ও সেবা প্রদানকারী সংস্থা (বিএডিসি)-র ওয়েবসাইট: www.badc.gov.bd
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট BRRI-র আছে পূর্ণাঙ্গ ওয়েবপেজ: www.brri.gov.bd, তাদের আরেকটি সহায়ক ওয়েবপেজ আছে: www.knowledgebank-brri.org যা কিনা Bangladesh Rice Knowledge Bank নামেও পরিচিত।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান BARI-র ওয়েবসাইট: www.bari.gov.bd
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান BSRI নিয়ন্ত্রিত ওয়েবসাইট: www.bsri.gov.bd
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা প্রতিষ্ঠান BJRI-র ওয়েবসাইট: www.bjri.gov.bd
- SRDI পরিচালিত ওয়েবপেজ: www.srdi.gov.bd
- এ ছাড়া কৃষিসংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের আছে বিভিন্ন আইসিটিভিত্তিক সেবাকেন্দ্র। এগুলোর মধ্যে আছে ডিএই-র FIAC (Farmer's Information and Advising Centre), মৎস্য অধিদপ্তরের FICC (Fisheries Information and Communication Centre)। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবপেজ: www.dls.gov.bd

www.pathagar.com

- প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউটের ওয়েবপেজ: www.blri.gov.bd
- মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবপেজ: www.dof.gov.bd
- মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইট: www.fri.gov.bd
- বন গবেষণা ইন্সটিটিউটের ওয়েবসাইট: www.bfri.gov.bd
- বাংলাদেশের অনেকগুলো ইউনিয়ন পরিষদে Union Information and Service Centers-UISCs খোলা হয়েছে। তা ছাড়া আছে D-net এর Pallitathya Kendras, telecenters, multimedia classrooms and CLCs।

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অঙ্কুরোদগম ৩৮, ৩৯
অণুজীব ৪২, ৪৮
অনিবাসী ২২
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১৪৮
অভিমত সাক্ষাৎকার ১৭২
অভিযোজন ১০২, ১১১

আইলা ৯৬
আউট অব ভিশন ১৬৫
আওয়ার গ্লাস কাঠামো ১৫৩, ১৫৪
আচরণবিধি ৩, ৫
আলোর ফাঁদ ৪৪

অ্যাকশন ১৪৯
অ্যানিমেটেড গ্রাফিক্স ১৫১
অ্যাস্টন ১৬৭
অ্যাম্বুশ ইন্টারভিউ ৫

ইন ভিশন ১৬৫
ইনসার্ট ১৬৭

উচ্চফলনশীল ১৩৭
উৎপাদনশীলতা ১১, ৬১, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১১১, ১১৭, ১২০
উপখাত ১৪
উভ ১৬৪, ১৬৫
উল্টোপিরামিড কাঠামো ১৪২, ১৫৩, ১৫৪
উষ্ণায়ন ৯৪, ১৩৩

এনজিও ৫৭-৬০, ৮০, ১১৮, ১৪১
এডাব্লিউডি ৪৮
এফএও ১৮
এলসিসি ৪৮
এসএমই ২৩

ওপেনিং স্টিং ১৬৫

কপিরাইট ৮২, ৮৭, ৮৮
কপি সম্পাদনা ১৫৭
কমিউনিটি রেডিও ১৫১
কম্পোস্ট ২৩
কল সাইন ১৬৭
কাকতাড়ুয়া ৩৮
কাট-অ্যাওয়ে ১৬৭
কীটনাশক ৩০, ৪২, ৯৩
কৃষিখাত ১৪, ৩০, ৯৫
কৃষিখাত: সরকারি ব্যবস্থাপনা কাঠামো ২৯
কৃষিনীতি ৬৮, ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৮
কৃষিবাজার ৭৪, ১৩২
কৃষিপ্রযুক্তি ৩৭
কৃষকের শ্রেণিবিভাগ ৩১
কোটেশন ১৫২
ক্রু ২
ক্লোজিং স্টিং ১৬৫
ক্লোজিং হেডলাইন ১৬৫
কৌলিতাত্ত্বিক ১১৪
ক্রিসমাস ট্রি কাঠামো ১৫৩, ১৫৬
ক্ষুদ্রঋণ ৫৯, ৬১
ক্ষুদ্র কৃষক ৩১

খরিপ ৩৪
খামার ২০
খাদ্যানিরাপত্তা ১১, ১৯, ৫২, ৬২, ৯৭
খোরাকি কৃষি ৩৪

গভীর প্রতিবেদন ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭
গ্রিন হাউজ ৪৯, ৯৩

www.pathagar.com

গোপন ক্যামেরা ৫
গোল্ডেন রাইস ৪৯, ৫০

জলাশয় ১৬, ১৭
জলবায়ু পরিবর্তন ৩৪, ৫৯, ৯১, ৯২, ১১৩
জাম্প কাট ১৬৭
জিডিপি ২১, ২৭
জিএম ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ১০৭
জিন প্রকৌশল ৪২, ৪৫, ৪৬
জিনপ্রযুক্তি ৯৮
জীবিকাকেন্দ্রিক ৫৮
জীবপ্রযুক্তি ৪১
জীববৈচিত্র্য ৪২, ৫৩, ১০৬, ১১১, ১১২
জৈব ২৪, ৩৭, ৯৮
জৈবসার ১৫, ১৬, ২৩, ২৪, ৪২, ১২০
জ্বালানি ১৬, ৯৩

টিস্যু কালচার ৪২

ডিএনএ ৪১, ৪৩, ৪৫
ডেড শট ১৪৯
ডেল্টা ২৪

তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি ১১৬
তাৎক্ষণিকতা ২

দুর্যোগ ৫৯, ৬১, ৯৪
দারিদ্র্য ৫৭

নার্সারি ১৮, ২০, ৭১
নারী-কৃষক ৬৬
নৈকট্য ৩
ন্যাচারাল সাউন্ড ১৪৮

পরাগায়ন ৪৩
পরিবর্ধন ৯২, ১১৯
পরিবেশবান্ধব ৩৭
পার্চিং ৪৩
পিটিসি ১৬৬
প্রক্রিয়াজাতকরণ ১৭, ২১, ২৫, ৩০,
৬২, ৬৫, ৬৭, ১৬৮
প্রবৃদ্ধি ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ৮০
প্রশমন ৬১, ৯৭
প্রান্তিক কৃষক ৩১
প্রাণিসম্পদ ১৩২
প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ১২৫

পেটেন্ট ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮
পে অফ ১৬৭
প্যাকেজ ১৬৫
প্যাকেজ গ্রাফিক্স ১৬৭
প্যাকেজ প্রতিবেদন ১৫০

ফটোগ্রাফি ১৪৯
ফলোআপ প্রতিবেদন ১৪৯
ফসল পঞ্জিকা ৩২
ফুটেজ ১৪৯
ফিচার ১৪০, ১৪৪, ১৪৫
ফোনো ১৬৭
ফোন-ইন ১৬৭

বড় কৃষক ৩১
বাণিজ্যের কৃষি ৩৪
বাণিজ্যনীতি ৭৯
বাম্পার ফলন ১৪৯
বায়ুমণ্ডল ৯২
বিপণন ৩০, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ১১২, ১৩৩, ১৬৮
বর্গাচাষি ১২
বিট ১৭০
বিটি ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৩
বীজতলা ৩৭, ৩৮, ৩৯
বীজনীতি ২৮
বায়োপ্লান্ট ১৬
বুলেটিন ১, ১৪৭, ১৫১, ১৬৪
ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার ১৭২

ভক্সপপ ১৬৬
ভয়েস ওভার ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬
ভর্তুকি ১৩৩
ভাসমান সবজি ৪২
ভূমিহীন কৃষক ৩১
ভোক্তা ১১, ৩০
ভ্যালু চেইন ২৯, ৩০, ৬৭

মরুময়তা ৯৩
মাটি ও মানুষ ১৬৯
মানবাধিকারকেন্দ্রিক ৫৮
মাস্টার শট ১৪৭
মিড শট ১৪৭
মিঠাপানি ৯৩, ৯৬
মিথ্যাআলো ৫

www.pathagar.com

মেধাস্বত্ব ৮১, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৮৯
মৌসুম ৩৪

যান্ত্রিকীকরণ ১১৫, ১২১, ১২৬

রবি ৩৪
রানিং অর্ডার/রান ডাউন ১৬৮
রাশ ফুটেজ ১৬৮

লবণাক্ততা ১৫, ৪২, ১১৩
লাইভ ১৬৭
লাগসই ৩৭, ১০৩
লার্ভা ২০
লিংক ১৬৫
লিফ কালার চার্ট ১৫০
লোকেশন ১৫২
লোনাপানি ৯৬

শট লিস্ট ১৬৭
শপিং লিস্ট ১৬৭
শিল্প ৩০
শোধন ৩৯
শ্রমশক্তি ১৩, ৩১, ৬৬

সংকরায়ন ৪১, ৪৭, ৪৭
সংবাদ সাক্ষাৎকার ১৭২
সম্প্রচার ১৪৭, ১৫০, ১৫৭
সম্প্রসারণ ২৫, ২৮, ১০২, ১০৫, ১০৮, ১১৬, ১২৩, ১১৬
সুষম সার ১৫
সহনশীল ৯৭, ৯৮
সাক্ষাৎকার ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬
সাদামাটা প্রতিবেদন ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৭
সারফেইস ১৬৫, ১৬৭
সিঙ্ক ১৬৪, ১৬৫
সিডর ৯৬
স্ক্রিপ্ট ১৫১, ১৫২, ১৫৩
সেচ ১৫, ৪১
সেটআপ শট ১৬৭
সৌর টেবিল ৩৯
স্টুডিও লাইভ ১৬৭
স্লাগ ১৬৮

হাইড্রোপনিক ৪০
হাইব্রিড ২৭, ৩৪, ৪৮, ৪৯, ১০৫, ১১৪, ১৩৭, ১৪৮
হিমাগার ১৩৮
হীরক কাঠামো ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬
হেডলাইন ১৬৫
হ্যাচারি ১৮, ১৯, ২০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদক পরিচিতি

আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান। তিনি এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। এই বিভাগ প্রতিষ্ঠার আগে তিনি কানাডার সাইমন ফ্রেইজার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কমিউনিকেশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে বিএ (সম্মান) ও এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়েছেন। তারপর কৃতিত্বের সঙ্গে কানাডার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগ বিষয়ে এমএ এবং একই বিষয়ে সাইমন ফ্রেইজার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি গণমাধ্যম বিষয়ে দেশি-বিদেশি জার্নালে অনেক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ২০১৪ সালে পেলগ্রেইভ ম্যাকমিলান প্রকাশিত তার 'Internet Governance and the Global South' বইটি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। তিনি বিভিন্ন টেলিভিশনের চ্যানেলে নিয়মিত রাজনৈতিক ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ করেন। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার-এ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও গণমাধ্যম ইস্যুতে নিয়মিত কলাম লেখেন। শিক্ষকতায় আসার আগে তিনি দ্য নিউ নেশন, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস ও বাসস-এ সাংবাদিকতা করেছেন।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

অজয় দাশগুপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে দৈনিক সমকালে সহযোগী সম্পাদক ও সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেন।

আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক, চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে কানাডার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণমাধ্যম ও গণযোগাযোগ বিষয়ে এমএ এবং একই বিষয়ে সাইমন ফ্রেইজার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে *Internet Governance and the Global South* (২০১৪) উল্লেখযোগ্য।

মো. জাহাঙ্গীর আলম

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃষিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। পরবর্তীতে মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন-এ পিএইচডি করেন। বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি তথ্য সার্ভিস-এ উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রকাশিত মাসিক কৃষি ম্যাগাজিন 'কৃষিকথা'র সমন্বয়কারীর দায়িত্বও পালন করছেন।

প্রয়াস রায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে তিনি বর্তমানে একই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন।

ফাহমিদুল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে একই বিভাগে কর্মরত আছেন। তিনি ২০১০ সালে ইউনিভার্সিটি সায়েন্স মালয়েশিয়া থেকে চলচ্চিত্র অধ্যয়ন বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে অসম্মতি উৎপাদন : গণমাধ্যম বিষয়ক প্রতিভাবনা (২০১১), মিডিয়া সমাজ সংস্কৃতি (২০১৩) উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

মীর মাসরুর জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে চ্যানেল আই-এ বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। গণমাধ্যম উন্নয়ন সংগঠন সমষ্টি'র পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। মীর মাসরুর জামান সাংবাদিকতা এবং যোগাযোগ বিষয়ে একজন নিয়মিত প্রশিক্ষক। সাংবাদিকতা বিষয়ে তার গ্রন্থগুলোর মধ্যে তৃণমূল সাংবাদিকতা: ধারণা ও কলাকৌশল (২০০১), মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন ও ফিচার (২০০৩), জনসাংবাদিকতা: স্বরূপ পদ্ধতি (২০০৪) এবং কৃষি ও গণমাধ্যম নির্দেশিকা (২০১৫) উল্লেখযোগ্য।

মীর সাহিদুল আলম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে পরিচালক (অনুষ্ঠান) হিসেবে সমষ্টিতে কর্মরত আছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রিপোর্টিং : প্রসঙ্গ সুশাসন (২০০৫), গণমাধ্যম সহায়িকা: জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়ন ২০১৪, কৃষি ও গণমাধ্যম নির্দেশিকা (২০১৫), গণমাধ্যম সহায়িকা : নারী কৃষকের অধিকার ও স্বীকৃতি (২০১৬) উল্লেখযোগ্য।

রিয়াজ আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে তিনি বর্তমানে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর হিসেবে দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় কর্মরত আছেন।

মো. রেজাউল হক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে পরিচালক (গবেষণা ও যোগাযোগ) হিসেবে সমষ্টিতে কর্মরত আছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে গণমাধ্যম সহায়িকা : নারী কৃষকদের অধিকার ও স্বীকৃতি (২০১৬) উল্লেখযোগ্য।

মো. শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক এবং কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি পরবর্তীতে উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন (জীবপ্রযুক্তি) বিষয়ের উপর পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি প্রফেসর, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ও প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় কর্মরত আছেন। তার প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফসল–বর্তমান ও ভবিষ্যৎ (২০০৮), পুষ্পকথা (২০১৩), ফসলের জীববৈচিত্র্য ও জিন সম্পদ (২০১৫) উল্লেখযোগ্য।

শাহনাজ মুন্নী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে তিনি বর্তমানে চিফ নিউজ এডিটর হিসেবে নিউজ টোয়েন্টি ফোর-এ কর্মরত আছেন।

সাজিয়া আফরিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বর্তমানে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে সমষ্টিতে কর্মরত আছেন।

www.pathagar.com

কৃষি শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ নয়, দেশের সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায়ও কৃষির প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমাদের গণমাধ্যমে কৃষি এখনও অনেকটা উপেক্ষিত। কৃষি বিষয়ে সংবাদ যেমন সংখ্যায় কম, তেমনি তার গুণমানও প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন না করা এবং কৃষি সাংবাদিকতায় দক্ষতার অভাব এজন্য অনেকাংশে দায়ী। বাংলা ভাষায় কৃষি সাংবাদিকতা শেখার এটি একমাত্র বই। এতে দুটি অংশে কৃষি সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেমন–কৃষিখাত, কৃষিপ্রযুক্তি, জিন রূপান্তরিত শস্য, কৃষিতে এনজিও'র ভূমিকা, নারীকৃষক, কৃষিবাণিজ্য, কৃষিতে মেধাস্বত্ব ও জলবায়ু পরিবর্তন। দ্বিতীয় অংশে কৃষিসংক্রান্ত সংবাদের ধরন, নানা ধরনের প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকার, প্রতিবেদন রচনার কাঠামো এবং নানাবিধ সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কৃষি সাংবাদিকতা তো বটেই, সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকতার নানা বিষয়-আশয় সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজেকে আরও শানিত করে নেবার জন্য এটি একটি অপরিহার্য বই। যে কৃষিবিদগণ গণমাধ্যমে লেখালেখি বা অডিও-ভিজ্যুয়াল কর্মকাণ্ডে আগ্রহী, বইটি কাজে লাগবে তাঁদেরও। মুদ্রণ সাংবাদিকতা এবং সম্প্রচার সাংবাদিকতার মূলসূত্রগুলো জানার জন্য এটি এক মূল্যবান গ্রন্থ।

KRISHI SANGBADIKOTA
(Agriculture Journalism)
Cover : Dhruba Esh
Published by Chandrabati Academy
Price : Tk. 350 US $ 20

চন্দ্রাবতী একাডেমি

ISBN : 978 984 8855164